শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

তৃতীয় খণ্ড

দশম সংস্করণ

সন ১৩৬৩

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

পাঠকগণের প্রতি

রসলোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় সে রস প্রত্যাশা করিতে পারেন না। প্রভুর মাধুর্য্য-লীলাই মধুর; আর মাধুর্য্য-লীলা শ্রীজগন্নাথ, শচী, বিশ্বরূপ, বিষ্ণুপ্রিয়া, নদেবাসী ভক্ত ও সখাগণ লইয়া। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নিজজন প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল-লীলাতেও কারুণ্যরস প্রচুর আছে সত্য, তবু, "নিমাই সন্ন্যাস" একবার বই দুইবার হয় না। বলিতে কি, যিনি নিমাইচাঁদ, শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুরারীর প্রভু,—তিনি কাটোয়া হইতে গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্তভাবে শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী, ত্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ। নবদ্বীপে যিনি গুপ্তভাবে রহিলেন, তিনি পূর্ণ; নীলাচলে যিনি গমন করিলেন, তিনি নারায়ণ,—শ্রীভগবানের সৎ ও চিৎ শক্তি। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর লীলা বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচর্চ্চা চলিবে না।

শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন শ্যামসুন্দর মথুরায় গমন করিলেন, তখন সেই মুরলীধর দণ্ডধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমালী, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পাত্র-মিত্র-সভাসদ্-বেষ্টিত মহারাজ হইলেন। সেইরূপ মাধুর্য্যময়, কৌতুকপ্রিয়, স্নেহশীল, চঞ্চল এবং সুকেশ ও সুবাস-মালতীমাল সম্বলিত নিমাইচাঁদ, এখন অতি জ্ঞানী, গম্ভীর, ধীর, দয়ালু, দণ্ড কৌপীন ও ছিন্নকন্থাধারী গুরুরূপে প্রকাশ পাইলেন।

এস্থলে নির্লজ্জ হইয়া নিজের একটি কথা বলিতে হইতেছে। তজ্জন্য আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এই খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বহুদিন এরূপ হইয়াছে যে, রাত্রে নিজজনের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিয়াছি। কারণ কোন কোন দিন এত দুর্ব্বল বোধ হইত যে, হয়ত রজনীর মধ্যে আমার আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।

এক নিশিতে আমি অতি দুর্ব্বল অবস্থায় শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত জগৎ নীরব, আমি স্বয়ং কি অবস্থায় আছি ঠিক বলিতে পারি না। কখন বোধ হইতেছে, আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতে অন্য জগতে গিয়াছি। এমন কি, আমি মনের মধ্যে বিচার করিতেছি যে, আমি কোথায়? এমন সময় যেন কেহ আমাকে বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্মে প্রচার নাই, এ কথা ঠিক নহে।"* এই কথা কে বলিলেন, আমার তাহা অনুসন্ধান করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া মনে মনে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম,—"কেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা, উহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম এইরূপে মুসলমানদিগের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, সেদিন অনার্য্যজাতীয় মণিপুরবাসিগণ, দেশ সমেত, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর আশ্রয় লইলেন।"

তখন আমি বলিলাম, "ঠাকুর, তা' তো হলো, কিন্তু আপনার অভিপ্রায় কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "যদি জীবের মঙ্গল কামনা কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম—যাহা জীবের অধিকারের চরম সীমা (যাহা অতি সরল ও সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী) জগতে প্রচার কর। জীবমাত্রই

---

* ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়—"হিন্দুধর্ম্মে প্রচার নাই, হিন্দুর পুত্র হিন্দু হয়, ভিন্ন-জাতীয়গণকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করেন না।"

দুঃখে অভিভূত ;—রাজনৈতিক, সামাজিক, কি অন্যরূপ উন্নতিতে জীবের দুঃখ যাইবে না। যেহেতু এ জগতে জীব অতি অল্পকাল বাস করে। এই অল্পকাল, তাহার দুঃখে ও সুখে যায়। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বহু দুঃখও ভোগ করিতে হয়। এ দুঃখ আত্মোৎসর্গ ভিন্ন অপনয়ন করা যাইতে পারে না। যাহাতে চির-নিবাসের স্থান অর্থাৎ পরকাল সুখের হয়, তাহাই করা জীবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। অতএব সহৃদয়-গ্রাহী যে শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম, তাহাই জগতে প্রচার কর।" আমি বলিলাম, "কিরূপে এ দুরূহ কার্য্য করিব ? ধর্ম্মপ্রচার ত ইচ্ছা করিলেই করা যায় না ?" তিনি বলিলেন, "তাহা ঠিক, তবে তোমার কাজ তুমি কর। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার ধর্ম্ম কি, ইহা যাহাতে সকলে বেশ বুঝিতে পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া লেখ।" আমি তখন অতি কাতর হইলাম কারণ এরূপ কার্য্যে আমি আপনাকে কিছুমাত্র শক্তিমান বলিয়া বোধ করিলাম না, তখন কাতর হইয়া, আপনার দুর্দ্দশার কথা একে একে বলিলাম। বলিলাম, "একে ত আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাহাতে বিষয়-জ্বালায় জর্জ্জরিত ! আমি গ্রন্থ লিখিয়া ভুবন উদ্ধার করিব, এরূপ ভরসা আমার কেন হইবে ? যে মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ভুবন পবিত্র হয়। আমি কেবল তাঁহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া, সমগ্র গৌরলীলা একত্র করিতেছি এইমাত্র।" তখন তিনি বলিলেন, "তুমি কর, আমি করি, এ কথা ঠিক নহে। তিনিই সব করেন। আর তুমি কি শুন নাই যে, তাঁহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচক্ষু পায়, খঞ্জ নর্ত্তনশীল হয় ? শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রন্থ বড় বড় মহাজনের লেখা সন্দেহ নাই, তবে সে সমুদায় গ্রন্থ প্রধানতঃ বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারা ওরূপ গ্রন্থ দ্বারা অতি অল্প উপকার পাইবেন,

যেহেতু তাঁহারা উহার তত্ত্বকথা আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। তুমি তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেথ যে, কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে। তুমি বৈষ্ণবগণের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির এরূপ বেশ দাও যে, ভিন্ন জাতীয়গণ উহার মধ্যে কতকগুলিকে পরিচিত, বলিয়া চিনিতে কি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে ও যে-গুলি অপরিচিত, সে-গুলিকে সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।" আমি বলিলাম—"এ জগতের যা কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে দেখিতে পাই যে জীবমাত্রই কেবল কুকুরের ন্যায় কলহ করিতেছে। কে কাহাকে দংশন করিবে তাহা লইয়াই প্রায় জীবমাত্র ব্যস্ত। এরূপ হৃদয়ে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে? শ্রীপ্রভু যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন উহা অতি সূক্ষ্ম, মনুষ্যবুদ্ধির চরম সীমা। উহা মদ্যমাংসলোলুপ, বিষয়মদে অন্ধ, যুদ্ধপ্রিয় জীবগণ কিরূপে বুঝিবে? শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাব, যদি অধ্যাপক মোক্ষমোলারের নিকট বিবরিয়া বলা যায়, হয়ত তিনিও তাহা বুঝিতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সর্ব্বজীবের হৃদয়গ্রাহী, কি সরল, ইহা কিরূপে?" তথন তিনি বলিলেন,—"তোমার যতদূর সাধ্য তুমি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া অঙ্কিত কর। উহার অতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অঙ্গ পর্য্যন্ত, সমুদায় এই চিত্রে যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটি কথা মনে রাখিও। সে কথা কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধন। যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ সাধন করিবে। এমন কি, তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রসাস্বাদনের পাত্র কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। তাহার পরে এই পদটি স্মরণ কর যথা—"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম-সংকীর্ত্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস-আস্বাদন॥" তুমি যতদূর পার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মটি আঁকিও। কেহ উহার স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম অঙ্গ লইবে; —কেহ চরণ, কেহ মস্তক, কেহ অন্য অঙ্গ, কেহবা সর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ গ্রহণ করিবে।"

তখন হঠাৎ একটি কথা আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম, "গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপায়ে এ ধর্ম্ম প্রচার করিব জানি না। আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও মনে উদয় হয় না। অথচ গ্রন্থ-প্রচার করিয়া যে কোন ধর্ম্ম-প্রচার হয়, ইহাও মনে হয় না।" তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ইহা জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোক শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম—"তাঁহারা হিন্দু; তাঁহাদের হৃদয়-কলিকা অর্দ্ধস্ফুটিত, তাঁহারা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমার গ্রন্থ তাঁহাদের উপলক্ষমাত্র। কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কিরূপে আমি প্রমাণ করিব যে, শ্রীনবদ্বীপ বলিয়া একটি নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এই গ্রন্থের লিখিত সমুদায় লীলা করিয়াছিলেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব না। প্রমাণের মধ্যে কেবল গ্রন্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়।"

তখন তিনি বলিলেন,—"যাঁহারা এদেশে খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। যাহারা জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে প্রমাণ করেন যে, উত্তর-বঙ্গদেশে বুদ্ধ-নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। লোক কেন যে নূতন-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে নিগূঢ় তত্ত্বের বিচার করা এখানে প্রয়োজন নাই। তবে ইহা মনে রাখিও যে, জাপানে বুদ্ধের কথা ও তাঁহার শিক্ষার ও লীলার কথা শুনিয়া কোন কোন লোকে তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। সেইরূপ

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিবে। এইরূপে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রদত্ত সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া, উহা নিম্নশ্রেণীতে বিতরণ করিবে। একটি সূক্ষ্ম-কথা বলি। ধর্ম্ম 'বিচারের' বস্তু নয়, 'আস্বাদের' বস্তু। সদ্যোজাত শিশুর মুখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন করিবে, মধু দিলে সে আনন্দ প্রকাশ করিবে। কথা যদি প্রকৃত ভাল হয়, তবে শুনিবামাত্র উহা চিত্তকে আপনাপনি অধিকার করিয়া লইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রের বিবাদের মীমাংশক, সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুলভ, এমন জীব অতি দুর্ল্লভ, যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ না হইবে। এতদিন যে এই সুধা জীবমাত্রে গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ, যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা উহা জীবগণকে বিতরণ করেন নাই। যিনি যে ধর্ম্ম আস্বাদ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও ধর্ম্ম যদি আস্বাদে মিষ্ট লাগে, তবে জীবে উহা আপনাপনি গ্রহণ করিবে। তাহারা আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবে না।"

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমার নিপট্ট বাহ্য হইল। উপরে যে 'কথা'গুলি বলিলাম, তাহা আমি পরে যোজনা করিয়াছি, কিন্তু উহার 'ভাব'গুলি বিদ্যুদ্গতিতে তখনিই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। উপরের কথাগুলি কেহ আমাকে বলিলেন, অথবা তা সব আমার নিজের মনের ভাব, তাহা এ পর্য্যন্ত আমি বিচার করি নাই, আর বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীভগবান সর্ব্বজীবের প্রাণ ও আশ্রয়। জীবগণ তাঁহার আশ্রয় লইলেই তাহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। জীবগণের একই স্থান হইতে উৎপত্তি, আর একই স্থানে তাহাদের যাইতে হইবে। তাহারা পরস্পর অকাট্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর সকলে সেইরূপ আবদ্ধ থাকিয়া সেই শ্রে

প্রাণের-যে-প্রাণ, তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। কবে জীবের চৈতন্য হইবে যে, ঈর্ষা, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি রিপু হইতে যে সুখ,—স্নেহ, মমতা, দয়া ও প্রীতি উৎকর্ষে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক সুখ? কবে তাহাদের এ জ্ঞান হইবে যে, অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের যত অনিষ্ট হয়, তত অন্যের হয় না। হে দুর্ব্বল-জীব! যদি আশ্রয় চাও তবে অন্যকে আশ্রয় দাও। যদি অন্যের প্রিয় হইতে চাও, তবে অন্যকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর! শ্রীভগবান্ সর্ব্বগুণের আকর, যতদূর পার তাঁহার মত হও, তাতেই ব্রজে যাইতে পারিবে।

উৎসর্গপত্র

শ্রীমান্ অমিয়কান্তির প্রতি—

তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতা-পুত্রে ছাড়াছাড়ি, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু তোমার কি আমার, ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নেই ; যেহেতু তুমি এখন সেই সকলের পিতার শ্রীহস্তদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেলায় ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃঋণ কিছু শোধ করিতে পার নাই বলিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নানা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতেও মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগ-জনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হয়, তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহা মনে করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। তার পরে আমার সর্ব্বস্বধন নিমাইচাঁদ ; —তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়া একটু ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তাঁহার নামের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমি শুধু 'নিমাই' বলিয়া ডাকি ; কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাঁহাকে 'অমিয়নিমাই' বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাঁহাকে পাই।

শ্রীমঙ্গলাচরণ

(আদি ও অন্ত)

জগতের নাথ কেহ নাহি সাথ একা দুঃখ পান চিতে।
রসের হৃদয় সঙ্গী কেহ নাই সেই রস আস্বাদিতে॥
নাহি হেন জন মনের বেদন বলি জুড়াবেন বুক।
প্রাণ উঘাড়িয়া পিরীতি করিয়া ভুঞ্জিবেন প্রেম-সুখ॥
মনের মতন সঙ্গীর সৃজন করিতে বাসনা হ'লো।
আপন হৃদয় হইতে উদয় হ'লো জীব জল স্থল॥
সুখের কানন করিলা সৃজন মরি কিবা কারিগরি।
তাঁহার অন্তর কিরূপ সুন্দর পরিষ্কার সাক্ষী তারি॥
জীব সৃষ্টি হ'লো ভ্রমিতে লাগিল ক্রমে বিকশিত হ'য়ে।
জীব পরিণাম মানব জনম লভে লক্ষ জন্ম পেয়ে॥
নামেতে মানুষ স্বভাবে রাক্ষস দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ।
যান মিলিবারে মিলিতে না পেরে শ্রীভগবান্ দেন ভঙ্গ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ফুটিল ব্রজেতে গোপ-গোপী-সখাগণ।
জগতের নাথ স্বীয় মনমত পাইলেন নিজ জন॥
ডাকেন তখন এস প্রিয়াগণ* মুরলীতে করি গান।
মুরলী বাজিল কেহ না শুনিল বিনা গোপ-গোপীগণ॥
আকুল হইয়া চলিলা ধাইয়া যথা সে রসিকবর।
তাদের চাহিয়া বলেন হাসিয়া "যাহা চাহ দিব বর॥

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল এক মাত্র তিনি, কানাইয়ালাল, অপর সকলে প্রকৃতি।

গোপী বলিতেছেন--

"নিঠুর বচন বল কি কারণ চাহিবার কিছু নাই।
কান্দিছে পরাণ শুনি বাঁশী গান তাই আনু তোমা ঠাঞি॥
মধু হতে মধু তুমি প্রাণবঁধু চরণের দাসী কর।
কিছু না চাহিব চরণ সেবিব দাও নাথ এই বর॥"
গোপীগণ ভাষ শুনি স্বপ্রকাশ পদ্ম-আঁখি ছল-ছল।
"পিরীতি করিবে কিছু না চাহিবে এ কথা আবার বল॥
'দাও' 'দাও' কথা শুনে থাকি সদা দিতে নারি, গালি খাই।
মন-কথা কই হৃদয় জুড়াই হেন মোর সঙ্গী নাই॥
একাকী বেড়াই হেন নাহি পাই আমারে পিরীতি করে।
হৃদয়ে যা ছিল সুরস কোমল সব গেল ছারে-খারে॥
নূতন জীবন পাইনু এখন শুনি তোমাদের বাণী।
সুখ-বৃন্দাবন রব চিরদিন করি প্রেম বিকি কিনি॥'
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব সকল মহত্ত্ব সব ফেলি দিয়া দূরে।
বলরাম দাসে কান্দিছে নিরাশে কিরূপে যাব ব্রজপুরে॥

প্রথম অধ্যায়

	বন্ধুর লাগিয়া,	কতই রান্ধিনু,	লুকায়ে যাইব লয়ে।
	রজনী আসিছে,	কিছু নাহি আছে,	বার জনে গেল খেয়ে॥
	এবে শুধু হাতে,	বন্ধুর আগেতে,	কেমনে যাইব আমি।
	রান্ধিতে সময়,	আর সখি নাই,	উপায় বলহ তুমি॥
(আমার)	ভাণ্ডারেতে পোরা,	কতই সামগ্রী,	রান্ধিবার শক্তি নাই।
	করুণা করিয়া,	কে দিবে রান্ধিয়া,	বন্ধুরে খাওয়াব যাই॥
	সংকেত কুঞ্জেতে,	বন্ধুর আগেতে,	বসিয়া খাওয়াতাম নিতি।
(আজ)	কেমনে যাইব,	কিবা তারে দিব,	অভাগ্য বলাই অতি॥

শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি। আমরা আরও কিছুক্ষণ তাঁহাকে মায়ের কোলে রাখিব, রাখিয়া একটি নিগূঢ় রস অর্থাৎ পরকীয়া রসের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। বেশীক্ষণ রাখিতে পারিব না। ভাগ্যবান পাঠক, এইবেলা মনের সাধে ও প্রাণ ভরিয়া "শচীর কোলে নিমাই" দৃশ্যটি দর্শন করুন; কারণ, এই দৃশ্য বহুদিন আর দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীগৌড়ীয় বাদশাহের তখনকার মন্ত্রিদ্বয়,—সাকার মল্লিক (রূপ) ও দবীর খাস (সনাতন)। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও সহোদর। যখন তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের কথা শুনিলেন, তখন আপনারা আসিতে না পারিয়া, প্রভুর নিকট দৈন্য করিয়া বারে বারে এইভাবে পত্র লিখিতে লাগিলেন,—"প্রভু! আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই দুই ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। যিনি নামে বাদশাহ, তিনি আমোদ-আহ্লাদে, কি যুদ্ধ-বিগ্রহে, বিব্রত থাকিতেন।

তাঁহাদের এইরূপ বিষয়-সুখের প্রতি ঔদাস্য দেখিয়া প্রভু তাঁহাদের উপর কৃপার্দ্র হইলেন, এবং যদিও তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিলেন না, তবু তাঁহাদের কথা মনে করিয়া একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমুখের শ্লোকটি এই—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

শ্লোকের অর্থ এই—কুলটা-রমণী গৃহকার্য্যে ব্যগ্র থাকিলেও অন্তরে উপপতির নবসঙ্গরূপ রসায়ন আস্বাদন করে। এই দুই ভ্রাতাও ঠিক তাহাই করিতেছেন; অর্থাৎ তাঁহারা কুলটার মত বিষয়কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণরূপ উপপতির সঙ্গই আস্বাদন করিতেছেন।

এখন দেখুন, প্রভু এই দুই ভ্রাতাকে কুলটার সহিত তুলনা করিলেন কেন? "পরকীয়া" কথাই বা কেন ভজন-সাধনের মধ্যে আসে? পরকীয়া-রস শুনিলে পবিত্র-লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়। অতএব এ সব কথা এ সমুদয় পবিত্রতার মধ্যে কেন? শচী ও নিমাইয়ের এখনকার অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথার অল্প একটু বিচার করিতে হইতেছে। প্রিয়বস্তু সুলভ হইলে তাহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। পাখী বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখী ধরা যায় না। পাখী যদি ইচ্ছা করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়া যাইত। চণ্ডীদাস একটি পদে বলেন, গুপ্ত-প্রীতিতে অনেক মাধুর্য্য। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপপত্নী, পতি কি পত্নী অপেক্ষা দুর্লভ। অতএব যদি পতি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হয়েন, তবে পতিও উপপতির ন্যায় মিষ্ট হয়েন। পতির সঙ্গসুখ ইচ্ছা করিলেই করা যায়, কিন্তু উপপতির সঙ্গসুখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পরিণামে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা আছে। এই নিমিত্ত দুর্লভ বলিয়া পতি অপেক্ষা উপপতি মিষ্ট।

শ্রীভগবানের মধুর-ভজন করিতে হইলে দুই প্রকারে করা যায়,—পতি-ভাবে ও উপপতি-ভাবে। এ কথার আভাষ পূর্ব্বে দিয়াছি। ভগবান্ যাঁহার পতি, কাজেই তিনি একটু বঞ্চিত। আর ভগবান্ যাহার উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। ভগবান্ আস্বাদের সামগ্রী। তিনি যদি পতির ন্যায় সুলভ হইলেন, তবে তাঁহার মিষ্টতা কমিয়া গেল। যদি উপপতির ন্যায় দুর্ল্ভ হইলেন, তবেই তাঁহার মিষ্টতা পূর্ণমাত্রায় রহিয়া গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান্, দুজনে একত্রে বাস করেন ; কিন্তু লক্ষ্মী ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে এ কথা লেখা আছে, এখন তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন।

শ্রীভগবান্কে উপপতি বলিয়া ভজনা করিবার আরও কারণ আছে। শ্রীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি-ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উপপতি-ভজনে আনন্দে উন্মাদ করে,—ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্ঞান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজনা দ্বারা উপপতি প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই। শ্রীভগবান্-ভজন সম্বন্ধেও তাহাই। সেইজন্য পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না,—উপপতিরূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে—যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি। আর উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহা বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রন্থিত।

আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শিশির বাবু?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তখন সে বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ব্রাহ্মণযুবক! সে এই স্ত্রীলোকটির ধর্ম্মনষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটি শুনিয়াছিল নারায়ণ

আমাদের এক গ্রামস্থ। তাই সে একাকিনী কোন এক পল্লীগ্রাম হইতে তল্লাস করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং কলিকাতায় তল্লাস করিয়া আমার বাড়ী পাইয়া নির্ভয়ে আমার কাছে আসিয়াছে। আমাকে চিনে না, তবুও আমাকে লজ্জা কি ভয় করিল না,—আসিয়াই বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" স্ত্রীলোকটির বেশ পাগলিনীর মত। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যিনি পাগলিনী তাঁহারও ঠিক এইরূপ দশাই হয়। তাঁহার লজ্জা ভয় থাকে না, তিনি কৃষ্ণকে এইরূপে তল্লাস করিয়া বেড়ান,—দুর্গম স্থানেও যান। তাই সাধুগণ মধুর-ভজন পরিষ্কার বুঝাইবার নিমিত্ত "পরকীয়া" উদাহরণ দিয়া থাকেন; এবং তাহাই রূপসনাতন সম্বন্ধে প্রভুও এইরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন, এরূপ ভাগ্যবান্ জীব আমরা দুই-একজন দেখিয়াছি। মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, ভগবৎ-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি মদ্যপায়ীর মুখে যেরূপ লালা পড়ে, প্রেমোন্মত্ত ভক্তের মুখেও সেইরূপ কখন কখন লালা পর্য্যন্ত পড়িতে থাকে। তবে সামান্য মাতাল দেখিলে ঘৃণা হয়, আর কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা দেখিলে হৃদয় দ্রবীভূত ও নির্ম্মল হয়। সাধুগণ জীবগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রেমকে মদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি কৃষ্ণ-প্রেম দোষের হইল? সেইরূপ শ্রীভগবানের মধুর-ভজন কিরূপ, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধুগণের পরকীয়া-রসের সাহায্য লইয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি সাধুগণের দোষ হইল?

এখন পরকীয়া-রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিয়জন যখন দুর্ল্লভ হয়েন, কি প্রিয়জনকে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা যায়, তখনই পরকীয়া-রসের উদয় হয়। প্রিয়জন যদি দুর্ল্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম-প্রিয় হয়েন। যদি

স্বামী পরের অধীন হয়েন,—তাঁহাকে প্রাপ্তি অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে তিনিও উপপতির ন্যায় সুখের সামগ্রী হয়েন। যদি প্রিয়জন অন্যের অনুগত কি অপরের বস্তু হয়েন, তবে পরকীয়া-রসের উদয় হয়।

শ্রীনিমাই সন্নাসী হইয়াছেন, স্ত্রী ও জননী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন স্ত্রীলোক-মাত্রকেই তাঁহার জননী-জ্ঞান করিতে হইবে; এমন কি, তাঁহাদের মুখ পর্য্যন্তও দেখিতে পাইবেন না। যদি দৈবাৎ স্ত্রীলোক সম্মুখে পড়ে, তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদিতে, কি অন্য পথে যাইতে হইবে। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্য্যন্ত দেখিতে এবং স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে নিষেধ। তাহাও নয়, "স্ত্রী" শব্দও ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদি কোন কারণে স্ত্রীলোকের কথা বলিতে হয়, তবে স্ত্রী স্থানে "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। যেমন শিবানন্দ সেনের "স্ত্রী" না বলিয়া, শিবানন্দের "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। পথে কয়েকজন "স্ত্রীলোক" দাঁড়াইয়া না বলিয়া, কয়েকজন "প্রকৃতি" দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক এইরূপ ভয়ঙ্কর সামগ্রী।

নিমাইয়েরও জননীর সঙ্গে এইরূপে সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে। শচী আর এখন তাঁহার জননী নহেন, তবে কি না, তাঁহার "পূর্ব্বাশ্রমের" মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশব-ভারতীর বেটা। শচী আর তাঁহাকে বাটী লইতে পারিবেন না। এমন কি, শ্রীনিমাই এখন শচীকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না; নিয়ম মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। কাজেই শ্রীনিমাই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার সামাজিক সম্পর্ক একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাই বলিয়া কি নিমাইয়ের প্রতি শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ভালবাসা গিয়াছে? না,—তাহার ত একবিন্দুও যায় নাই, বরং উহা অনন্ত-গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু,

নিমাইরূপ যে অতি-প্রিয়বস্তু, তিনি এখন আর তাঁহার নিজজন নহেন, —অপরের বস্তু হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করিয়া দৈবকীর ক্রোড়ে বসিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দুর্ল্লভ হইলে, শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণে পিপাসা আরও কোটিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

শচীর প্রিয়বস্তু নিমাই। নিমাই তাঁহার পুত্র ছিলেন, এখন তাঁহার উপপুত্র হইলেন। সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি নিমাই, এখন তাঁহার উপপতি হইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর, প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গেলেন, থই পাইলেন না।

এখানে আর একটি গুহ্য-কথা বলিব। এইরূপে বিয়োগে প্রিয়বস্তু আরও প্রিয় হয়েন। আর এইরূপে মৃত্যুরূপ বিয়োগে প্রিয়বস্তুর সহিত প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হয়। অতএব মৃত্যুর তাৎপর্য্য ছাড়াছাড়ি নয়,—প্রীতির পরিবর্দ্ধন। প্রিয়বস্তুর সহিত মৃত্যুরূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাঁহার আর দোষ দেখা যায় না, তাঁহার গুণগুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামণির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। আর যদিও ভবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের কথা বাহ্যদৃষ্টিতে ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরলোকগত প্রিয়জনের কথা হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহা জানা যায়। দুইটি জীবে অন্তরে-অন্তরে অত্যন্ত প্রণয়। কিন্তু দুইজনে খটমটি হইতেছে ;—কোথা কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, দুইজনে মিলিতেছে না। হঠাৎ দুইজনে বিচ্ছেদ হইল, তখন "দুহে দুহার" দোষ ভুলিয়া গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে লাগিলেন। দুইজনে পূর্ব্বে কলহ করিয়াছিলেন বলিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে দুইজনে মিলন হইল, তখন বাহু প্রসারিয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন।

মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনে যেই দেখা হইল, অমনি উভয় উভয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে যাহা হউক, এ সমুদয় রহস্য ক্রমেই বিস্তারিত হইবে।

শচীর কোলে নিমাই। প্রথমে যখন শচী সন্ন্যাসবেশধারী নিমাইকে দেখিলেন, তখন পুত্রকে চিনিতে কষ্ট হইল, যেহেতু অরুণবসনধারী ও মুণ্ডিতমস্তক নিমাইয়ের বেশ তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহা নহে; তখন নিমাইয়ের আকৃতি অতিশয় ভক্তি-উদ্দীপক হইয়াছে। নন্দন আচার্য্যের বাড়ী প্রভুকে নিতাই যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন তাঁহার পরিধান পট্টবস্ত্র, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীন-নাগর বেশ;—ভক্তি-উদ্দীপক কোন উপকরণ নিমাইয়ের অঙ্গে ছিল না। তবু নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া ব্রজবালা রাধা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্রপ্রেম সম্বন্ধ,—ভক্তি সম্বন্ধ নহে। কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া শচীর ভক্তির উদয় হইল, সুতরাং পুত্রের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহার বিভ্রাট ঘটিল। কাজেই শচী নিমাইকে দেখিবামাত্র প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, আর চিনিয়াও তাঁহার উপর পুত্রভাব অর্পণ করিতে পারিলেন না;—ভক্তিতে গদগদ হইয়া শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা যে প্রণাম করেন। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাহা পারিতেছেন না। তাই, নিমাই যখন তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপ্! তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, ইহাতে আমার ভয় করিতেছে। তবে ভরসা এই যে, যদি তোমার প্রণামে আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখনই প্রণাম করিতে না।"

এইরূপ ভক্তি-চক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটি বিষম

অনর্থ হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের সন্দেহরূপ নীলকাচে শ্রীভগবানরূপ সূর্য্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্তিরূপ বাঁধে প্রেমের বন্যাকে নিবারণ করে। শচী তাঁহার জীবনের জীবন পুত্রকে হারাইয়া, সেই পুত্রকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক ভাব তাহা থাকিলে, পুত্রকে দর্শন করিবামাত্র, সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে, "হা নিমাই" বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন ;—এমন কি, তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিমাইকে দর্শন করিবামাত্র শচীর ভক্তির উদয় হইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে একটি বাঁধ পড়িল, আর শচী ভাসিয়া গেলেন না,—সচেতন রহিলেন ; ও সচেতন থাকিয়া পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

শচী ভাবিতেছেন, "আমার পুত্রটি স্বয়ং ভগবান্, কিন্তু আমি কি নির্ব্বোধ, তবু নিমাইকে আমার পুত্র বোধ গেল না!" ইহাতে আপনাকে একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ যতদূর সম্ভব অপনয়ন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস যায় না যে তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" কিন্তু শচীর এই জ্ঞানরূপ দুর্দ্দশা অধিকক্ষণ রহিল না, দুই একটি কথা বলিতে না বলিতে উহা শেষ হইয়া গেল, আর হৃদয় বাৎসল্য রসে পূরিয়া উঠিল। তখন তিনি বাহু প্রসারিলেন, অমনি নিমাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন, আর জননী পুত্রের বদনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। মাতা-পুত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া সকলের ইচ্ছা হইল দূরে যাইবেন ; একটু দূরেও গেলেন, তবু বেশি দূরে যাইতে পারিলেন না। কারণ শচী ও নিমাই বসিয়া কথা কহিতেছেন, ইহা ফেলিয়া কিরূপে যাইবেন?—তাঁহারা চুপ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

শচী প্রথমে ভক্তি, পরে বাৎসল্য, পরে অভিমান রসে বিভাসিত

হইয়া কথা কহিতেছেন। বাসুঘোষও সেখানে দাঁড়াইয়া, সুতরাং তাঁহার একটি পদে আমরা জানিতে পারিতেছি, শচী কি কি বলিলেন। শচী বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি পিতৃহীন বালক, আমি সেই নিমিত্ত আরো যত্ন করিয়া তোমাকে লেখা-পড়া শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম। সেই ঋণের শোধ কি তুমি এইরূপে দিলে? তোমাকে আমি বড়-মানুষের ঘরে পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম; তুমি এখন তাহাকে আমার গলায় বাঁধিয়া দিয়া ফেলিয়া চলিলে। ইহাতে কি তোমার বড় ধর্ম্ম হইবে? * আমি তোমার বৃদ্ধ-মাতা, আমার প্রতি তোমার দয়া হইল না। তা'তেও আমি তোমাকে দোষ দিই না। আমি তোমার মা, আমার প্রতি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু সে পরের মেয়ে, তা'র অপরাধ কি? বৌমাকে কি বলিয়া বুঝাইব, বল দেখি?"

ইহা শুনিয়া নিমাই মস্তক অবনত করিলেন। মায়ের দুঃখে ক্রমে তাঁহার মুখ মলিন হইতেছে। নিমাই মানুষের মত কথা কহিতেন ও ব্যবহার করিতেন। ইহাতে যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ ভাবিতেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে তাঁহার ভগবত্তা ভুলিয়া যাইতেন। আর ভিন্ন-লোকে সেই কথা বলিয়া তাঁহার ভগবত্তায় দোষ ধরেন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু যদি শ্রীভগবান্ হইবেন, তবে মনুষ্যের অনিশ্চিততা, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা,

---

* হেদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই। অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে। স্নেহভাবে চুম্ব খায় বদন-কমলে॥
মুই বৃদ্ধ-মাতা তোর, মোরে ফেলাইয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলে গলায় গাঁথিয়া॥
তোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক। ঘরে রে চলরে বাছা দূরে যাউক শোক॥
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ। তা সবারে লয়ে বাছা করহ কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস। এ সব ছাড়িয়া কেন করিলে সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া। পুনঃ যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ আনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাণী। পুনরায় নদে চল গৌর-গুণমণি॥

দেখাইবেন কেন? কিন্তু এ কথা একবার স্মরণ করা উচিত যে, যদি শ্রীভগবান্ মনুষ্য-সমাজে উদয় হয়েন, তবে তাঁহার ঠিক মনুষ্য হইয়া না আসিলে, অর্থাৎ মনুষ্যের যে যে স্বভাব তাহা না লইয়া আসিলে, তাঁহার মনুষ্যের সহিত সঙ্গ কিরূপে সম্ভবে? মনুষ্য, ষড়ৈশ্বর্য্য-ভগবানের সঙ্গ সহ্য করিতে পারে না। আর তাহা হইলে তাঁহার লীলাও মাধুর্য্যময় না হইয়া ঐশ্বর্য্যময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কোপ কারয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন হইয়া গেল। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এ সব কথা না থাকিলে উহা মিষ্ট হইত না। আর রাধার কোপে শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন না হইলে, রাধাও কোপ করিতে পারিতেন না। পাঠকগণের অবশ্য স্মরণ আছে যে, সাত প্রহর শ্রীনিমাই ভগবান-আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন নাই।

আরব্য উপন্যাসের পাতসা গুপ্তবেশে প্রজা-সমাজে বেড়াইতেন। তিনি প্রজাগণের সহিত রঙ্গ করিতেন, প্রজাগণও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাঁহাকে তাহাদের মত একজন ভাবিত—পাতসা বলিয়া জানিলে এ রস আর একটুও হইত না। অতএব শচী ও নিমাইয়ে যখন কথা হইতেছে, তখন প্রভু যে শচীর পুত্র, ইহা ব্যতীত আর কোন ভাব কাহারও মনে রহিল না,—থাকিলে কোন রসই হইত না। পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া শচীর কোপ অন্তর্হিত হইল। তখন তাঁহার আর এক কথা মনে পড়িল। তিনি ভাবিতেছেন, নিমাই ত এখন আর তাঁহার নহে। যে ডোরে তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট বান্ধা ছিলেন, তাহা নিমাই ছিঁড়িয়াছেন। এখন নিমাইয়ের এক গতি, তাঁহার অন্য গতি। কাজেই নিমাই তাঁহার বাড়ী যাইবে না, তাঁহার ঘরে শুইবে না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না; অথচ নিমাই তাঁহার পুত্র, তাঁহার জীবনের জীবন। কাজেই তখন জোর জুলুম ছাড়িয়া দিয়া,

নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার কোন দাবি দাওয়া নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "নিমাই! আমি তোমার বৃদ্ধ-মাতা, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া নিতাই, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, নরহরি, বাসুঘোষ,—ইহাদের সহিত সংকীর্ত্তন করিও। আমি আর মানা করিব না। তবে তুমি সন্ন্যাস লইয়াছ, ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়া আমি তোমার পৈতা দিব। তুমি বৈরাগী হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে, ওমা তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব! এই সুন্দর শরীরে কাঙ্গালের ডোর-কৌপীন পরিয়াছ, ইহা দেখিয়া পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কান্দিতেছে;—আমি তোর মা, বাঁচিয়া আছি। অন্যে সহিতে পারে না, আমি মা কিরূপে সহিব? নিমাই, তুমি সুবোধ; বল দেখি মা হইয়া কি কেহ ইহা দেখিতে পারে? আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভেবে দেখ দেখি? তাহার এই কচি বয়স। তাহাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? নদীয়া আঁধার হয়েছে। বৌমা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি। বাপ! বাড়ীর ধন বাড়ী চল।" এই বলিয়া নিমাইয়ের গলা ধরিয়া আবার ঘন ঘন চুম্বন দিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের স্বাভাবিক টান শচীর দিকে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, শচী ঠিক বলিতেছেন, প্রভুরই সমুদয় অন্যায়। ভক্তগণের অবস্থা ও মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বাসুঘোষের একটি পদে বেশ বুঝা যাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, "প্রভুর একি রীতি? যিনি শ্রীভগবান্ প্রেমদান করিতে আসিয়াছেন, তিনি কৌপীন ও দণ্ড লইয়া, কেশ মুড়াইয়া, কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন? একবার তাঁহার নিজ জনের অবস্থা দেখিলেন না! বৃদ্ধা-জননী ও যুবতী-ভার্য্যা ছাড়িলেন! ভক্তগণ প্রাণে মরিতেছে, কান্দিয়া কান্দিয়া তাহাদের জীবন সংশয়

হইয়াছে।* তাহা দেখিলেন না! অতএব গঙ্গায় ডুবিয়া মরণই আমাদের এ দুঃখের একমাত্র ঔষধ।"

মায়ের বচনে নিমাইয়ের দুঃখ-তরঙ্গে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। কষ্টে-শ্রষ্টে নয়ন-জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "মা, জানিয়া বা না-জানিয়া যদি সন্ন্যাস করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনও উদাস হইব না। দেখ মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তাহাতে বিঘ্ন ঘটিল,—যাইতে পারিলাম না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি বিচার করিয়া দিও, আমি আর স্ব ইচ্ছায় কিছু করিব না। এ দেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার নাই। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। যদি আবার বাড়ী যাইতে বল, তাহাই যাইব। সর্ব্ব-সমক্ষে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আসিয়া শচীর দুইখানি হাত ধরিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শচীও সম্মত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে তখন একটি সাধের উদয় হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সীতাদেবীকে বলিলেন, "আমি রাঁধিব, রাঁধিয়া নিমাইকে খাওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া সকলের চোখে জল আসিল। শচী তখনি স্নান করিয়া রন্ধন করিতে

---

* কি লাগিয়া দণ্ডধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখচাঁদে, রাধা রাধা বলি কাঁদে, কি লাগিয়া ছাড়ে গৌড়দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায়, পাষাণ গলিয়া যায়, গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, মুকুন্দের ও দুটি নয়ানে॥
কান্দে শান্তিপুর-নাথ-শিরে দিয়ে দুটী হাত, কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে।
অদ্বৈতঘরণী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্দে, মরা যেন পড়িল ভূমিতে॥
এ তোমার জননী ছাড়ি, যুবতী রমণী এড়ি, এবে তোমার সন্ন্যাসে গমন।
গঙ্গায় শরণ নিব, এ তনু গঙ্গায় দিব, বাসুঘোষের অনলে জীবন॥

বসিলেন। কি কি ব্যঞ্জন নিমাইয়ের প্রিয় তিনি তাহা বেশ জানেন। অন্যের বাড়ী বলিয়া, রন্ধনের দ্রব্যের ফরমাইস করিতে শচীর একটু কুণ্ঠিত হইবার কথা, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণ নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শাক, থোড়, মোচা প্রভৃতির উপর,—মূল্যবান ক্ষীর সর ছানার উপর নহে।

শচী অন্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন। ভক্তগণের দশা দেখিয়া প্রভু আবার কাতর হইলেন। সকলের এলোথেলো বেশ, রোদন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ, অনাহারে দেহ শীর্ণ। তখন যদিও একটু প্রফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহারা যে একটু পূর্ব্বে দুঃখসাগরে ডুবিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন প্রভু জনা-জনাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, আর যেন সেই শীতল স্পর্শে ভক্তগণের দুঃখ হরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ভক্তগণ আর দুঃখ ভাবিতে বড় সময় পাইলেন না। প্রভু তখনি তাঁহাদের লইয়া স্নানে চলিলেন। এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত সকলের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিষয়-সম্পত্তিতে একজন বড়মানুষ,—তখনকার বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়। অনায়াসে সকলের আতিথ্যের ভার লইলেন। যাঁহারা নবদ্বীপ কি দূরবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার বাসা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বাহিরে এই আমোদ করিতেছেন. ওদিকে শচী এক মনে, যেন পরম যোগিনীর ন্যায়, রন্ধন করিতেছেন। এদিকে নদেবাসিগণ সুরধুনীতে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া জল-যুদ্ধ, সন্তরণ, "কয়া" "কয়া" খেলারূপ আনন্দে সকলে প্রভুর সন্ন্যাস তখন একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে প্রভুর সন্ন্যাসের পর ত্রিভুবন শীতল হইল, কেবল একজন

ছাড়া,—তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীমতী প্রভুর বাড়ীতে সখী পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। তখন তিনি সে বাড়ীর কর্ত্রী, উত্তরাধিকারিণী। প্রভুর এই বাড়ীতে তিনি চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন, আর প্রভু বিংশতি দিবসের পথ দূরে অর্থাৎ নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে প্রভুকে পরে লইয়া যাইব। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার শূন্য-ভবনে স্থাপিত করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্যা। তিনি সুরধুনীর তীরে শচীর অগ্রে দাঁড়াইয়া মুখ অবনত করিয়া মনে মনে বলিতেন, "মা! আমাকে ঘরে নিয়ে চল।" তাহার পরে প্রকৃতই তিনি শ্রীনিমায়ের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া দাঁড়াইলেন; তখন তাঁহার রূপ কি প্রকার না,—"ঝলমল করে যেন তড়িৎপ্রতিমা।" তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহাগিনী, ত্রিভুবনের আদরিণী। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে হঠাৎ নানাবিধ অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন! যথা—

বিষ্ণুপ্রিয়া সখী সনে কহে ধীরে ধীরে। আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝুরে॥
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি, যেন স্ফুরে অঙ্গ। না জানিয়ে বিধি কিবা করে সুখ-ভঙ্গ॥
আর কত অস্ফুরণ-স্ফুরয়ে সদায়। মনের বেদন কহিবারে পাই ভয়॥
আরে সখি পাছে মোরে গৌরাঙ্গ ছাড়িবে। মাধব* এমন হলে অনলে পশিবে॥"

শ্রীমতী আবার বলিতেছেন, "সখি! সুখের নবদ্বীপের এরূপ দশা কেন? চতুর্দ্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে।" যথা—

"আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে। অঙ্গে নাহি পাই সুখ, দুটি আঁখি ঝুরে॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা। ভ্রমর না খায় মধু, শুকাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা। কোকিলের রব নাহি, হৈল মুক-পারা॥
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে। নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে॥"

* মাধব বাসুঘোষের ভ্রাতা।

তখন সখিগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা আর গোপন রাখিলেন না; বলিলেন, "নগরে এরূপ কথা হইতেছে যে, সোণার ঠাকুর নাকি নবদ্বীপ ছাড়িবেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আর পিত্রালয়ে রহিলেন না, তদ্দণ্ডে আপন গৃহে আসিলেন। সেই সময় কিছুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন; আর সন্ন্যাসের রজনীতে সেই রসের বন্যা উঠাইলেন। *

তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় কিরূপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শূন্য দেখিয়া "পালঙ্কে বুলায় হাত" ইত্যাদি লীলা পাঠকের স্মরণ আছে। এখন পতি হারাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া শূন্য নবদ্বীপের মাঝে, তাঁহার শূন্য-গৃহে বসিয়া আছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি প্রাচীনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে পালন করিতে হইবে। আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, ও কখন-বা নিরাশ হইয়া সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উঘাড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা—

"হেদেরে পরাণ নিলাজিয়া। এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আরকি গৌরব আছে তোর॥

* সেই রজনীর দম্পতি-রসলীলা বর্ণিত এই পদটি প্রস্তুত হয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন। যথা—

"সলাজনয়না বালা মুখ নাহি তোলে। পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্ম-মধু লোভে॥
হিঙ্গুলে রঞ্জিত ঠোঁট কাঁপে মৃদু মৃদু। প্রেম-সরোবরে আঁখি ঝুরে বিন্দু বিন্দু॥
নয়নের তারা আধো পদ্মদলে ঢাকা। জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল আঁকা॥
নানা ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল। কঠিন পুরুষ আমি করিল পাগল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞা পেয়ে বলাই মালা গাঁথে। অঞ্জলি করিয়া দিল প্রাণেশ্বরীর হাতে।

মিছা প্রীতি আশ-আশে রবে। আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কান্দি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণি॥"

শ্রীমতী ভাবিতেছেন, "আমার প্রভু বড় নিষ্ঠুর"; আবার ভাবিতেছেন, "সে কি! আমার দুঃখ, তাঁর দুঃখ না? আমি ত ঘরে আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে?" তখন সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাই! সন্ন্যাসীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস্? আচ্ছা, সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস্? আমি তাহার সমুদয় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আমাকে জব্দ করিবেন? আমিও শয্যায় শুইব না। তিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত দুটি অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব।"*

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থা ধ্যানের বস্তু। ইহাতে মন নির্ম্মল হয়, শ্রীগৌরাঙ্গে প্রীতি হয়, আর শ্রীভগবৎবিরহরূপ যে জীবের পঞ্চমপুরুষার্থ তাহা পরিমাণে লাভ হয়। তাই আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণন করিয়া, প্রিয়াজী কর্তৃক তাঁহার পতির নিকট শান্তিপুরে-প্রেরিত দুইখানি লিপি রচনা করিয়াছিলাম। শুনি, কিন্তু শাস্ত্রে প্রমাণ নাই যে, যখন নদেবাসীরা শান্তিপুরে শ্রীনিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিয়াজী একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রভুকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই পত্রিকা লেখা হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিমাইয়ের প্রতি—

যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া। সে হ'তে আছেন মাতা উপোস করিয়া॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী। নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি॥
খাওয়াইতে করি যত সাধ্যসাধন। মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন॥
মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি। অকূল পাথারে দেখ পড়িলাম আমি॥

* যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥—প্রেমদাস

পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে। তা কি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে?
সন্ন্যাসী-ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি। কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি॥
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলো ভয়। পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয়॥
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর। তোমার গলার হার চরণ-নূপুর॥
কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া। রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া॥
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই। মাকে শুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয়॥
মার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয়। আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয়॥
তা'হলে সে শান্ত হবেন দুঃখিনী জননী। তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি॥
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে। তা'হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন। সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন॥
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া। গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া॥
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি। কোন দিন সংকীর্ত্তনে করেছি আপত্তি?
আছাড়ে তোমার সর্ব্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা। বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা?
খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি। বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি?
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে। মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে॥
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমি নয় রহিতাম বাপের আলয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়া কান্দিয়া। বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া॥"

শ্রীমতী কথনও ভাবিতেছেন, তিনিও একজন। পূর্ব্বে তিনি যে পৃথক্ কেহ তাহা বোধ ছিল না। এখন ভাবিতেছেন, তাঁহার শাশুড়ীকে সেবা করিতে হইবে। শাশুড়ী যাহাতে উতলা না হয়েন এইরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহার চলিতে হইবে। কথন বলিতেছেন, "সখি! আমার হাতে তিনি জননীকে রাখিয়া গিয়াছেন; আর তাঁহার আপনার স্থানে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সেই ভার কুলাইতে হইবে!" আবার বলিতেছেন, "সখি! আমার সমবয়সীরা বড় খুসী হইয়াছে, না? তাহারা ভাবিতেছে,—'খুব হয়েছে, বড় আদরিণী হইয়াছিলেন, মাটিতে পা দিতেন না।' কিন্তু এ কথা কি অন্যায় না? আমার কি

গরব হইয়াছিল ? গরব ত নয়, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল। আমি পতিসেবা করি নাই। তিনি কিরূপ গুণের নিধি তাহা তখন বুঝি নাই, প্রভুকে অনাদর করিয়াছিলাম ; তিনি আদরের ধন, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।” আবার ভাবিতেছেন জগতের সমস্ত লোক তাঁহার নিন্দা করিতেছে। ইহাতে তাঁহার উপর বড় অত্যাচার করা হইতেছে। সে অত্যাচারের নিমিত্ত অভিযোগ তিনি আর কাহার নিকট করিবেন ? তাই পতির কাছে করিতেছেন। যথা—

“আমার বয়সী যে তোমা দেখিল কত না নিন্দিল মোরে।
সে ত অভাগিনী হেন গুণমণি কেন রবে তার ঘরে ?
যদি রূপ গুণ থাকিত তাহার পতি কি যৌবনকালে।
কৌপীন পরিয়া কাঙ্গাল হইয়া গৃহ ছাড়ি বনে চলে ?
নিঠুর রমণী পাপিনী তাপিনী পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া চলিছ ফেলিয়া লোকে গালি পাড়ে মোরে ॥
আমি কি তোমায় দিয়াছি বিদায় সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া মরিছি পুড়িয়া তাহে লোক পরিবাদ
তুমি মোর পতি হইয়াছ যতি একা মোর সর্ব্বনাশ।”
প্রিয়ার রোদন তারিবে ভুবন আর বলরাম দাস ॥

কখন কখন “প্রভু” “প্রভু” বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পাড়তেছেন। তখন সখিগণ বায়ুবীজন করিতেছেন, কপোলে সজোরে জলের ছিটা মারিতেছেন, দাঁত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে না আছে পরীক্ষার লাগি নাশায় তূলা ধরিতেছেন। শুশ্রূষায় চেতন পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সখীর গলা ধরিয়া রোদন করিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে।

যে কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম, পাছে শ্রীমতীর দুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত আমার সেই কথা বলিতে হইতেছে। সে কথাটি এই যে গৌর প্রণয়িনীর গৌর বিরহে

যেমন দুঃখ, তেমনি আবার তিনি আনন্দ-ভোগও করিতেছিলেন। শ্রীভগবৎবিরহের মত দুঃখ আর নাই। শেষলীলায় প্রভু এই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ন্যায় আনন্দ আর নাই। প্রকৃত কথা, কৃষ্ণ-বিরহে যে দুঃখ সে বাহিরের। কারণ কৃষ্ণ-বিরহ উপস্থিত হইলে অন্তর আনন্দে পুরিয়া যায়। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দের কারণ বিবরিয়া বলিতেছি। মদ্যমাংসে আরাম আছে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেও অবশ্য মিষ্টতা আছে। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতেও জীবকে দেখা যায়। কিন্তু হে জীব! জীবকে দুঃখ দিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা জীবের সুখের নিমিত্ত আপনি দুঃখ লইয়া যে সুখ, সে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নির্বোধ জীব সচরাচর তাহার বিপরীত করিয়া থাকে; কিন্তু সে তাহারা জানে না বলিয়া। মনুষ্যের দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব আছে। যে ভাবগুলি পশুর আছে মনুষ্যেরও আছে, সেই মনুষ্যের পশুভাব। আর যাহা পশুর নাই মনুষ্যের আছে, তাহা তাহার দেবভাব। একটি কাকের ছানা তাহার নীড় হইতে পড়িয়া গেলে, অন্যান্য কাকেরা তাহাকে ঘেরিয়া ঠোক্‌রাইতে থাকে ও এইরূপে তাহাকে বধ করে। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এরূপ নয়। তাহারা যদি কোন অনাথশিশু দর্শন করে, তবে তাহাকে পোষণ করে। কাক পশুভাবে কাক-শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা করে, আর মনুষ্য দেবভাবে মনুষ্য-শিশুকে পোষণ করে। মনুষ্যের এই দেবভাবকে উদ্দীপনা করা ও পশুভাবগুলিকে উহার অধীন করাকে "সাধন" কি "যোগ" বলে, "উদ্ধার হওয়া" কি "মুক্তি" বলে। যখন কোন দুর্ব্বল জীব কোন সাধুর চরণে পতিত হইয়া বলে, "প্রভু, আমাকে উদ্ধার কর," তাহার অর্থ এই যে, "প্রভু আমার দেবভাবগুলি উত্তেজিত করিয়া পশুভাবগুলিকে উহার অধীন করিয়া দাও।" কিন্তু এই পশুভাবগুলির প্রয়োজন. ইহা ব্যতীত দেবভাবগুলি পরিবর্দ্ধিত

হয় না। স্থানভ্রষ্ট না হইলে এই পশুভাবগুলি বড় উপকারী সামগ্রী। যথা, স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ে দেবভাব ও পশুভাব আছে। আর এই পশুভাবে সেই দেবভাবের পরিবর্দ্ধন ও সহায়তা করে।

দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই,—প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া। এই কয়েকটি ভাবে স্বার্থরূপ মলিনতা নাই। ইহাতে স্বার্থরূপ মলিনতা স্পর্শ করিলেই উহা মলিন হইয়া যায় প্রেম কি, না—অন্যের প্রতি আকর্ষণ। ভক্তি,—অন্যের গুণে মোহিত হওয়া। দয়া,—অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ষে আনন্দ উপস্থিত হয় এবং যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সুখের তুলনাই হয় না। প্রীতির বস্তু সৃষ্টি হইবামাত্র স্বভাবতঃ আনন্দ হয়। যেমন বিবাহ-রাত্রে বরকন্যার আনন্দ। অন্যের গুণ দেখিলে আনন্দ, যেমন বাজীকরের উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্যের দুঃখে দুঃখবোধে যে আনন্দ হয় তাহাও সকলে জানেন। এইরূপে প্রেম. ভক্তি, স্নেহ ও দয়া হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়।

পতি ও পত্নী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামগ্রী। যত দিবস এই আনন্দের সহিত পশুভাব মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় না। যে দম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই দম্পতিপ্রেম হইতে অখণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতিপ্রেমে তখনই অখণ্ড আনন্দ উৎপত্তি হয়, যখন উহা হইতে পশুভাব একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কাজেই [illegible]প্রাণা-বিধবারও একবার আনন্দ আছে, যাহা সধবা-স্ত্রীর নাই। কেননা বিধবা স্ত্রীর পতির সহিত স্বার্থসম্বন্ধ রহিত হইয়া গিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া জীবের একটা ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, সুখ কেবল অসুর-ভাবেই আছে। ক্ষমতা পাইব, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিব, ইন্দ্রিয়সুখ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ

করিব, তবেই সুখী হইব। কিন্তু এ সমুদয় যে পাশববৃত্তি, তাহা যিনি পবিত্র হইয়াছেন তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ও শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রের কি ভাব তাহা অনুভব করুন। উনিও আছেন ইনিও আছেন; তাঁহাদের প্রীতি আছে, সব আছে, কেবল পশুভাব নাই। সেখানে পরস্পরের বিরহে যে দুঃখ সে আর কতটুকু? শুধু প্রীতির বস্তু হইতেই একটি সুখ হয়, প্রাপ্তির প্রয়োজন করে না। যথা,—যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা হইতেছে, তখনি বরকন্যা সুখ-সাগরে ভাসিতে থাকেন। ইনি ভাবেন, আমি আমার ধন পাইলাম, কি পাইতেছি; উনিও আবার তাহাই ভাবেন। এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে আনন্দ হয়, যদিও সে পুত্র তখন তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই।

আবার প্রিয়বস্তু যত প্রিয়ত্ব পায়েন, তিনি তত সুখের বস্তু হয়েন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন; পূর্ব্বে তিনি যেরূপ প্রিয় ছিলেন, এখন তাহাই আছেন, বরং তাঁহার প্রিয়ত্ব কোটি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি বলিয়া অতি প্রিয়। এখন উপপতির দুর্লভত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আরো প্রিয় হইয়াছেন, অধিকন্তু, তাহার পরে, তাঁহার নাগর প্রতিকূলনাগরের মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ আপনারা জানিবেন, প্রিয়বস্তু যদি দুর্লভ হন, তবে তিনি প্রিয়তর হয়েন; আবার যদি প্রতিকূল হন তবে প্রিয়তম হয়েন। তাঁহার পতি এখন তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন না, তাঁহার ছায়া দেখিলে পালাইবেন কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল হইলে কখন কখন প্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন সে প্রীতি বদ্ধমূল হয় নাই। প্রকৃত প্রীতি হইলে, নাগর যদি প্রতিকূল হন, তবে উহা আরো বদ্ধমূল হয়; ইহা প্রীতির ধর্ম্ম।

বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁহার স্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র। তাঁহার পতি তাঁহার সুখের যে প্রস্রবণ তাহা এখনও আছেন, বরং সেই প্রস্রবণ আরও বেগবান্ হইয়াছে। তাঁহার স্বামীর অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তিনি আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন। ভাবিতেছেন, "কি মানুষ! কি অদ্ভুত দয়া! জীবকে হরিনাম লওয়াইবেন বলিয়া আমাকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া গেলেন? ইহা কি কেহ কখন শুনেছে, না দেখেছে?" মাঝে মাঝে পতির সন্ন্যাসের রূপ তাঁহার হৃদয়ে আপনি-আপনি উদয় হইতেছে, আর "মলেম মলেম" বলিয়া বুকে হাত দিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছেন। তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার রাগ করা অন্যায় হইতেছে। আমাকে ফেলিয়া ত তিনি সুখী হন নাই।" যথা—

"কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাণ। ধ্রু
তোমার অঙ্গে সাটী পরা, তাঁর কৌপীন পরিধান॥
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে, তুমি থাকো গৃহ মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান॥"

আবার তখনি ভাবিতেছেন যে তিনিও একজন। এই শুভকার্য্য সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। কেবল যে একটি উপকরণ তাহা নয়—তাঁহার স্বামীর সর্ব্বপ্রধান সহায় তিনি কান্দিবেন, আর জীবও মুক্ত হইবে। এই সমুদয় ভাবে শ্রীমতীর হৃদয় যখন পুরিয়া যাইতেছে, তখন তিনি জগৎ সুখময় দেখিতেছেন, আপনাকে ধন্যা মনে করিতেছেন। আবার দুঃখে যখন নয়নজল ফেলিতেছেন, তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। উহা দ্বারা মনের দেবভাবগুলি আরো পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

এদিকে শান্তিপুরে প্রভুর কার্য্য শ্রবণ করুন। প্রভু যেরূপ নদীয়ায় বাস করিতেন, শান্তিপুরেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন; তবে গূঢ়তম সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন, রাধা কি কৃষ্ণ ভাবে আর শান্তিপুরে বিরাজ

করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান মাধুর্য্যভাবে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কোন কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েন নাই।*

শান্তিপুরে প্রভু সন্ন্যাসের সমুদয় নিয়ম ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা গৃহস্থ ভক্তগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিধান কেবল কৌপীন ও বহির্ব্বাস—সন্ন্যাসের এইমাত্র চিহ্ন; আর শ্রীমতী নিকট নাই। নদীয়া বিহারের সহিত এইমাত্র বিভিন্নতা। প্রভু সারাদিন কৃষ্ণকথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। শচী রন্ধন করেন প্রভু ভোজন করেন। শচী কত যে রন্ধন করেন, তাহার সংখ্যাও করা যায় না। প্রভুও বিশ্বম্ভর হইয়া, জননীকে সম্মুখে বসাইয়া ও তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া ভোজন করেন। ভোজনান্তে শ্রীনিতাই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। প্রভুর ভোজন হইলে সেই পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি ও মারামারি হয়, সে আর এক রঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে প্রত্যহ মহোৎসব—প্রত্যহ সহস্র লোকের আয়োজন। সমস্ত দিবস শত শত

* নানান্ প্রকারে প্রভু মায়েরে সান্ত্বায়। অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়॥
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক। সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি। অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত। নিতায়ে ধরিয়া কান্দে নিমাইপণ্ডিত॥
অদ্বৈত পশারি বাহু ফিরে পাছে পাছে। আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে॥
চৌদিকে ভকতগণ বলে হরি হরি। শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপপুরী॥
প্রভু অঙ্গে কোটিচন্দ্র জিনিয়া আভাস। এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ॥
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখি শচীমায়। বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হৃদয়॥
বুঝিয়া শচীর মন অবধৌত রায়। সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়॥
এইরূপে দশদিন অদ্বৈতের ঘরে। ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া। অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

সম্প্রদায় "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি গীত গাইতেছেন, আর সমুদায় শান্তিপুর ভক্তির তরঙ্গে "ডুবু ডুবু" হইতেছে। নদীয়াবাসীরা আগমন করিলে, প্রথম দিবসেই বিকালে, প্রভু অতি নিজজন ও অতি বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইয়া মধুর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ও জননীকে দুঃখ দিয়া ও তোমাদের অনুমতি না লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, কাজেই যাইতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে আমার বিরহে তোমরা বড় দুঃখ পাইয়াছ। জননীর দশা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আবার আমার দশা দেখিতেছ,—লক্ষ লোকের মাঝে মাথা মুড়াইয়া পৈতা ফেলিয়া কৌপীন পরিয়াছি। যদি আবার পট্টবস্ত্র পরিয়া সমাজে প্রবেশ করি, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, লোকেও উপহাস করিবে। আবার তোমাদের ফেলিয়া গেলে তোমরা দুঃখ পাইবে, জননীও প্রাণে মরিবেন। প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আর আপন সন্ন্যাসধর্ম্মকে ধিক্কার দিলাম। ভাবিলাম কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ; তাঁহার নিমিত্ত যখন সন্ন্যাস প্রয়োজন নহে, তখন আমি এ ভীষণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? জননীকে দর্শন মাত্র এই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আমি জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোথায়ও যাইব না। আর তিনি যেখানে যাইতে বলেন, সেইখানেই যাইব। এমন কি, আমি এরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে জননী যদি আমাকে এখন নদীয়ায় যাইতে বলেন, তাহা আমি যাইব, কোন বাধা মানিব না। আমি স্বয়ং যাইয়া, আমার প্রতি জননীর কি আদেশ হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু আমি যাইব না, তাহা হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আমি এই পোড়া আশ্রম অবলম্বন করায় তিনি আমাকে এখন ভক্তি করিতে

শিখিয়াছেন। আমার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিতে সাহস পাইবেন না। অতএব আপনারা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিউন। তাঁহাকে বলিবেন যে, পূর্ব্বেও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি যে, আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব; এমন কি, যদি সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব।"

এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত হইলেন। প্রভু কি বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের অনেক সময় লাগিল। প্রভু যখন জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভু কেবল জননীকে প্রবোধ দিতেছেন, মনোগত কিছু বলিতেছেন না। এখন এরূপ স্পষ্টাক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞাস্রোতে ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময় হইল। ভাবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? প্রভু তো স্বেচ্ছাময়; ত্রিভুবন একদিকে, আর তিনি একদিকে। অদ্য ষষ্ঠ দিবস মাত্র সন্ন্যাস করিয়াছেন। আজ বলিতেছেন, "মা যদি বলেন, তবে গৃহে ফিরিয়া যাইব," এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন? মা বলিবেন, "বাড়ী চল, লোকে হাসে হাসিবে, ভক্তগণ ত হাসিবে না? আর হাসিবেই বা কেন?" মা ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন? আমরা পুরুষ কঠিন, কিছু জ্ঞানও আছে। আমরাই বা কে, প্রভুই বা কে? আমরা কি বলিব? আমরা সকলেই বলিব, প্রভু বাড়ী চল। সেখানে শচী স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা এক পুত্রের মাতা, নিমাইয়ের জননী, তিনি আর কি বলিবেন? তবে কি সত্যই প্রভু আবার নদীয়ায় যাইবেন? সত্যই আবার নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ আলো করিবেন? আবার কি আমরা নদীয়ার সুখের পাথারে

সাঁতার দিব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব। এই আনন্দে ডগমগ হইয়া ভক্তগণ শচীকে যাইয়া ঘিরিয়া ফেলিবেন।

নিতাই আগেই বলিতেছেন, "মা! বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি বলিলেই হয়। প্রভু বলিতেছেন, তুমি বলিলেই, তিনি গৃহে গমন করেন।" শ্রীঅদ্বৈত তখন নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া শচীকে বলিতেছেন, "ঠাকুরাণি প্রভু তোমার দুঃখ দেখিয়া বড় সন্তপ্ত হয়েন, হইয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে তুমি যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন। এমন কি, এখন যদি তুমি বল, তবে শ্রীনবদ্বীপে যাইয়া পুনরায় সংসার করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আপনার কি আদেশ তাহাই শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনি আসিতেছেন, তবে তাঁহার সম্মুখে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

যখন শ্রীঅদ্বৈত এই কথা বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ অতি আগ্রহ সহকারে শচীর—শ্রীঅদ্বৈতের নয়—মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী সমুদায় কথা শুনিলেন ও বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাইলেন না, তবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া মস্তক অবনত করিলেন। শচীর এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহাদের বিলম্ব সহিতেছে না; তাঁহারা বলিলেন, "মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেল যে নদে চল,—আর কি?"

শচী ভক্তগণের কথার উত্তর করিলেন না, তবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন। শচী বলিতেছেন, "আমার সাধ কি তাহা আমার কাছে তাঁহার জানিতে পাঠান নিষ্প্রয়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে শুইবেন,

ইহা আমার সাধ হইতেই পারে না। তাঁহাকে যদি বাড়ী লইয়া যাই, তবে আমার, বিষ্ণুপ্রিয়ার ও তোমাদের দুঃখ মোচন হইবে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট হইবে, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিবে। আমি মা হইয়া এরূপ কার্য্য কিরূপে করিব? আমি মরিব সেও ভাল, তবু যাহাতে নিমাইয়ের ধর্ম্মনষ্ট হয়, এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিব না।”

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যখন নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে সর্ব্বজীবের নাথ! আমার শিশুসন্তান সন্ন্যাস করিয়াছে, যেন তাহার ধর্ম্ম নষ্ট না হয়,” অর্থাৎ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া যেন সে বাটী ফিরিয়া না আইসে। আবার এখন শচী নিমাইকে করতলে পাইয়া ভাবিতেছেন, নিমাইকে বাড়ী নিয়া গেলে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। তাহার পরে শচীদেবী বলিতেছেন, “যখন তিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন আর উপায় নাই। তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকট অনুমতি চাহিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে আমা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, এবং তাহা জানিয়াই আমার উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমিও আমার যাহা উচিত তাহাই করিব। আমি ভাবিতেছি যে; তিনি নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, তাহাতে তাঁহার সংবাদ পাইব। আর তিনি যদি গঙ্গাস্নান করিতে আইসেন, তবে তাঁহার দর্শন পাইব। এই কথা বলিতেছেন, আর শচীর মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে, এবং চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বোধ হইতেছে।

ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া চকিত, ও কেহ বা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শচী ও প্রভুকে অগ্রে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপে যাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, এখন শচীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভক্তগণের অবস্থা একবার ভাবুন। তাঁহারা শ্রীনিমাইকে শ্রীভগবান্ বলিয়া জানিয়াছেন ও তাঁহাকে প্রকৃতই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রীতির ভজন করিয়া একেবারে বালস্বভাব পাইয়াছেন। তাঁহারা জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাণীকে ভজনা করেন। তিনি কে, না—ভালবাসা। যদি তাঁহারা দেখেন, যে পক্ষী তাহার শাবককে আহার দিতেছে, তবে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের উদয় হয়, ও নয়নে জল আইসে। যদি দেখেন কপোত-কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরস্পরে প্রণয়সুখ অনুভব করিতেছে, তবে তাঁহাদের আনন্দাশ্রু পতিত হয়। তাঁহাদের নিকট নিয়ম বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রভু সুন্দর-নাগর হইয়া বসিয়া থাকুন আর তাঁহারা কেবল মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিউন। এই তাঁহাদের ভজন সাধন ও চরম আশা।

ভক্তগণ শচীর বাক্য শুনিয়া হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরাণি! কর কি? তুমি বিদায় করিলে, তিনি থাকিবেন কেন? তোমার বাক্য তাঁহার নিকট চিরদিন বেদবাক্যের ন্যায়। তবে ত তোমার কথায় আমরা প্রভুকে হারাইলাম।" যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে*—

ফল কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাস-ঘাতকতা করিলেন। তাঁহাদের শচীদেবীকে কোন পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ছিল না। পাছে স্বয়ং গমন করিলে শচীর মন কোন প্রকারে বিচলিত হয়, এই নিমিত্ত তিনি ভক্তগণকে পাঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন

---

* শচীর বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ। বিবশ হইয়া রহে করিয়া রোদন॥
হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে। শ্রুতিবাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে। দুর্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কেনবা কহিলে॥

না। ভক্তগণের উপর এইমাত্র ভার ছিল যে, তাঁহারা শচীর নিকট সমুদায় অবস্থা সরলভাবে বলিবেন, বলিয়া তাঁহার সরল অভিপ্রায় কি তাহা জানিয়া আসিবেন। তাঁহারা একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শচীর পরামর্শ যাহাতে তাঁহাদের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন।

শচী সেই দুঃখের মাঝে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার নিমাই যখন ত্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার ত্যাগ করিল, তখন আমি সেখানে থাকিলে তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন, আমি বলিব যে, 'নিমাই! তুমি আমার সুখের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ও ধর্ম্ম-নষ্ট কর, ইহা আমার দ্বারা হইবে না। নবদ্বীপের নিকট কোন স্থানেও তিনি থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আমি বৌমা ও তোমরা, তাঁহাকে বিরক্ত করিব, আর কুলোকে নানা কথা বলিবে; আমি নিমাইকে লইয়া পরচর্চ্চা করিতে দিব না," তখন সকলে বুঝিলেন, শচীর সংকল্প অতি দৃঢ়। ইহাতে অনেকে মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠক শচীর স্থানে আপনাকে রাখিয়া তাঁহার এই কার্য্যের বিচার করিবেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে এরূপ জননী না হইলে, তাঁহার গর্ভে কেন শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন? শচী নিমাইকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না,—"হা নিমাই" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন। একবার রঙ্গ দেখুন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। শ্রীপ্রভু সেইরূপ রাধাভাবে বিভোর হইয়া যোগিনীবেশে তাঁহাকে মথুরায় তল্লাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার রাধাভাব গেল। তখন দীনের দীন ভক্তরূপে মুকুন্দ ভজনের জন্য বৃন্দাবনে চলিলেন। আবার বৃন্দাবন গেল, মথুরা গেল, এখন নীলাচলে চলিলেন! কিন্তু প্রভুর তখন বৃন্দাবনে যাইবার

সুবিধা হয় নাই। কারণ মুসলমানের অত্যাচারে সেখানকার ভদ্রলোকগণ অন্যত্র গিয়াছেন। কেবল দরিদ্র ও মূর্খ লোক সেখানে আছে। তাই ঐস্থান তাঁহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, লোকনাথ ও ভূগর্ভকে সেখানে পাঠাইয়াছেন।

ভক্তগণ প্রভুকে শচীর আজ্ঞা জানাইলেন। প্রভু অমনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া উঠিলেন; শেষে বলিতেছেন, "জননীর আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। আমারও নীলাচল-চন্দ্রকে দর্শন করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, সে বাসনা পূর্ণ হইল!" প্রকৃতই তখন নীলাচল ব্যতীত প্রভুর থাকিবার উপযুক্ত স্থান আর ছিল না। ভারতবর্ষে তখন প্রধান তীর্থস্থান ছিল—পাণ্ডুপুর, বারানসী ও নীলাচল। বৃন্দাবন তখন অরণ্যময়। পাণ্ডুপুর অতি দক্ষিণে, বাঙ্গালা হইতে বহু দূরে। কাশী যাওয়ার পথও অরাজকতায় একরূপ বন্ধ ছিল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ পূর্ণিয়া দিয়া বৃন্দাবনে যান। প্রভু বারাণসীতে থাকিলে বাঙ্গালার গৃহস্থ-ভক্তগণের সেখানে যাওয়া প্রায়ই ঘটিত না। একমাত্র নীলাচল তখন সমৃদ্ধশালী, বাঙ্গালার নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্য তখন বাঙ্গালার মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত ছিল। উহা অতিক্রম করিয়া মুসলমানদের যাইবার অধিকার ছিল না। এই নীলাচলে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ যাইতেন। কাজেই ইহাই প্রভুর বাসোপযোগী স্থান। যাত্রীগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া প্রভুকে পাইতেন ও উদ্ধার হইতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হইল, প্রভু নীলাচলে থাকিবেন। প্রভু যাইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ অতিশয় কাতর হইলেন, তবে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। সন্ধ্যার পরেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, অমনি মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়া

উঠিল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্তু প্রভু প্রফুল্ল-বদনে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিলেন। প্রভুর এই কীর্ত্তন অন্তরূপ। দুই বাহু তুলিয়া, মধুর ভঙ্গি করিয়া "হরিবোল" বলিয়া মৃদঙ্গ ও করতালের তালে-তালে, পায়ে নূপুর দিয়া নৃত্য। গীত গাইয়া আলাপ করিয়া, রঙ্গের মৃদঙ্গ বাজাইয়া, আসর জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না। তবে প্রভু যখন বসিয়া কি অন্তরালে থাকিতেন, তখন মুকুন্দ বাসু শ্রীবাস রামানন্দ প্রভৃতি গান গাইতেন। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায়, সেইরূপ প্রভু আসিবামাত্র তাঁহাকে হারাইবেন বলিয়া ভক্তদিগের যে উদ্বেগ তাহা থাকিত না। ক্রমে সকলে নৃত্যে যোগদান করিতেন। প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখপদ্মে আঁখি রাখিয়া, বক্র হইয়া, থুতনিতে হস্ত দিয়া, ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য অদ্বৈতের ভঙ্গী। আর জোড়ে-জোড়ে লম্ফ দেওয়া নিত্যানন্দের নৃত্য। তবে নিত্যানন্দ নৃত্যে প্রায় যোগদান করিতে পারিতেন না। প্রভু পাছে পড়িয়া যান বলিয়া, দুই বাহু প্রসারিয়া তিনি প্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন—গদাধর ও নরহরি।

শচী পিঁড়ায় বসিয়া; কাছে সীতাদেবী প্রভৃতি। শচী যে কীর্ত্তন দেখিতেছেন কি শুনিতেছেন তাহা নয়। নিমাই ঘুমান নাই, তিনি কিরূপে শুইবেন? আর মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাকিলে নিমাইয়ের ভালরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইবে। তাই নিমাই নাচিতে নাচিতে পড়িবার মত হইলেই শচী উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "নিতাই ধর ধর, নিমাই পড়িয়া গেল।" নিতাই অবশ্য প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা করিতেছেন; তবু মায়ের প্রাণ, তাই শচী সর্ব্বদা নিতাইকে সাবধান করিতেছেন। শচী সেখানে বসিয়া আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, কারণ কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া নাই। মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হওয়ায়

শিহরিয়া উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে পড়-পড় দেখিয়া উহা ভুলিয়া যাইতেছেন। শচী যে ঠিক একা আছেন, তাহা নয়। কারণ মুরারি পিঁড়ার নীচে তাহার কাছে দাঁড়াইয়া। মুরারিও শচীর প্রায় পুত্রের ন্যায় নিজ জন। মুরারি নৃত্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় শচীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার কীর্ত্তনানন্দের উদ্গম অন্তর্হিত হইল। অমনি শচীর কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একরকম সামলাইতে না পারায় প্রভুর সুদীর্ঘ দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। প্রভু যেরূপ ভাবে পড়িলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইল। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আর শচী "নিতাই ধর ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন নিতাই ঠেকাইতে পারিলেন না, তখন পুত্রের পতন দেখিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিলেন, আর পতনশব্দ শুনিবেন না বলিয়া কানে অঙ্গুলি দিলেন। এইরূপে চোখ ও কান বুজিয়া গোবিন্দ-নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিমাই চৈতন্য পাইলেন কি না দেখিবার নিমিত্ত নয়ন অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিলেন। যদি দেখিলেন, নিমাই চেতন পান নাই, তবে আবার নয়ন মুদিয়া গোবিন্দের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই চেতন পাইলে, শচী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "বাঁচলাম ঠাকুর! কিন্তু নিমাই আবার পড়িলেন! তখন শচী একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন। শেষে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তোরা কীর্ত্তনে ক্ষান্ত দে। রাত্রি অধিক হয়েছে। কিন্তু সেই আনন্দসূচক হরিবোল-ধ্বনি মধ্যে কে তাঁহার কথা শুনে? একটু পরে আবার বলিতেছেন; "তোরা নিমাইকে ছেড়ে দে; আহা! বাছার আমার আছাড়ে আছাড়ে হাড় ভেঙ্গে গেল।" আবার একটু পরে বলিতেছেন, "লোকের রীতি দেখেছ?

বাছা আমার সন্ন্যাস করেছে বলে কি শরীরে ব্যথা লাগে না?" তবু কেহ শুনিতে পাইল না। তখন নিতাই, নরহরি, শ্রীবাস প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কেহই শুনিতে পাইলেন না। শেষে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকেই ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো! একবার অদ্বৈত আচার্য্যকে ডাকিয়া দাও ত?" শচীর এই সব ভাব-তরঙ্গ মুরারি দেখিতেছেন, আর মনে মনে বিচার করিতেছেন। কখন বা প্রভুর উপর তাঁহার রাগ হইতেছে, আর বলিতেছেন, "প্রভু, একবার মায়ের দশা দেখে যাও।" মুরারি, শচীর দশা দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে সেই অবস্থাটি বর্ণনা করিয়া, এই পদটি বান্ধিলেন—

"ধর ধর ধর রে নিতাই, আমার গৌরে ধর। ধ্রু
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর।।

আচার্য্য গোসাঞি, দেখিহ নিতাই, আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্ত্তনে, পরাণে হইবে হারা।।
শুনহে শ্রীবাস, করেছে সন্ন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোণার বরণ, ননীর পুতলী, ব্যথা না লাগয়ে গায়।।
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন, অধিক হইল নিশা।
কহয়ে মুরারী, শুন গৌরহরি, দেখ হে মায়ের দশা।।

আচ্ছা ঠাকুরাণি! আজ নিমাই তোমার কাছে আছেন, ইহার উহার খোসামোদ করে তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইতেছ। দুই চার দিন পরে তিনি কোথা থাকিবেন? তখন তিনি পড়িয়া গেলে কে ধরিবে? কিন্তু শচীর তাহা মনে উদয়ই হয় নাই। এই যে জীবে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, ইহার ন্যায় মনুষ্যের শ্রেয়ঃ আর নাই। অতএব এই আকর্ষণ জীবের সেব্য বস্তু। যিনি ইহাকে অবহেলা করেন, তিনি ঈশ্বরদত্ত যে প্রকৃতি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে একটি দৈত্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন! এই যে জীবে জীবে আকর্ষণ, ইহা লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে "সম্বন্ধ জীবনাবধি।" তাহা

হইলে জীবনের পরেও প্রিয়বস্তুর জন্য প্রাণ কান্দে কেন? শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সম্বন্ধ জীবনাবধি হইলে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বস্তুর স্মৃতিও চলিয়া যাইত। প্রিয়বস্তুর সহিত এরূপ চির-সম্বন্ধ যে, আপনার "আমিত্ব" না ভুলিলে তাহাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

তুমি কে? ইহা ঠাহুরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি কর্দ্দম-পিণ্ডের মত হইয়া জন্মাইয়াছিলে। পরে এ জগতে আসিয়া তোমার মা কে, বাবা কে, ভ্রাতা কে, সন্তান কে, প্রিয়জন কে, তাহা শিক্ষা দিয়া তোমাকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়াছে। তুমি আপনাকে ধ্বংস না করিলে এ সমুদায় শিক্ষার ফল ভুলিতে পারিবে না। তোমার অবশ্য এক জন প্রিয়বস্তু আছে, আর অবশ্য তুমি বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছ। কিন্তু দেখিবে যে, যদিও তোমার প্রিয়বস্তু আর এ জগতে নাই, তবুও সে ছবির মত তোমার হৃদয়-মন্দিরের প্রাচীরে ঝুলিতেছে। যদি তাহাকে ভুলিতে পারিতে, তবে তাহার সহিত পুনর্মিলন না হইতেও পারিত। কিন্তু যখন সেই অতিশয় স্নেহশীল শ্রীভগবান্ তোমার প্রিয়জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে বস্তু তিনি তোমার নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমুদায় সম্বন্ধ ভুলিতে পার না, তখন কি তুমি ভাবিতে পার যে, শ্রীভগবান্ চিরদিনের নিমিত্ত তোমাকে এই বিয়োগ-জনিত দুঃখ দিবেন? তুমি কি এরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি শোকাকুল জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চিরদিন পৃথক রাখিতে পারিতে? তুমি যে কার্য্য নিষ্ঠুর ভাব, তিনি তাহা করিতে পারিবেন কেন? নিমাই দুই দিন পরে কোথা যাইবেন ঠিক নাই। শচী তাহা ভুলিয়া পুত্র ধূলায় না পড়েন, ইহার নিমিত্তে ব্যস্ত হইতেছেন। মৃতপুত্র গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার মস্তকে ছত্র ধরা হইয়াছে,—পাছে তাহার

মুখে রৌদ্র লাগে! এই যে জীবে জীবে সম্বন্ধ, ইহাই জীবের উপাস্য দেবতা, ইহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী রাধা, আর ইঁহার সেবা দ্বারাই শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে, অর্থাৎ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।

প্রভাতে ভক্তগণ সাব্যস্ত করিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন "ভিক্ষা" দিবেন। প্রভু এখন সন্ন্যাসী। প্রভুকে আর কেহ "ভোজন" করাইবেন, কি "নিমন্ত্রণ" করিবেন, একথা বলিবার যো নাই। প্রভুকে এখন "ভিক্ষা" দেওয়া যায়, আর প্রভুও "ভিক্ষা" ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেছেন না। অর্থাৎ জননীকে সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা কিছু দেখিতে দিবেন না, এই তাঁহার সংকল্প! ভক্তগণ প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন একথা যখন প্রকাশ হইল, তখন শচী শুনিয়া বড় কাতর হইলেন। তিনি শ্রীবাস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে বাধা দিতে পারি না। কিন্তু আমার ইচ্ছা, নিমাই আর যে কয়েক দিন এখানে থাকেন, আমি আমার সাধ পুরিয়া তাঁহাকে খাওয়াই। তোমরা আবার তাঁহার দর্শন পাইতে পারিবে, আমার কিন্তু এই শেষ দেখা। তোমাদের অনুমতি পাইলে আমি জনমের মত নিমাইয়ের একবার সেবা করিয়া লই।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ তখনি সম্মত হইলেন। নিশিযোগে কীর্ত্তন, দিবাভাগে সুরধুনীতে স্নান, শচীর হস্তে অন্ন ভোজন, সারাদিন কৃষ্ণকথা, এইরূপে ৫ দিন কাটিল। প্রভু কবে কি করিবেন, তাহা কেহ কিছু জানেন না। ষষ্ঠ দিন প্রভাতে প্রভু প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি নীলাচলে চলিলাম।" সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"সেকি!" প্রভু নীলাচলে চলিলেন, এ কথা মুখে মুখে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। এই কথা শুনিয়া, যে যেখানে ছিলেন দৌড়িয়া আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া

ফেলিলেন। শচী এলো-থেলো বেশে, যত দূর পারেন দৌড়িয়া আসিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন।

নিমাইচন্দ্রের ভাব, যেন তখন সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে, অমনি অমনিই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু শচী এবং ভক্তগণ যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভুর সে ভাব গেল। তিনি যাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমেই শ্রীহরিদাস চরণতলে পড়িয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রভু! আমাকে কার কাছে রেখে যাও? আমি ত নীলাচলে যাইতে পারিব না।" হরিদাসের ন্যায় গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের দশা দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। হরিদাস স্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার উপর তিনি দৈন্য করিতে থাকিলে দয়াময় প্রভু বড় ক্লেশ পাইতেন। প্রভু কঠিন হইয়া বিদায় লইতে ছিলেন, কিন্তু হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "হরিদাস! তোমার কাতরোক্তিতে আমার বুক বিদীর্ণ হয়।" তখন হিন্দু মুসলমানে ঘোর বিবাদ চলিতেছে। উড়িষ্যা হিন্দুরাজ্য, সেখানে মুসলমান গেলে বধ্য হইত। ফকির হইলেও রাজদূত-সন্দেহে নিস্তার পাইত না। হরিদাস এখন পরম ভাগবত হইলেও পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন। কাজেই তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! আমি শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।"

ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভু যখন চলিলেন, তখন তাঁহাকে রাখে কাহার সাধ্য? তবু তাঁহারা বিবাদের কথা উঠাইয়া বলিলেন, "উড়িষ্যার যাইবার পথ একেবারে বন্ধ। পথ পরিষ্কার হইলে যাইবেন।" প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন, "নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, আমাকে কে রোধ করিবে।" তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন,

"প্রভু! আর কয়টা দিন থাকিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" শ্রীঅদ্বৈতের কথা প্রভু পারতপক্ষে উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু বলিলেন "তাই হবে।" অমনি সকলে আনন্দ বিহ্বল হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া এক ব্রাহ্মণ-তনয় প্রভুকে দেখিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর গাত্র কান্থাদ্বারা আবৃত থাকায় ব্রাহ্মণ-তনয় প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পাইতেছেন না। মুখখানি দেখিতেছেন চন্দ্রের ন্যায়। ভাবিতেছেন, মুখ এত মিষ্ট, অঙ্গ না জানি কেমন! প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখিবার ব্যাকুলতা ক্রমে তাঁহার এত বাড়িল যে, শেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার কাঁথাখানি হঠাৎ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। মুরারি বলিতেছেন,—কান্থাখানি অপসৃত হইলে বোধ হইল যেন মেঘাবৃত চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গের রূপ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!" ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে চমকিত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ও তাঁহার দশা দেখিয়া সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন,—প্রভু একটু লজ্জা পাইলেন।

শ্রীভগবান্ জীবকে রূপ আস্বাদন করিবার যে শক্তি দিয়াছেন তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তিনিই জানেন। এই "রূপ" দুই ভাগে বিভাগ করিয়া পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির কথা একবার মনে করুন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া পুরুষ মোহিত হইবে। কিন্তু তাহাকে কোন স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহার যে রূপ আছে, সে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। সেইরূপ কোন পুরুষের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল আসিবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাঁহার রূপের মাধুর্য্য বুঝিতেই পারিবে না।

জীবের এই প্রকার প্রকৃতি জানিয়া তিনি স্বয়ং মনোহর রূপ ধরিয়া থাকেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, বন্ধু—

"এনা ছাঁদে কেনা বান্ধে চূড়। চূড়ায় মজালে জাতি কুল ॥ ধ্রু ॥
কার না আছে ও দুটি নয়ন। তোমার অরুণ করুণ আঁখি আন ॥"

শ্রীমতী বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি যে ছাঁদে চূড়া বাঁধিয়াছ ওরূপ ছাঁদে অনেকেই বাঁধে, তবে তোমার চূড়া অন্য রূপ হয় কেন? আবার তোমার যেমন দুটি চোখ, ঐরূপ ত অনেকেরই আছে, তবে তোমার চোখে এরূপ প্রাণ কাড়িয়া লয় কেন?" ইহার উত্তর এই—তিনি রূপের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানেন। শ্রীভগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাঁহার নাম রসিকশেখর। তুমি ভাবিতে পার যে, যদি শ্রীভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীগৌর রূপ ধরিয়া তোমার সম্মুখে আসেন, হয়ত তুমি সুখ পাইবে না। কিন্তু সে ভয় তোমার নাই। যদি তিনি আসেন, তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াই আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা করিবে, "হে নাথ! হে সুন্দর! হে নয়নানন্দ! হে বঁধূ! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। তোমার রূপ আমার এ দুটি আঁখিতে ধরিতেছে না।" বিজয় আখরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। শ্রীবাসের মুসলমান দরজীও শ্রীগৌরাঙ্গের গুহ্যরূপ চকিতের মত দেখিয়া "দেখেছি", "দেখেছি", বলিয়া পাগল হন। এইরূপ রসাস্বাদনই জীবের চরম গতি। জীব পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী লইয়া যে রস শিক্ষা করে, তৎদ্বারা সাধনাকে শ্রীভগবানের মধুর ভজন বলে।

শ্রীনিমাই শ্রীঅদ্বৈতের অনুরোধে আর কয়েক দিন থাকিলেন। এইরূপ শ্রীঅদ্বৈত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন। * তখন—

"সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারও নাহি মনে। আনন্দে গৌয়ায় দিবা রাত্রি সংকীর্ত্তনে॥"

পর দিবস প্রভাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, তিনি তখনই যাইবেন। ইহা শুনিয়া সকলে আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, শচীও আসিলেন। প্রভু মাঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্শ্বে

* "শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র-মুখ। ভোজন করয়ে পূর্ণ হৈল নিজ সুখ॥" চৈঃ চঃ

প্রভু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে অহৈতুকী প্রীতি করিয়া থাক। সে ঋণ শোধ করিব এমন আমার কিছুই নাই। তোমরা গৃহে যাইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর। আমি নীলাচলে চলিলাম ; দেখি, যদি নীলাচলচন্দ্র আমাকে দয়া করেন।" নীলাচলচন্দ্রের স্মরণ মাত্র, প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চলিলেন। শচী উঠিয়া পুত্রের গলা ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। প্রভু যাইবার পূর্ব্বে কি করিলেন, তাহা বাসু ঘোষের বর্ণনায় দেখুন—

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে, ভকত প্রবোধ করে, কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত যোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি, সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে ॥
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস, পরিনু অরুণ বাস, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়ে।
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস, তোমা সবা অনুমতি লয়ে ॥
নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে, তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ করি, অদ্বৈত ধরিয়া দিচে কোল ॥
শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে, নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে, শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥

তখন,

"চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়। ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায় ॥" চৈঃ মঃ

এদিকে হরিদাস প্রভুর চরণে পড়িয়া করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তুমি যেরূপ করিয়া আমায় চরণ ধরিলে, তুমি কৃপা কর যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণ ধরিতে পারি" নীলাচলচন্দ্রের নাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন জলে পুরিয়া আসিল। ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভুকে আর রাখিতে পারিবেন না। তবু আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস মুখপাত্র

হইয়া প্রভুকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু ! আমরা ছার, তুমি স্বতন্ত্র-পুরুষ ; আমরা মলিন, তুমি পবিত্র ; আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তুমি জ্ঞানময় ; আমরা মায়ায় অভিভূত, তুমি তাহার অতীত ;—আমরা তোমার গতিরোধ কিরূপে করিব ? চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ। কিন্তু আমরা মুগ্ধজীব, তুমি যেরূপ প্রকৃতি দিয়াছ, তাহার অধীন হইয়া কিছু বলিব, প্রভু ক্ষমা করিবে। তুমি অসাধনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তোমার বিনোদলীলা দেখাইলে, আবার এখন ভুবন অন্ধকার করিয়া তোমার এই অসহনীয় লীলা দেখাইতে চলিলে। আমরা কি অপরাধে এ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই ? তুমি যাইতেছ তাহা নহে, আমাদের প্রাণ মন বুদ্ধি, এমন কি, পঞ্চেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছ। আমরা থাকিব কিরূপে ? প্রভু ! তুমি বলিতে পার যে, আমরা যাহা অসাধনে পাইয়াছি সেই বিস্তর। আমরা ছার, কিন্তু তুমি যাঁহার উদরে জন্ম লইয়াছ, আর যাঁহাকে পদসেবার অধিকারী করিয়াছ, সেই শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবস্থা মনে কর ? মা-জননীর দশা চেয়ে দেখ। বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়ায়, তাঁহার ক্রন্দনে পাষাণ পর্য্যন্ত ঝুরিতেছে। (১) প্রভু ! জীবকে করুণা করিতে যাইতেছে, তবে নিজ জনকে কেন দুঃখ দিতেছ ? ন'দের চাঁদ এখন নীলাচলে উদয় হইতে চলিলেন, ইহা কি প্রাণে সহে ? প্রভু, বিনোদলীলা করিয়া বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখাইলে, কীর্ত্তন-সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা উঠাইলে, এখন কেন বিষ উঠাইতে যাইতেছ ? ন'দের ধন ন'দে চল, সংকীর্ত্তন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির প্রয়োজন ? নাগরবেশ ধরিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, এখন কাঙ্গাল হইয়া সম্মুখে উদয় হইলে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে !

(১) "হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী। কান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। পশু পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝুরে।" চৈঃ মঃ

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত চরণ দুখানিতে হাঁটিয়া হাটিয়া ব্রণ হইবে। (২) বৃক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়া উপবাস করিবে,—ইহা অপেক্ষা আমাদের কোটী বার মরণ ভাল। প্রভু! আমাদের বুকে নিজ হাতে শেল মারিও না।" শ্রীবাস এইরূপ বলিলেন, আর কেহ প্রভুর পায় ধরিলেন, কেহ মাটিতে পড়িলেন, কেহ বা করযোড়ে প্রভুর মুখ-পানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, শ্রীবাস আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! শচীমায়ের নিকট কি বলে বিদায় লইবে? বিষ্ণুপ্রিয়া এ কথা শুনিবামাত্র যে মারা যাইবেন। আমরা আর কি তোমার চন্দ্রবদন, তোমার মধুর নৃত্য দেখিতে পাইব না? আর কি নাচিতে নাচিতে আমাদিগকে কোলে করিবে না? আর কে আমাদের মধুর দর্শন দিয়া প্রেমানন্দে ভাসাইবে? হা কষ্ট! হা কষ্ট! এইরূপে দুঃখ দিবে বলিয়াই কি আমাদের পাষাণ হৃদয় কোমল করিয়াছিলে?

তিনটি বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্টক। প্রিয়া, জননী ও ভক্তগণ। একটির হাত এড়াইয়াছেন, কারণ বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনবদ্বীপে। ভক্তগণ ও জননী প্রভুকে ফিরাইয়া আনিবেন, এই ভরসায় আশা-পথ চাহিয়া তিনি নদীয়ায় রহিয়াছেন। তবুও দুইটি কণ্টক, জননী ও ভক্তগণ সম্মুখে। জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই তিনি দার্ঢ্য অবলম্বন করিয়া, চুপ করিয়া ও নিমেষহারা হইয়া পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া আছেন, বড় বাধা দিতেছেন না। এখন ভক্তগণকে নিরস্ত করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণ্যরসে পূর্ণ, নয়নদ্বয়

---

(২) "একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন মাগিবে কাহাকে?
শচীর দুলাল তুমি দুর্লভ চরিত। দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥
ভক্তগণ অমিয় নয়ন দিঠি পাতে। এ দেহ প্রেমের তনু বাড়ে হাতে হাতে॥" চৈঃ মঃ

তাহার সাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রভু তাহা নিবারণ করিতেছেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার মনের কথা শুন। আমি নীলাচলে বরাবর বাস করিব। আমি আসিব, তোমরা যাইবে, সুতরাং সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কোন ভক্ত বলিলেন, "প্রভু! তোমাকে আমাদের আর বিশ্বাস নাই। তুমি সত্য করে বল যে, নীলাচলে তোমার বরাবর বাস হইবে।" প্রভু বলিলেন, "আমি সত্য করিলাম, নীলাচলে বরাবর বাস করিব।"* এই কথা শুনিয়া সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, প্রভু যদি নীলাচলে বাস করেন, তবে সে সবে ২০ দিনের পথ, সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেই হইবে। তখন শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "নিমাই! তোমার মুখখানি কি আমি আর দেখিতে পাইব না?" ইহা শুনিয়া প্রভুর নয়ন আর বাধা মানিতে চাহে না, কিন্তু নিজে শক্তিধর বলিয়া নয়নকে বাধ্য করিলেন। শেষে বলিলেন, "মা! পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব।" এখানে একটি কাহিনী বলিতেছি। প্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম উপেন্দ্র। বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। প্রভুর খুল্লতাত-তনয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী" গ্রন্থ প্রণেতা। সেখানি ছাপা হইয়াছে। উহাতে লেখা আছে, নিমাই যখন মাতৃগর্ভে, তখন জগন্নাথ সস্ত্রীক ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে যান। সেই সময় প্রভুর মাতামহী শোভাদেবী স্বপ্নে দেখিতে পান তাঁহার পুত্রবধূ শচীর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান্ প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন, তোমার বধূকে সত্বর শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দাও। আমি শ্রীনবদ্বীপ ভিন্ন আর কোথাও ভূমিষ্ট হইব না।" প্রাতে শোভাদেবী শচীকে স্বপ্নের কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন, "মা! তুমি অঙ্গীকার কর তোমার পুত্রকে

---

* "সত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার। নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার॥" চৈঃ মঃ

একবার আমাকে দেখাইবে।" শচী স্বীকার হইলেন। শান্তিপুর হইতে পুত্রের চলিয়া যাইবার সময়, সেই কথা মনে হওয়ায়, তাঁহাকে ইহা বলিলেন। নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়া অন্য দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট্ট গমন করেন ও পিতামহীকে দর্শন দেন। এই কাহিনী ঐ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

জননীকে এই কথা বলিয়া প্রভু আবার "হরিবোল" বলিলেন। "হরিবোল" শব্দটি চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আরও মধুর হইয়াছিল। আবার এই চারিটি অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে কি মধুর লাগিত, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে "হরিবোল" শব্দটি বজ্রের ন্যায় শ্রুতি-দুঃখকর বোধ হইল।

রসলোলুপ পাঠক! একবার "অক্রূর-সংবাদ" গীত শ্রবণ করিবেন। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ, শচীকে যশোদা, ভক্তগণকে গোপী আর শ্রীমতী রাধা যে কুঞ্জের আড়ালে দাঁড়াইয়া গমন দর্শন করিতেছিলেন, তাহা শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভাবিলে শ্রীগৌরাঙ্গের শান্তিপুর-ত্যাগ-লীলা কিছু অনুভব করিতে পারিবেন। যথা:—

এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল। সত্বর চলিলা উঠে ক্রন্দনের রোল॥
মাতাকে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন। এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥ চৈঃ মঃ

কবি কর্ণপুর, প্রভুর বিদায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার। শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার॥
প্রভু বলে "মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে। সর্ব্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে॥
যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার। কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার॥"

প্রভু যদি চলিলেন, তখন শান্তিপুর তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কেবল শচী ছাড়া। শচী পুত্রকে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া চলিবেন। তিনি পুত্র পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ। কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ। উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ॥

যখন সমস্ত শান্তিপুর প্রভুর পশ্চাৎ চলিলেন, তখন প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা গৃহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কর। তোমরা ভাবিতেছ, আমার বিহনে দুঃখ পাইবে। তাহা, কেবল তোমরা কেন, আমার জননীও পাইবেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ডুবিলে জীবের দুঃখ থাকে না। তোমাদের সেই বহুমূল্য সম্পত্তি রহিল। তবে আমার নিমিত্ত বিরহ-কষ্ট,—তাহার ঔষধ আমি বলিতেছি; যিনি অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন, তিনি আপনার ক্রোড়ে আমায় দেখিতে পাইবেন।" (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)—

"কাহারো হৃদয়ে নাহি রবে দুঃখ শোক। সংকীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্ব্বলোক ॥
কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥"

ইহা বলিয়া প্রভু সজল নয়নে করজোড়ে ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সেই কারুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ আর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। এই সংসার-অরণ্য। রোগ শোক নৈরাশ্য দারিদ্র্য প্রভৃতি ব্যাঘ্র সর্প ভল্লুক সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। জীব ভবসাগর পার হইবে বলিয়া করুণাময় প্রভু ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইলেন, এবং যাহাতে সংসারে দুঃখ না পায় তজ্জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় শ্রীপ্রভু আজ্ঞা করিয়া গেলেন যে, দুঃখের একমাত্র ঔষধ ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তন; সেই কীর্ত্তন করিয়া যে সুধাসমুদ্র উঠিবে, তাহাতে অবগাহন করিলে দুঃখ দূর হইবে।" অতএব হে পুত্রশোকিন! যদি পুত্র-বিয়োগরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া থাক, তবে একদল কীর্ত্তনীয়া আনিয়া শ্রীভগবানের জয় দিয়া এইরূপ একটি গান শ্রবণ করিবে; যথা—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি ত আমার বঁধু সকলি তোমার। তোমার ধন তোমায় দিব কি দায় আমার ॥
সকলি তোমার দেওয়া আমার কিবা আছে বাছিয়া লওহে বন্ধু যাহা তোমার ইচ্ছে।
নরোত্তম দাসে কহে শুন গুণমণি। তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি ॥

কোনও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "শ্রীভগবদ্গুণ-কীর্ত্তনে, সংসারে রোগশোকাদি-রূপ দুঃখ কিরূপে নাশ হইবে? জড় পদার্থের সহিত অজড়-পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে?" এ প্রভুর কথা, ইহার উত্তর তাঁহারই দেওয়া উচিত, আমি কিরূপে দিব? তবে যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি। শ্রীভগবদ্গুণ-কীর্ত্তনে চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল হয়, ও অনেক দুঃখ যে কেবল ভ্রম মাত্র, তাহা দেখা যায়; এবং অনেক আনন্দ, যাহা লুক্কায়িত আছে, ক্রমে নয়নগোচর হয়; আর তিনি যে জাগরিত থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীর্ত্তনে এ জ্ঞানটি যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের শক্তি হ্রাস হয়। তুমি যদি পুত্রশোক পাইয়া, ভক্তি করিয়া নরোত্তমের উল্লিখিত পদটি গাইতে পার, তবে শ্রীভগবান অতিশয় লজ্জা পাইয়া শ্রীহস্তে তোমার নয়নজল মুছাইবেন, আর আপনি তোমার পুত্র হইতে স্বীকার করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাতর হইয়া ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন না, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রভু আবার "হরিবোল" বলিয়া দ্রুত-গমনে চলিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গিগণ ছাড়া আর কেহ গেলেন না। কেবল শ্রীঅদ্বৈত চলিলেন। তিনি কিরূপ চলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু দ্রুত-গমনে চলিতেছেন। আচার্য্য পশ্চাতে তাঁহার সহিত কষ্টে শ্রষ্টে কাঁকালি অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন; বদন বিরস, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে, নয়নে জল-মাত্র নাই। * প্রভু দেখিলেন যে, আচার্য্য ব্যতীত আর কেহই তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন না। প্রথমে প্রভু আচার্য্যকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রভু

---

* উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে। বয়ান বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু বহে তাহে॥—চৈঃ মঃ

ফিরিয়া বলিলেন, "আমি কেবল আপনার ভরসায় সন্ন্যাসরূপ দুরূহ কার্য্যে সাহসী হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম আমি গৃহ ত্যাগ করিলে সকলে ব্যাকুলিত হইবেন, আর আপনি তাঁহাদিগকে সান্তনা করিবেন। কিন্তু আপনি যদি অধীর হয়েন, তবে আর আমার যাওয়া হয় না। আমরা সকলে আপনার আশ্রিত। মাতৃ-আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতে চলিলাম। আপনি আমার মাতাকে প্রতিপালন ও সান্তনা করিবেন, আর, ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন। কিন্তু আপনি যদি এরূপ অধীর হন, তবে ত কেহ প্রাণে বাঁচিবে না।" শ্রীগৌরাঙ্গ চুপ করিলে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! আগে আমার কথা শুন, পরে তিরস্কার করিও। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ। তুমি এই নবীন বয়সে সমুদায় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছ, ইহাতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত রোদন করিতেছে, তোমার ভক্তগণের কা কথা। ঐ দেখ, সকলে ঘোর বিয়োগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাতে কেবল এক জনের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে এই পাষণ্ড—আমি। তুমি যাইতেছ, ইহাতে যে আমার অন্তর পুড়িতেছে না, তাহা বলিতে পারি না; হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু দেখ আমার নয়নে এক ফোঁটাও জল নাই। ইহাতে বুঝিলাম যে, ত্রিজগতে আমা অপেক্ষা কঠিন-হৃদয় আর নাই। কেবল এই কথাটি বলিতে তোমার পশ্চাতে আসিতেছি।"*

প্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! তোমার কোন দোষ নাই, সমুদায় অপরাধ আমারই। আমি দেখিলাম যে, আমার

---

*১। তোর নিজ জন তোমার বিচ্ছেদে। কান্দয়ে কাতর হয়ে চরণারবৃন্দে।
আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ নাহি দ্রবে কেনে। এ কাঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে॥
২। আমার অধিক আর দুরাচার নাই। তোমার বিচ্ছেদে মোর হিয়ায় প্রেম নাই॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে।—চৈতন্যমঙ্গল।

যাইবার সময়ে সকলে অধীর হইবেন, তাই তাঁহাদের সান্ত্বনা ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য একজন অসীম তেজস্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। সে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে অন্যে অধীর হইবেন সত্য, কিন্তু তোমা অপেক্ষা অধিক অধীর আর কেহই হইবেন না। এই জন্য আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, তোমার আমাতে যে প্রেম, তাহা এই বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সকলে শান্ত হইলে উহা খুলিয়া দিব। কিন্তু সেই জন্য তোমার নয়ন-জল আসিতে পারে নাই। তুমি দুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও। তোমার অপেক্ষা ত্রিজগতে আমাকে আর কে অধিক ভালবাসে? তবে, তোমার বড় দুঃখ হইয়াছে, কান্দিতে পারিতেছ না; ভাল, তাই হউক, যত পার কান্দ, কিন্তু সকলকে সমাধান করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু বহির্ব্বাসের গ্রন্থি দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ আছে, এখনই খুলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু গ্রান্থটি খুলিয়া দিলেন। (৩) যে মাত্র প্রভু বহির্ব্বাসের গ্রন্থি খুলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর অনবরত ধারা পড়িয়া পৃথিবী ভিজিয়া গেল। শ্রীঅদ্বৈতকে অতি আদরে কোলে করিয়া প্রভু বলিলেন, "মনস্কামনা সিদ্ধি হইল ত? এখন অশ্রু সম্বরণ কর। তুমি যদি প্রেমায় বিহ্বল হও, তবে আমি চলিতে পারিব না। এখন ধৈর্য্য ধর, আর সকলকে সান্ত্বনা কর! তুমি ত জান, এ সব কার্য্য কি জন্য হইতেছে।"

বসনের গ্রন্থিতে প্রেম-বন্ধন সম্বন্ধে লীলাটি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এখনকার লোকে এ সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কিরূপে? কিন্তু আমরা

(৩) "ইহা বলি এলাইল বসনের গ্রন্থি। প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য্য মনে চিন্তি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিতেছি প্রেম দান করা," "প্রেম শোষণ করা," "প্রেম কলসে কলসে বিলান" হইতেছে। এ সমস্তই কি রূপক বর্ণনা, না ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? প্রথমত দূরে দাঁড়াইয়া একজন যে অপরকে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জানেন। এক ব্যক্তি বক্তৃতা দ্বারা বহু লোককে মুগ্ধ করিলেন; কিন্তু সে কথাগুলি মুদ্রিত হইলে, তাহাতে আর সে শক্তি দেখা যায় না। কারণ বক্তৃতাকালে বক্তা তাহার এক একটি বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় আছে "হানিল নয়ন-বাণ, গেল অবলার প্রাণ।" দূর হইতে নয়ন-বাণ হানিলে অবলা প্রাণে মরে কেন? কারণ অলক্ষিতভাবে নয়ন হইতে একটি শক্তি আসিয়া অবলাকে বিদ্ধ করে। প্রেম দান করিবার শক্তি যে মনুষ্যের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও দেখা যায়। কোন সাধুর নিকট গেলে তিনি তোমাকে দ্রব করিবেন। তোমার দ্রব হইবার ইচ্ছা নাই, কি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতেছ, তুমি যে সাধুর সঙ্গ করিতেছ হয়ত তাহাও তুমি জান না, হয়ত সে সাধুতে তোমার ভক্তি নাই, তবু তাঁহার কথায়, স্বরের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে তুমি দ্রবীভূত হইতেছ। এইরূপে যে বিষয়ের সাধনা কর, সেই বিষয়ে শক্তি পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় বীর কেবল কথা কি দৃষ্টির দ্বারা, বহু লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইতে পারেন। প্রেম-ভক্তির সাধনা করিয়াও কোন কোন সাধুকে এখনও শক্তি চালনা করিতে দেখা যায়, আর তখন তাঁহারা "ব্রজের ভাণ্ডার" লুটিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং তখন যে কলসে-কলসে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচিত্র কি? পাঠক মহাশয়! তুমি যদি নাস্তিক বা সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে এই শক্তিটির কথা বিচার করিয়া দেখিলে হয়ত উপকার পাইবে। এরূপ একটি শক্তি যে অলক্ষিতভাবে জীবকে বিচলিত করে তাহা বেশ বুঝিতে

পাইবে। ইউরোপে এ শক্তি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা পর্য্যালোচনা করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝিবে যে, এমন কোন মহাশক্তিধর বস্তু আছে, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত; এবং মনুষ্যের জড়-দেহ ব্যতীত আরও সূক্ষ্ম বস্তু আছে, তাহা হইলে পরকালে এবং স্বভাবতঃ শ্রীভগবানেও বিশ্বাস হইবে। আর তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীভগবান বড় উপকারী বন্ধু। তিনি যে শুধু জন্মিবার আগে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন তাহা নয়, মরিয়া গেলে আমাদের জন্য একটি বৃন্দাবন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভগবান বড উপকারী বন্ধু, ইহা বুঝিলে প্রেম-ভক্তি আপনি আসিবে, এবং তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িয়া যাইবে। এ জন্য দুঃখ করিও না। আমি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা করি যে, তুমি এইরূপ ফাঁদে পড়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া, দ্রুতগতিতে চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ। ইহারা সকলেই উদাসীন। সকলেরই পরিধান বহির্ব্বাস ও কৌপীন, হাতে করোয়া। জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড, আর দামোদর তাঁহার করোয়া লইয়াছেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের অগ্রবর্ত্তী হইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, কাজেই তাঁহারা এগুতে পারিতেছেন না, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাইতেছেন! দেখিতে দেখিতে প্রভু নয়নের অন্তরালে গেলেন। তখন "তবে নিমাই গেল" বলিয়া শচীদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী। কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি॥
হেন রূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি। অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী। হরি হরি বলি কান্দে পরম উদাসী॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুখে হাসি। করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি॥
নন্দরাম দাসে কয় মনে অভিলাষী। কান্দায়ে কান্দালো গোরা ত্রিভুবনবাসী॥"

নানা কথা উত্থাপন করিয়া এতদিন প্রভুকে শান্তিপুরে রাখিয়াছিলাম, আর রাখিতে পারিলাম না;—প্রভু নদে ও শান্তিপুর শূন্য করিয়া চলিলেন। এদিকে ভক্তগণ জগজ্জননী শচীকে দোলায় উঠাইয়া নবদ্বীপে ফিরিলেন। শচী কোথা যাইতেছেন সে জ্ঞান বড় নাই। ওদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া আশা করিয়া আছেন যে, মা তাঁহার প্রভুকে আনিবেন; কিন্তু হঠাৎ দূরে ক্রন্দনের রোল শুনিয়া বুঝিলেন, নদেবাসী প্রভুকে হারাইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের অবস্থা, যদি পারি পরে বলিব।

প্রভু ন'দেবাসীর দৃষ্টির বাহির হইলে দাঁড়াইলেন। প্রভুর তখন সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ্! আপনারা পথের সম্বল কে কি আনিয়াছেন, আর কেই বা কি দিলেন বলুন।" শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "কপর্দ্দকও আনি নাই, সম্বলের মধ্যে দণ্ড, করোয়া, কৌপীন, বহির্ব্বাস ও ছেঁড়া কাঁথা।" তারপর বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহস হইবে কেন?" প্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করেন, আমাদেরও করিবেন। আমরা আহারের জন্য কেন ভাবিব?" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীনীলাচলচন্দ্রে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইল; ক্রমে বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ পাইতে ও পথাপথ জ্ঞান শূন্য হইতে লাগিল। তখন কখন দ্রুত কখন বা ধীর গমন, কখন হাস্য

কখন ক্রন্দন, কখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি কখন ঘোর-মূর্চ্ছা। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "নীলাচলচন্দ্র! আমাকে দেখা দাও।" কখন বা "হা নীলাচলচন্দ্র" বলিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেছেন; কখন বা ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জগন্নাথ আর কত দূরে?"

প্রভু এই ভাবে চলিয়াছেন। চারিপার্শ্বে ভিন্ন লোক, কেহই তাঁহাকে চিনে না। কেহ নদীয়া-অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহ-বা শুনে নাই। কিন্তু তিনি জগৎ আলো করিয়া চলিয়াছেন। প্রভুর সুন্দর মূর্ত্তি, কচি বয়স, অরুণ আয়ত-লোচন, অবিশ্রান্ত প্রেমধারা, শ্রীমুখে হরেকৃষ্ণ ধ্বনি, প্রেমে টলমল মরাল-গতি, যে দেখিতেছে সেই ভাবিতেছে, এ বস্তুটি গোলোক হইতে জীবের ভাগ্যে এখানে উদয় হইয়াছেন। আবার যখন দেখিতেছে, তাঁহার সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, পরিধান কৌপীন ও অঙ্গে ছেঁড়া কাঁথা, তখন উন্মাদ হইয়া "প্রাণ যায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে। উপরে আনন্দরাম দাসের যে পদটি দিয়াছি, উহাতে প্রভুর সেই সময়ের অপরূপ শোভার কতক আভাব পাইবেন। প্রভুর সঙ্গীদের মধ্যে গোবিন্দ ব্যতীত আর সকলেই সমান বয়সী। সকলের বড় নিতাই, তাঁহার বয়স ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩০-৩২। সকলেই উদাসীন ও ঘোর বৈরাগী, তেজস্কর, প্রেমভক্তিতে জর্জ্জর ও মনোহর। প্রভু এই সব "সাঙ্গোপাঙ্গ" সহ জীব উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন।

"চলিয়া চলিয়া চলে হরি বলে গোরারায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে, মাঝখানে গৌরাঙ্গরায়॥"

শান্তিপুরে প্রভু ভক্তগণ ও জননীকে দুঃখ দিবেন না বলিয়া সন্ন্যাসের সব নিয়ম ছাড়িয়াছিলেন; পথে আসিয়া আবার সমুদায় ধরিলেন এবং ঘোর কঠোরতা আরম্ভ করিলেন। প্রভুর মৃত্তিকায় শয়ন, উপাধান বাম হস্ত, বৃক্ষতলে বাস, নাসিকা দ্বারা ভোজন, কারণ জিহ্বায় অন্ন স্পর্শ করিলে কোন একটি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব হইবে। ইহাতে ভক্তগণ মর্ম্মাহত

হইলেন। কিন্তু কি করিবেন? তাঁহারা সেখানে আছেন না আছেন প্রভু সে জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি শুনিবেন? প্রভু মুহুর্মুহুঃ বলিতেছেন, "হে নীলাচলচন্দ্র! দর্শন দাও। শ্রীজগন্নাথ! চরণে স্থান দাও।" দাস্যভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু নদে, নদেবাসী, মা, প্রিয়া ও সঙ্গিগণ সমুদায় ভুলিয়াছেন।

নবীন বৈরাগিগণ প্রভুকে মধ্যস্থানে লইয়া আঠিসারা গ্রামে আসিলেন। সেখানে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত, প্রভুকে দর্শনমাত্র আত্ম-সমর্পণ করিলেন, প্রেম-ভক্তি পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তৎপরে সারানিশি কীর্ত্তনানন্দ ভোগ করিতে করিতে তীরে তীরে শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ-সীমা ছত্রভোগে আসিলেন। গঙ্গা এখানে শতমুখী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছেন। এই স্থানটি এখন ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমায়, মথুরাপুর থানায়, খাড়িগ্রামে অবস্থিত এবং জয়নগর-মজিলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে। তখন গঙ্গা ঐ পথে ছিলেন; এবং এই ছত্রভোগ একটি লক্ষ্মীসম্পন্ন নগর ছিল। ইহা পীঠস্থান বলিয়া তান্ত্রিকগণের মান্য-স্থান। এখানে শ্রীবিষ্ণু-মূর্ত্তি ছিলেন, এখন তিনি দুই হস্ত হইয়া জয়নগরে আছেন। এখানে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে, জলমগ্ন শিব আছেন। সুতরাং এই ছত্রভোগ বৈষ্ণব ও শাক্তগণের তীর্থস্থান। প্রভু গঙ্গার কূলে-কূলে অনেক পবিত্র স্থান দর্শন করিতে করিতে আসিতেছেন। প্রভুর কৌপীন পরিয়া এই প্রথম একটি তীর্থ দর্শন হইল। এই তীর্থ দেখিয়া প্রভু আহ্লাদে বিহ্বল হইলেন এবং হুহুঙ্কার করিয়া সেই অম্বুলিঙ্গ ঘাটে ঝম্প দিলেন। তাঁহার সহিত ভক্তগণও ঝম্প দিলেন। প্রভু মহানন্দে সেই ঘাটে জলক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলে, গোবিন্দ তাঁহাকে শুষ্ক বহির্ব্বাস দিলেন। ইহা পরিধান করিয়া তাঁহার নয়ন দিয়া শতমুখে আনন্দধারা পড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস ভিজিয়া গেল। গোবিন্দ তখন অন্য কৌপীন ও বহির্ব্বাস দিলেন,

কিন্তু তাহারও সেই দশা হইল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, শ্রীগঙ্গাদেবী যেখানে শতমুখী হইয়াছেন, প্রভুর নয়ন দিয়াও সেখানে শতমুখী ধারা চলিল। যথা—

"পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার। প্রভুর নয়নে বহে শতমুখা আর ॥"

সহস্র লোকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের নানাবিধ ভাব অদ্ভুত প্রেমধারা দেখিয়া গগনভেদী হরিধ্বনি করিতেছে। ইহা শুনিয়া গৌড়ের দক্ষিণ-ভাগের অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান সেখানে আইলেন। এই ছত্রভোগ গৌড়রাজ্যের শেষ-সীমা। ইহার ওপার উড়িষ্যা-রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে। তিনি ক্ষত্রিয় মহাযোদ্ধা; মুসলমানগণ তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিত না। তখন দুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং ছত্রভোগ পার হইয়া কোন গৌড়িয়ার উড়িষ্যা যাইবার অধিকার ছিল না। রামচন্দ্র খান হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, এবং তাঁহার নামে গৌড়ের দক্ষিণদেশ শাসন করেন। তিনি কলরব শুনিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে দোলায় চড়িয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভয়ে ভয়ে দোলা হইতে নামিয়া প্রভুর পদতলে পড়িলেন। অবশ্য ইহাতে প্রভুর তাঁহাকে আদর করা উচিৎ ছিল। কিন্তু (যথা চৈঃ ভাগবতে)

প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে।
হাহা জগন্নাথপ্রভু বলে ঘন ঘন। পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥

প্রভুর তেজ দেখিয়া রামচন্দ্র খানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের দম্ভ অন্তর্হিত হয়। এখন প্রভুর চরণস্পর্শে কারুণ্যরসের উদয় হইল। প্রভুর নয়নে জল আর আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥
কোন মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ। কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছেন, নবীন গোঁসাইর এ আর্ত্তি কিরূপে নিবারণ করিবেন। তখন নিত্যানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু! কৃপা করিয়া

আপনার পদতলস্থ এই ভদ্রলোকটির প্রতি একবার শুভদৃষ্টিপাত করুন।" প্রভু এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বাহ্য পাইলেন। তখন রাজাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপু! কে তুমি?" রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি ছার, আপনার দাসের দাস হইব এই বাসনা করি।" তখন উপস্থিত সকলে বলিলেন, "প্রভু! ইনি এদেশের অধিকারী।" প্রভু বলিলেন, "তুমি অধিকারী? বড় ভাল। আমি সকালে 'নীলাচলচন্দ্র' দর্শন করিতে যাইব। তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে?" "নীলাচলচন্দ্র" বলিতে প্রভু আনন্দে ঢলিয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছিলেন, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্ত্তি নিবারণ করিবেন, এখন সুযোগ পাইলেন। আবার ভক্তগণ ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগে আসা প্রভুর একটা লীলাখেলা। প্রভুর লীলাখেলা কেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু সুস্থির হইলে রামচন্দ্র বলিতেছেন "প্রভু! দুই রাজায় বিষম বিবাদ চলিয়াছে, উভয়ই আপনাপন সীমানায় ত্রিশূল পুঁতিয়াছেন।* এই সীমানা যদি কেহ অতিক্রম করে, তবে তাকে গোয়েন্দা বলিয়া প্রাণে মারিতেছে! আমি এ দেশের অধিকারী, আমার এখন এ পথে কাহাকেও যাইতে দিবার অনুমতি নাই। দিলে অগ্রে আমার প্রাণ যাইবে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা শিরোধার্য্য। আমার যে কোন বিপদ ঘটে ঘটুক, প্রভুকে কল্য উড়িষ্যা রাজ্যে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলাখেলা ভাবিতেছিলেন। রামচন্দ্র খানের সেই সময় সেই স্থানে আগমন না হইলে প্রভুর লৌকিক-লীলায় উড়িষ্যায় যাওয়া হইত না; হয়ত নৌকা পাইতেন না, কি আর কোন উপায়ে উড়িয়া রাজ্যে প্রবেশ করা

* "রাজার ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে?"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

সম্ভবপর হইত না। শুধু যে রামচন্দ্র খানের সেখানে তখন আগমন হইল তাহা নহে, তাঁহার মনের ভাবও এইরূপ হইল। রামচন্দ্র খানের এই কথা শুনিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কারও দিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—"হাসি তাঁরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।" যদি বল, প্রভু একবার প্রসন্ন মুখে চাহিলেন, তাহাতে খাঁর কি হইল? তিনি প্রভুর নিমিত্ত যে কোন সর্ব্বনাশ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। আর, প্রভু কেবল একটু চাহিলেন বৈ ত নয়? এ তাঁহার কিরূপ উপকার-শোধ? ইহার উত্তর চৈতন্যভাগবত দিতেছেন,—

"দৃষ্টিপাতে তায় সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি। ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥"

রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত সর্ব্বনাশ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার কিছু বিপদ ভোগ করিতে হয় নাই। আর প্রভু তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে শ্রীভগবানের চরণপদ্ম-মধু পান করিবার অধিকার দিলেন। সুতরাং প্রভু যে রামচন্দ্রের নিকট ঋণী রহিলেন এ কথা কিরূপে বলিব?

রামচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন, এখন পরম গৌরভক্ত হইলেন! তখন রামচন্দ্র গোষ্ঠী সমেত প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁহাদিগকে বাসা দিলেন। তথায় অনেক লোক উপস্থিত হইল। ক্রমে প্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন, এবং সেই ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া অনেকের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইল। সারানিশি কীর্ত্তনানন্দ চলিতে লাগিল। প্রহর খানেক রাত্রি থাকিতে রামচন্দ্র খান আসিলেন। প্রভুকে প্রভাতে উড়িষ্যা রাজ্যে পাঠাইবার জন্য বিশেষ চিন্তিত থাকায় তিনি কীর্ত্তনে আনন্দভোগ করিতে পারেন নাই! কারণ নাবিকগণের সহজে প্রাণ দিবার জন্য উড়িষ্যায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নয়। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছায় নৌকা পাইয়া রামচন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! নৌকা প্রস্তুত, উঠিতে আজ্ঞা হউক।" প্রভু সঙ্গীগণসহ নৌকায় উঠিয়া উড়িষ্যায় চলিলেন। প্রভু

নৌকায় উঠিয়াই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাবিকগণের ইচ্ছা চুপে চুপে যাইয়া প্রভুকে উড়িষ্যায় নামাইয়া দেশে পলায়ন করে! কিন্তু প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে নৌকা টলিতে লাগিল। আবার মুকুন্দও আনন্দে "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নাবিকগণ ভাবিল, পাগলা ঠাকুরের হাতে বুঝি প্রাণ যায়। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "গোসাঞি! নৌকা ডুবিয়া গেলে কোথা যাইবেন? এদেশে জলে কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ। আবার জল-ডাকাইতগণ সর্ব্বদা ফিরিতেছে, শব্দ শুনিলেই আসিয়া ধরিবে। এখন আপনারা নিদ্রা যাউন।" কিন্তু শ্রীপ্রভুর আহার নিদ্রা নাই। তিনি শান্তিপুর হইতে এই পর্য্যন্ত কিরূপ মনের ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্নাথে। নাকে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার। কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে॥"

প্রভুকে স্বয়ং তিনি বলিয়া জানিলেও জীবধর্ম্মবশতঃ ভক্তগণ সে কথা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেন। কাজেই নাবিকগণের কথায় কেহ কেহ ভয় পাইলেন। ইহাতে মুকুন্দ চুপ করিলেন, আর প্রভুকে স্থির হইয়া বসিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। তখন প্রভু বলিলেন "তোমরা ভয় পাইয়াছ? ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের চক্র মাথার উপর ঘুরিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভক্তগণের আবার মনে রহিল প্রভু বস্তু কি! তখন প্রভুকে না থামাইয়া, আপনারা কীর্ত্তনে পুনঃ যোগ দিলেন। এইরূপে নৌকা টলিতে টলিতে কীর্ত্তনের সহিত উৎকলদেশে পৌঁছিল। প্রভু প্রয়াগ-ঘাটে উঠিয়া ভাব সম্বরণ করিলেন এবং জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া উৎকলদেশকে প্রণাম করিলেন। তখন গৌড়দেশরূপ কণ্টক উত্তীর্ণ হইয়া ও শচী প্রভৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। যে পঞ্চজন তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেই বাঁচেন।

প্রয়াগঘাটে যুধিষ্টির-স্থাপিত মহেশ আছেন। সেখানে প্রভু গণসহ স্নান করিলেন। প্রভু তখন সহজ ভাবেই বলিলেন, "আমি যাই, অন্ন মাঙ্গিয়া আনি।" এখন, ভিক্ষা-মাঙ্গা গোবিন্দ, কি জগদানন্দ, কি আর যাহারাই হউক, প্রভুর কাজ কখনই নহে। প্রভুর হাতে কেবল জপের মালা। তাঁহার দণ্ড জগদানন্দের এবং বহির্ব্বাস, কৌপিন ও করোয়া গোবিন্দের হাতে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর; কোনক্রমে তাঁহার উদরে দুটো অন্ন প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। এখন প্রভু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাই ছয় জনের জন্য ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিষেধ করে কাহার সাধ্য, আর নিষেধ করিলেই বা শুনিবে কে? এই যে পঞ্চভক্ত প্রভুকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর নিকট কিছু মাত্র বাধ্য নহেন। বরং প্রভু চেতন লাভ করিলেই ভক্তগণ তাঁহাকে যত্ন করিতেছেন। সেই প্রভু ভিক্ষা করিতে চলিলেন, ইহা তোমার আমার সহে না, তাঁহারা কিরূপে সহিবেন। কিন্তু নিষেধ করিতেও তাঁহারা সাহস করেন না। প্রভু এইরূপে তাঁহাদের চিত্তবিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

প্রভু বহির্ব্বাস দ্বারা ঝুলির মত করিয়া, ভক্তগণকে মন্দিরে রাখিয়া আপনি ভিক্ষার বাহির হইলেন। প্রভুর এ হরিনাম ভিক্ষা নয়, চাউল ভিক্ষা। প্রভু উপস্থিত হইবামাত্র গ্রাম টলমল করিয়া উঠিল। "ওরে নবীন সন্ন্যাসী দেখে যা" বলিয়া সকলে দৌড়িল। প্রভু কোন গৃহস্থের দ্বারে "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া, অবনত মস্তকে আঁচল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলেন; মুখে কিছু বলিলেন না। মস্তক অবনত করিবার কারণ গৃহস্থের বাড়ী স্ত্রীলোক দর্শন সম্ভব; যাহার বাড়ী প্রভু গেলেন সে ভাবিল তাহার যথাসর্ব্বস্ব প্রভুকে দিবে। কিন্তু আর সকলেও ছুটিল।

যাহার যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য, তাহা দিবার জন্ত সকলে ব্যস্ত হইল। দুই এক বাড়ীতেই আঁচল পুরিয়া গেল। শেষে, লইতে পারিবেন না বলিয়া অনেক দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে লোকে মহাক্লেশ পাইল, প্রভুও তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে প্রভুর একটি শিক্ষা হইল। তিনি বরাবর ভিক্ষা করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। প্রভু প্রফুল্ল বদনে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বুঝিলাম, প্রভু আমাদিগকে পোষিতে পারিবেন।" তখন জগদানন্দ রন্ধন করিলেন, এবং আহারান্তে সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সর্ব্বত্রই দেবালয় ও অতিথিসেবা ছিল। ভারতবর্ষের সে ভাব আর নাই। এখন ইউরোপীয়েরা যেরূপ সৈন্ত পোষে, তখন ভারতবর্ষীয়রা সেইরূপ সাধু পোষিতেন। এদেশে এত উদাসীন ছিলেন যে, "গৃহস্থ" কথাটির সৃষ্টি হইল। বিশেষতঃ তখন এখানে সর্ব্বত্র দেবস্থলী, অতিথিশালা, পুষ্করিণী ও কূপ দ্বারা পরিপূরিত ছিল।

উড়িষ্যা গমনের পথে পাটনীর বড় উৎপাত ছিল। তাহারা যাত্রীদের উপর বড় অত্যাচার করিত। প্রভু গঙ্গাসাগর, সুন্দর-বন প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় গেলেন বটে, কিন্তু পাটনীর হাতে ধরা পড়িলেন। ঐ ঘাটপালগণের সঙ্গে প্রভুর অনেক কাণ্ডের কথা উল্লেখ আছে, কতকগুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, পাটনী ঘাটের রাজা। পার করেন যাত্রীদের। তাহারা বিদেশী, সুতরাং সহায় ও শক্তি-শূন্ত। পাটনী লোকজন লইয়া ঘাটে থাকে, অনায়াসে যাত্রীগণকে প্রহার, বন্ধন, লুণ্ঠন প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারে। নিজেরা ছোটলোক, অথচ অপার-ক্ষমতা-সম্পন্ন। পাঠক! এখন পাটনীর

অত্যারের কারণ বুঝিয়া লউন। প্রভু উড়িষ্যার অন্তকে কি ভবসাগর পার করিবেন, প্রথম যাইয়াই দানীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব বাধিল। তাঁহারা ছয়জন পার হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারও নিকট কপর্দ্দক-মাত্র নাই। খেওয়ারিই বা বিনা কড়িতে কেন পার করিবে? সঙ্গে কিছু দ্রব্যাদি থাকিলে কাড়িয়া লইত, কিন্তু তাহাও বিশেষ ছিল না। প্রভু সমেত ছয় জন ঘাটে যাইয়া দাঁড়াইলে, দানী দান চাহিল। তাঁহারা বলিলেন, "কপর্দ্দক মাত্র নাই। পার কর, তোমার পুণ্য হবে।" কিন্তু সে লোভে দানী ভুলে না। আগে তাঁহাকে দুঃখ দেয়; দুঃখ পাইয়া যদি কিছু থাকে, তখন সাধু তাহা দানীকে দেন। যদি কিছু না থাকে, সাধুর দুঃখ দেখিয়া অন্যান্য যাত্রীগণও পারের মূল্য দেয়। এইরূপে খেওয়ারির প্রায়ই বিনামূল্যে পার করিতে হয় না। দানীকে কাহারও ফাঁকি দিবার যো ছিল না। আগে দান পরে পার, এই তাহাদের নিয়ম।

প্রভুর গণেরা যখন বলিলেন, "কপর্দ্দক মাত্র নাই" তখন দানী বলিল, "তবে ওদিকে যাও, এদিকে আসিও না।" একটি পরিখা আছে, তাহার এ-পারে থাকিয়া মূল্যের বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাহারা মূল্য দেন তাহারা পরিখার ও-পারে যাইতে পারে। তাহারা সেখানে বসিয়া থাকে, এবং এক নৌকা মানুষ হইলে তখন সকলকে পার করে। দানী প্রভু ও তাঁহার গণকে বলিল, "ও-দিকে যাও, এ-দিকে আসিও না," ইহা বলিয়াই প্রভুর পানে চাহিল। তখন তাঁহার তেজ দেখিয়া ভয় হইল। ভাবিতেছে, এঁর কাছে ত দান লইব না, ইহার সঙ্গে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাছেও লইব না। ইহা ভাবিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তুমি আইস, তোমার দান লাগিবে না। আর তোমার সঙ্গী কয়েক জনকেও লইয়া আইস।" প্রভু বলিতে পারিতেন যে, তাঁহার

সহিত আর ৫ জন আছেন, তাহা হইলে সকলে পার হইতে পারিতেন। কিন্তু রসিকশেখর প্রভু বলিলেন, "দানি, ত্রিজগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি।" এই কথা বলিলে, দানী প্রভুকে পরিখার মধ্যে আসিতে দিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদিগকে দিল না। প্রভু পরিখার মধ্যে আসিয়া ঘাটের ধারে বসিলেন, এবং দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া "জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। প্রভু মুখে একটি কথা বলিলেই দানী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিত, কিন্তু তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রভু হাত-ছাড়া হইবেন, আর তখন কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রভু ফেলিয়া যাইবেন কেন? তখন ভাবিতেছেন, তাঁহারা প্রভুকে ইচ্ছামত কিছু করিতে দেন না। কি জানি, সত্যই যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন! এই সব ভাবিয়া, যদিও প্রভু অতি অল্প দূরে বসিয়া আছেন, তত্রাচ তাঁহারা ভুবন আঁধার দেখিতে লাগিলেন। দানী তাঁহাদিগকে বলিল, "তোমরা ত গোসাঞির লোক নও, কড়ি দিলে তোমাদের পার করিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিখার বাহিরে রাখিয়া প্রভুকে পার করিতে চলিল। যাইয়া দেখে, "জগন্নাথ, দেখা দাও" বলিয়া, স্ত্রীলোকের ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন। সে স্বর শুনিয়া নিষ্ঠুর দানীরও হৃদয় দ্রব হইল। তখন দানী, ইনি কে ও ব্যাপার কি, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল "গোসাঞি! ইনি কে? এত কান্দেন কেন? মানুষের এত নয়ন-জল ত কখন দেখি নাই? ক্রন্দনও ত কখন

শুনি নাই ? তোমরা কি সত্যই ঐ ঠাকুরের লোক ?” তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “শুন নাই কি, উনি নবদ্বীপের অবতার, স্বয়ং ভগবান্, এখন সন্ন্যাসী হইয়া জীব উদ্ধার জন্য নীলাচলে চলিয়াছেন। আমরা উঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি,”—বলিয়াই সকলে কাঁদিয়া উঠিলেন। দানীও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল, এবং ভক্তগণকে যত্ন করিয়া পরিখার মধ্যে লইয়া গেল। দানী তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিল, “কোটী জন্মের পুণ্যফলে আজ তোমার চরণ দর্শন করিলাম।” তখনই দানীর সমুদায় বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে হরি হরি বলিয়া প্রভুসহ নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন।

উড়িষ্যার পথে দুই ভয়,—ডাকাতির ও ঘাটপালের। দুই রাজায় যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া দুই সীমানার মধ্যস্থানে কোন রাজারই শাসন নাই, লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গলময়, ডাকাতি করিলেও ধরে কে ? কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার গণ সমুদায় দায় হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। উপরে এক দানীর কাহিনী বলিলাম ; আবার কবি কর্ণপুর এ২ উপলক্ষে কি বলিতেছেন শুনুন—

আর শুন এক অদ্ভুত কহি চমৎকার। গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্টপাল ॥
মহারণ্য পর্ব্বতে যতেক বাটপাড়। পথিক লোকের তারা বড় শঙ্কাকর ॥
সে সকল দস্যু দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। কান্দিয়া ঢলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর ॥
“কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” বলে, নেত্রে বহে প্রেমধার। গড়াগড়ি যায়, দেহে প্রেমের সঞ্চার ॥

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ্যে সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না শ্রীনবদ্বীপে, সকল কার্য্যই প্রায় গোপনে সাধন করিতেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে ধরা দিতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন নীলাচলে চলিলেন, তখন অসীম শক্তির সহায়তা লইতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে একজনকে উদ্ধার করিতে হইবে। দৃষ্টিমাত্র কার্য্য শেষ করা চাই। তাহা না

হইলে সেখানে থাকিতে হয়, কিন্তু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। প্রভু বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেখানে আসিয়া প্রভু হঠাৎ যেন চৈতন্য পাইয়া রজকের দিকে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের আগমন রজক আড়চোখে দেখিয়া আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রজকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "ওহে রজক! একবার হরি বল।" সাধুগণ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন ভাবিয়া, রজক বলিল, "ঠাকুর! আমি অতি গরীব, কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না।" প্রভু বলিলেন, "রজক! তোমার কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে না, তুমি কেবল হরি বল।" রজক তখন ভাবিতেছে, "ঠাকুরদের মনে কোন অভিসন্ধি আছে, নচেৎ আমাকে হরি বলিতে বলিবেন কেন, অতএব হরি না বলাই ভাল।" এই ভাবিয়া মুখ না তুলিয়া কাপড় কাচিতে কাচিতে রজক বলিল, "ঠাকুর আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে। আমি পরিশ্রম করে তাহাদের অন্ন-সংস্থান করি। আমি এখন হরিবোলা হলে, তাহারা উপোষ করে মর্‌বে।" প্রভু বলিলেন, "রজক! তোমার কিছু দিতে হবে না, শুধু একবার হরি বল।" রজক ভাবিতেছে, "এ দায় ত মন্দ নয়! কি জানি, কি হইতে কি হইবে, কাজেই হরিনাম না লওয়াই ভাল।" ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রজক বলিল, "ঠাকুর তোমাদের কাজকর্ম্ম নাই, আমরা পরিশ্রম করে পরিবার পালন করি। আমি কাপড় কাচব, না হরিনাম লব?" প্রভু বলিতেছেন "রজক! যদি তুমি দুই কাজ একসঙ্গে না করতে পার, তবে আমি কাপড় কাচিতেছি, তুমি হরি বল।" এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ ও রজক ত অবাক। তখন রজক ভাবিতেছে, গোঁসাইয়ের হাত ছাড়ান মহা দায় হয়ে পড়ল, তা

এখন করি কি? যাহা থাকে কপালে তাহাই হবে, ইহাই ভাবিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমার কাপড় কাচতে হবে না, তুমি শীঘ্র বল আমায় কি বলতে হবে, আমি তাই বলছি।" এ পর্য্যন্ত রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচা রাখিয়া এখন সে মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিয়া উপরের কথাগুলি বলিল। সে দেখিল, সন্ন্যাসী সকরুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে। ইহাতে রজক একটু মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! কি বলব, বল।" প্রভু বলিলেন, "রজক! বল 'হরিবোল'।" রজক তাহাই বলিল। তখন প্রভু বলিলেন, "রজক! আবার বল 'হরিবোল'।" রজক আবার বলিল,—'হরিবোল'। রজক এই দুইবার প্রভুর অনুরোধ-ক্রমে হরিবোল বলিয়া একেবারে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইল, এবং বিহ্বল হইরা গেল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্ত হইয়া, আপনিই ক্রমাগত 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল। এইরূপে হরিবোল বলিতেছে, আর ক্রমে বিহ্বল হইতেছে। বলিতে বলিতে শেষে একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া অজস্র ধারা বহিতে লাগিল, আর একটু পরেই রজক দুই বাহু তুলিয়া, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তগণ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু প্রভুর কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তিনি দ্রুতবেগে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। অল্পদূরে যাইয়া প্রভু বসিলেন, আর ভক্তগণ রজকের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রভু যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সে জ্ঞান নাই। তখন সেই ভাগ্যবান্ আপনার হৃদয়ে গৌর-রূপ দেখিতেছেন! ভক্তগণের বোধ হইল, রজক যেন একটি যন্ত্র। প্রভু কল টিপিয়া আড়ালে আসিলেন, আর সেই কল "হরিবোল" বলিতে ও নাচিতে লাগিল। একটু পরে রজকের স্ত্রী স্বামীর আহারের দ্রব্য

লইয়া আসিল, কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া শেষে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ইচ্ছায় বলিল, "ও আবার কি? তুমি নাচতে শিখলে কবে?" কিন্তু রজক উত্তর দিল না, পূর্ব্বকার মত দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া "হরিবোল", "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! রজকিনী বুঝিল যে স্বামীর বাহ্যজ্ঞান নাই, আর তাহার কি একটা হইয়াছে। তখন ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের ভিতর দৌড়িল ও লোক ডাকিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাহারা আসিলে, রজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। দিনের বেলায় ভূতের ভয় নাই ভাবিয়া সকলে রজকের কাছে যাইয়া দেখে যে, সে বিভোর হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া প্রথমে ভয়ে কেহ তাহার নিকট যাইতে সাহসী হইল না। পরে সাহস করিয়া একজন ভাগ্যবান লোক তাহাকে ধরিল। ইহাতে রজকের অর্দ্ধ-বাহ্য জ্ঞান হইল। রজক আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন পাইয়া সেই ব্যক্তিও "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল! তখন ইহারা দুইজনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই মহাবায়ু জনে জনে ধরিল, এমন কি রজকিনীও সেই মদে উন্মত্ত হইলেন। এই যে দৃষ্টি মাত্র শক্তিসঞ্চার, ইহার বিস্তারিত বর্ণনা পরে করিব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণে বাহির হন। ক্রমে দুই বৎসর কাল সমগ্র ভারতবর্ষে এই ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, কেবল সে যে শক্তি পাইত তাহা নয়, তাহার শক্তি-সঞ্চারের শক্তিও প্রায় পূর্ণমাপায় লাভ হইত। যেমন উষ্ণজলের মধ্যে শীতল জলপূর্ণ পাত্র রাখিলে ঐ জল উষ্ণ হয়, এবং শেষোক্ত উষ্ণ জলের মধ্যে আবার শীতল-জলপূর্ণ পাত্র রাখিলে সে জল ও উষ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উষ্ণতা কমিয়া

আসে, সেইরূপ প্রভুর যে শক্তি তাহা সঞ্চারিত-ব্যক্তির পূর্ণমাত্রায় লাভ হইল না। আবার সঞ্চারিত-ব্যক্তি যাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও ঐরূপ সঞ্চারকের পূর্ণ-শক্তি প্রাপ্তি হইল না। এই গেল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এরূপও কখন কখন হইত যে, সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত-ব্যক্তি অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। সে হইত যখন সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড় সাধক হইতেন। অধিকার সকলের সমান হয় না, আবার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টাও সকলে সমান করে না। শাস্ত্রে আছে যে, গৌর-অবতারে পাত্র মোটে সাড়ে তিন জন, যথা—স্বরূপ, রামরায়, শিখি মাহিতী ও মাধবী দাসী। স্বরূপ—ইনি নবদ্বীপের পুরুষোত্তর আচার্য্য, যাঁহাকে পূর্ব্বে একবার আমরা পাঠকবর্গকে গললগ্নী-বাসে প্রণাম করিতে বলিয়াছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক ক্রমে জানিতে পারিবেন। পাত্র মানে এই যে, ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-দত্ত সুধা যতখানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোন ভক্ত পারেন নাই। অতএব যাহার হৃদয়ে এই ভক্তি কি প্রেম-সুধারস যতখানি ধরে তিনি সেইরূপ অধিকারী হন। অধিকার সকলের সমান নয়;—কেন নয়, তাহা বলিতে পারি না, তাহা লইয়া বিচার করিতে পারি মাত্র, তাহাও এ স্থলে করিব না। এই যে অধিকার, ইহার পরিবর্দ্ধন করার চেষ্টাকেই সাধন করা বলে। যেমন কর্কশ-কণ্ঠ কোন ব্যক্তি সাধনার দ্বারা সুকণ্ঠ হইয়া ভাল গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয়াও সাধনার দ্বারা একজন ক্রমে অধিক অধিকার অর্জ্জন করিতে পারেন। পথে চলিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাকে কৃপা করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন না;—ইহার কি কারণ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যে তিনি বাছিয়া বাছিয়া লোক উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পথে কত লোক, কত সাধু দেখিলেন, কিন্তু কৃপা করিলেন রজককে।

রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবাসীদিগকে কৃপা করিলেন তাহা নয়, সে অঞ্চল ভক্তিতরঙ্গে ডুবিয়া গেল।

দানীর সঙ্গে প্রভুর আরও দুইবার গোল হইবার কথা শুনা যায়। একবার কোন দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে। তাহার নিকট কপর্দ্দক না পাইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বল কাড়িয়া লয়। কিন্তু ইহা কোন কার্য্যে আসিল না দেখিয়া, দানী সক্রোধে কম্বলখানি ছয় খণ্ড করিয়া ছয় জনের দানস্বরূপ গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ পরে সেই খেওয়ারীর কর্ত্তা আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিল ও সমুদয় শুনিল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে —

"এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর। নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর ॥"

ইহার পূর্ব্বে প্রভু আর এক স্থানে পার হইয়া উত্তেজিত অবস্থায় দ্রুত-গমনে যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং শেষে ফিরিলেন। প্রভুর হঠাৎ ফিরিবার কারণ ভক্তেরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, তাহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। শেষে দেখিলেন যে, বহু যাত্রীকে দানী নানারূপ যন্ত্রণা দিতেছে। প্রভু আসিবা-মাত্র কি হইল শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

"প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়। ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায়।
প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্ব্বজন। দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনে মন ॥
এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে। এই নীলাচলচাঁদ জানিল অন্তরে ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী। প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥"

যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয়া প্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াই প্রভু দেখিলেন যে, রাজপথে গমন তাঁহার পক্ষে সুবিধা জনক হইতেছে না। তিনি আপন মনে যাইবেন। ভক্তগণ যে তাহার পাছে পাছে আসিতেছেন; ইহাও তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। এই জন্য তাঁহাদের উপর তিনি মহা বিরক্ত। আবার রাজপথে উঠিয়া দেখেন যে, প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ের বাদসাহের যুদ্ধ চলিতেছে। রাজপথ

সৈন্য ও হাতী-ঘোড়ার কোলাহলে চলিবার যো নাই। প্রভু বিরক্ত হইয়া বনপথে চলিতে লাগিলেন। তবে তীর্থস্থান দর্শনের জন্য মাঝে মাঝে রাজপথে আসিতে হইতেছে। তবু প্রভুর কণ্টক হইতেছেন—নিজ-গণ। যদিও প্রভু নাসিকায় ভোজন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন, তবু নানা প্রকারে ভক্তগণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে ভোজন করান এবং নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করেন। প্রভুর ইহা ভাল লাগে না। তিনি ভক্তগণ সহ সুবর্ণরেখা নদীর পরিষ্কার জলে স্নান করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন "হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই,—আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না;" প্রভুর এই চরিত্র দেখিয়া ভক্তেরা একটু হাস্য করিলেন, কিন্তু বড় চিন্তিতও হইলেন। "তাঁহার অভিসন্ধি কি, তাহা কে জিজ্ঞাসা করে, আর কেই বা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন বা পালন করে, অর্থাৎ তাঁহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া দিতে পারে?" কাজেই ভক্তগণ উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে মুকুন্দ বলিলেন, "প্রভু আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম।" এই কথা শুনিয়া মহাহর্ষিত হইয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া, শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে দৌড়িলেন; প্রভু একটু দূরে গেলে, ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িলেন। তাঁহাদের মনের ভাব, তাঁহারা অলক্ষিতরূপে তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে যাইবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের এই "নিষ্ঠুরতা" লইয়া একটু বিচার করিব। প্রভু নিজ-জন-নিষ্ঠুর। অর্থাৎ তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিষ্ঠুরতা করেন, তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা তত বৃদ্ধি পায়। প্রীতি যদি কখন আস্বাদ করিয়া থাক, তবে জানিবে যে, যেখানে প্রীতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে এইরূপ কোন্দলরূপ ঝড়ে ইহার মূল আরো শক্ত হয়। মনে কর, স্বামী যদি উদাসীন হইয়া যান, আর স্ত্রীকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রহার

করেন, কি তাঁহাকে লুকাইয়া পলায়ন করেন, তবে কি সেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ক্রোধ হয়? না, প্রেম আরো বৃদ্ধি পায়? ইহাও সেইরূপ।

প্রভু এক দৌড়ে জলেশ্বর আসিলেন। ইহা শিবের স্থান। এখানে বহুতর মন্দির বিরাজমান। জলেশ্বর-শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর। প্রভু সন্ধ্যার সময় সেখানে আসিলেন। তখন সবে আরত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। শিবের পূজার মহা আয়োজন হইতেছে, এবং বহুতর বাদ্য বাজিতেছে। পূজার সজ্জা দেখিয়া প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং সেখানে যাইয়াই সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া সকলে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন; তখন বোধ হইল শিব যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন! যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"করিতে আছেন নৃত্য জগৎ-জীবন। পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥
দেখি শিবদাস সবে হইল বিস্মিত। সবেই বলেন শিব হইল বিদিত॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য। প্রভু নাচিতেছেন, তিলার্দ্ধেক নাই বাহ্য॥"

ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িয়াছেন, কিন্তু পারিবেন কেন? তাহাতে আবার অনাহার। তবুও প্রভু বেশী অগ্রে আসিতে পারেন নাই। কারণ ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িয়াছেন। প্রভু যখন আনন্দে পাগল হইয়া সকলকে পাগল করিয়াছেন,—যখন শিব আসিয়াছেন ভাবিয়া সকলে আত্মহারা হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, কি একটা কাণ্ড হইতেছে। কাজেই প্রভুর সহিত যে চুক্তি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদ্যে মিল হইতেছিল না। কিন্তু মুকুন্দ আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, প্রভুর আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও নৃত্য আরও মধুর হইল। ভক্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর প্রভু আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শেষে প্রভুকে

ভক্তগণ শান্ত করিলে, তিনি পরম সুখে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং সকল কলহ মিটিয়া গেল। ক্রমে তাঁহারা বাঁসদহা পথে, তমলুক অতিক্রম করিয়া, রেমুনাতে আসিলেন। রেমুনা রাজপথের ধারে, গোপীনাথের স্থান। ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুজ মুরলীধর। প্রভু এই প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি দেখিলেন, ও ভক্তগণকে দেখাইলেন। এ কথার তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিভুজ-মুরলীধর-ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে ধ্যান করিতেন। যখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যভাব শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ। মাধুর্য্য-ভজন অর্থ শ্রীভগবানকে নিজ-জন অর্থাৎ পতি পুত্র সখা রূপে ভজনা করা। কিন্তু শ্রীভগবান যদি চারিহস্তসম্পন্ন শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি-ধারী রহিলেন, তবে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত নিজ জন বলিতে পারিবে কেন? সুতরাং মাধুর্য্য ভাবে ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের দুখানি হাত ফেলিয়া দিতে হইবে। আর যে দুখানি থাকিবে তাহাতে এমন বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষ্যের ব্যবহার-উপযোগী। অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দের নন্দন চতুর্ভুজ নহেন; তাহা হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বোঝা বহাইবেন, কি যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবেন? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, আর প্রভু মাধুর্য্য-ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রভু এই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিবামাত্র ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যাহারা বাহিরের লোক, তাহারা তর্ক উঠাইত যে, যদি দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইলেন, তবে এরূপ প্রাচীন মূর্ত্তি নাই কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বহুদিনের প্রচীন মূর্ত্তি, আর তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর। তাহাই

প্রভু ভক্তগণ সহ বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন করিতে আসিলেন। এই ঠাকুর উদ্ধব কর্ত্তৃক বারাণসী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে রেমুনাতে আনা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা স্মরণ করিয়া "উদ্ধব" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের অগ্রে আসিয়াই প্রথমে "উদ্ধবের ঠাকুর" বলিয়া অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিলেন, এবং পরে শ্রীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"উদ্ধব উদ্ধব বলি ডাকে আর্ত্তনাদে। প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে ॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারেবার ॥"

গোপীনাথের দাসগণ প্রভুর রূপ গুণ ও প্রেম-তরঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। তখন কে গোপীনাথ, ইহা তাঁহাদের ভ্রম হইতে লাগিল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। অমনি শ্রীগোপীনাথের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া খসিয়া প্রভুর মস্তকে পড়িল। প্রভু উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আরও স্ফূর্ত্তির সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার ভাবের তরঙ্গে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, ঠাকুরের অগ্রে দাঁড়াইয়া, করযোড়ে এই শ্লোক পড়িয়া গোপীনাথের স্তব করিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬ষ্ঠ অঙ্ক—

"ন্যঞ্চৎ কফোণিনমদংসমুদঞ্চদগ্রং তির্য্যক্ প্রকোষ্ঠকিয়দাবৃত পীনবক্ষাঃ।
আরজ্যমানবলয়ো মুরলীমুখস্থ শোভাং বিভাবয়তি কামপি বামবাহুঃ ॥
আকুঞ্চনাকুলকফোণিতলাদিবাধো, লব্ধ স্রুতা মধুরিমামৃত ধারয়ৈব।
আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখস্থ লক্ষ্মীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণবাহুরেষ ॥"

ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম নাই। চৈতন্যমঙ্গলে—

"চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে। আকাশ পরশে যেন প্রেমার হিল্লোলে ॥"

"ইরূপে সমস্ত দিন নৃত্য চলিল। সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ অনেক যত্ন

করিয়া প্রভুকে বসাইলেন এবং সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মনসুখে কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম "ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ"। ভক্তগণের অনুরোধে প্রভু এই কাহিনী বলিতে লাগিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীপ্রভুর গুরু, আর ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মাধবেন্দ্রের নিকট শ্রীঅদ্বৈত মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বিল্বমঙ্গল যে সকল রসের পদ লেখেন, প্রভু তাহা জীবন্ত করিলেন। সেইরূপ মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া যান, প্রভু তাহাই অঙ্কুরিত ও পরিশেষে ফলবান করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, প্রভুর পূর্ব্বে কেহ কখন দেখেন নাই, শুনেনও নাই। মাধবেন্দ্রপুরীর, মেঘ দেখিলে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত, ও তিনি অচেতন হইতেন। তখনকার কালে সে অতি বড় কথা। অবশ্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠাইলেন, তাহার নিকট মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমের তুলনা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রভু তাহা বলিতেন না। "মাধবেন্দ্র" নাম করিতেই প্রভু বিহ্বল হইতেন। এই মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনার গোপীনাথের এখানে আসিয়াছিলেন। গোপীনাথের এখানে বারখানি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। এই বারখানি ক্ষীর ভুবন-বিখ্যাত। মাধবেন্দ্রের ইচ্ছা হইল, এই ক্ষীর আস্বাদ করিয়া দেখিবেন, কেন ইহা ভুবন-বিখ্যাত; এবং ইহার তথ্য জানিতে পারিলে তিনিও তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া ভোগ দিবেন। মাধবেন্দ্রের মনে এই ইচ্ছা হইলে, তিনি লজ্জিত হইলেন, এবং মন্দিরের দূরে যাইয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে পূজারী ভোগ দিয়া শয়ন করিবার পর, গোপীনাথ তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন,—"একখানি

ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে। তুমি উহা লইয়া বাজারে মাধবেন্দ্রপুরী নামক যে একজন সন্ন্যাসী কীর্ত্তন করিতেছেন তাঁহাকে দাও। পূজারী মাধবেন্দ্রকে তল্লাস করিয়া তাঁহার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "গোসাঞি! এই ক্ষীর ধর, ঠাকুর তোমার নিমিত্ত ইহা চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।" সেই অবধি গোপীনাথের নাম হইল, ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ।" তৎপরে প্রভু মাধবেন্দ্রের গুণ এবং তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ ঘটনা, ঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। মাধবেন্দ্র বৃক্ষতলবাসী। তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অম্লান বদনে গুরুর সেবা ও তাঁহার মল-মূত্র পরিষ্কার করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি ঈশ্বরপুরীকে তাঁহার সমুদয় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিলেন। তাই ঈশ্বরপুরীও শক্তিধর হইলেন. এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহারই নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু বলিতেছেন,—ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন, আর মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া হৃদয় উঘারিয়া বিলাপ করিতেছেন। ক্রমেই তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে সেই বিরহ-বেগ একটি শ্লোকরূপে শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল। সেই শ্লোকটি এই,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"*

রাধাভাবে পুরী গোসাঞি বলিতেছেন, "হে নাথ! দীনজনের দুঃখে দয়ার উদয় হইয়া তোমার কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে নাথ। হে প্রিয়! আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া তোমাকে ইতি-উতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমায় দেখিব?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—এই শ্লোক পড়িতে

* এই 'অয়ি দীন' শ্লোকে, শ্রীঠাকুর মহাশয় সুর বসাইয়া এবং আর কয়েকটি চরণ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া একটি অপরূপ পদের সৃষ্টি করেন।

পড়িতে পুরী গোসাঞির চক্ষু স্থির হইল। তখন ঈশ্বরপুরী দেখেন যে, পুরী গোসাঞিকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছেন! আর ঐ শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে প্রভু অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! ভক্তগণ দেখেন, প্রভুর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে! তখন সকলে নানাবিধ সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে—

"প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি ইতিউতি ধায়। হুঙ্কার করয়ে, হাসে নাচে কান্দে গায়॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বোলে বারে বার। কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য। নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কবাট। গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
শেষে লোকের সংঘট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।"—চৈঃ চরিতামৃতঃ॥

পবিত্র হইব বলিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর কথা একটু আলোচনা করিব। তাঁহার নিজের বলিতে কেহই ছিল না, আর এক কপর্দ্দক সম্পত্তিও ছিল না। রোগাক্রান্ত অবস্থায় বৃক্ষতলে শুইয়া আছেন; ঈশ্বরপুরী তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার এই অবস্থা মনে করিলে কাহার না হৃৎকম্প হইবে? কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের বোধ নাই। কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। বলিতেছেন, "কৃষ্ণ, তুমি বড় দয়াময়, দীনজনের দুঃখ দর্শনে তোমার কোমল হৃদয় দ্রব হয়!" তিনি যে এই অবস্থায় কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর করিতেছেন, ইহা কি বিদ্রূপ করিয়া? না,—তাহা কখনও নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায়, বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল, যেজন্য তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেন্দ্রপুরী বুদ্ধিতে বিদ্যায় সাধনে অদ্বিতীয়; নতুবা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর, আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল। বহুতর লোক

তাঁহার অনুগত থাকিবে, রাজা মহারাজগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবেন ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই পাইলেন না; তবে পাইলেন কি, না—রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটি জলপাত্র ও একটি কৃপালু শিষ্যের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া, তাঁহার সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া, মৃত্যুকালে বলিতেছেন,—"হে দীনদয়ার্দ্রনাথ!" ইহার তৎপর্য্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণকে দীনদয়ার্দ্রনাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহস্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়া, মহা সুখের সময়ও তাহা বলিতে পার না! কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দাসী দ্বারা যে সুখ, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অন্যজাতীয় সুখ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাঁহার ভক্তগণও এই "ভবের বাজারে" সার্থক "বিকিকিনি" অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র "হে দীনদয়ার্দ্রনাথ। আমি তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথা "আমার গা জ্বলিতেছে," কি "উদরে যন্ত্রণা হইতেছে," কি "অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল," এরূপ ভাবের কোন কথা তিনি একবারও বলিলেন না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন?

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আপনি হয়, অর্থাৎ নিসর্গই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ বলিয়া আর কোন পৃথক্ বস্তু নাই। জ্ঞানীলোকের এই কথায় আমার তত দুঃখ নাই, যেহেতু তাঁহারা ইহাও বলেন যে, স্বভাবের সৃষ্টিতে জটিলতা নাই; যথা, স্বভাব

যেমন অভাব দিয়াছেন, তেমনি অভাব দূর করিবার বস্তু দিয়াছেন; যেমন পিপাসা দিয়াছেন, তেমনি জল দিয়াছেন; যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন, যেমনি অন্ন দিয়াছেন; শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সে সৃষ্টির যদি ভুল না থাকে, তবে "আমি কখন মরিব না," কি "কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা প্রাণে মরিব,"—এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব, অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতেও পারে না। স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না। যদি শ্রীভগবান্-রূপ বস্তু না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আসিতে দিতেন না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন না,—ইহা অসম্ভব।

এই যে মাধবেন্দ্রপুরী "কৃষ্ণ! দেখা দাও, প্রাণ যায়," বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবের দৃষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করিবেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখিয়াছেন। যখন গো বৎস হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্ত্তী জননী সেই ডাক শুনিবামাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ "এই যে আমি" বলিয়া দর্শন দিলেন; স্বভাব পরোক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয় তবে সমুদায় মিথ্যা, যে স্বভাব লইয়া নাস্তিকেরা গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা। যাহা হউক প্রভু শান্ত হইলে গোপীনাথের সেবকগণ প্রসাদী বার থানা ক্ষীর আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। প্রভু কিছু লইলেন, এবং ভক্তগণ সহ সেবা করিলেন।

তথা হইতে সকলে জাজপুরে আসিলেন। জাজপুর তখন বড় সমৃদ্ধিশালী স্থান। এখানকার প্রধান ঠাকুর আদিবরাহ। ইহা বিরজাদেবীরও স্থান বটে। শুধু তাহাও নয়। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

জাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান। লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি সেই স্থানে। কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রামে॥

প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়। জাজপুরের যে অবস্থা, এক-কালে সমস্ত ভারতবর্ষের সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এই সমুদায় দেবালয় ভঙ্গ করিতে লাগিল তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্য হইল। কিন্তু উড়িষ্যায় মুসলমান প্রবেশ করিতে না পারায় ভারতবর্ষের পূর্ব্বকার অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ উৎকলদেশ ছিল। জাজপুরে কাজেই বহুতর ব্রাহ্মণ দেবালয় লইয়া জীবন-যাপন করিতেন। জাজপুরের আর এক সম্পত্তি বৈতরণী নদী। ইহার দশাশ্বমেধঘাটে প্রভু গণসহ স্নান করিয়া বরাহ দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু অন্যান্য দেবালয় দেখিতে চলিলেন। প্রভু বিরজাদেবীকে দর্শন করিয়া গোপীভাবে অভিভূত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করিলেন। সকলেই দেবদর্শনে তন্ময় হইয়া আছেন, এই অবকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র লুকাইলেন! ভক্তগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া একটি সঙ্কেতস্থান করিয়া, সকলে নগরের সমস্ত দেব-স্থানে প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে সঙ্কেত স্থানে সকলেই আসিলেন। কিন্তু প্রভুকে পাওয়া গেল না। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "এস আমরা ভিক্ষা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন কেন? আর যদি তিনি প্রকৃতই লুকাইয়া থাকেন, তবে আমাদের কি সাধ্য যে তাঁহাকে তল্লাস করিয়া ধরিব? মুখে যাই বলুন, তিনি ভক্তবৎসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।"

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে আহারাদি করিলেন, এবং সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারাধন পাইয়া সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর লুকাইবার আর কোন কারণ ছিল না। তবে লোকসঙ্গে দেবদর্শনে সুখ পাইবেন না বলিয়া ভক্তগণকে ফেলিয়া একাকী সমস্ত দেবদেবী দর্শন করিতেছিলেন।

ক্রমে তাঁহারা কটকে আসিলেন। কটক উড়িষ্যার রাজধানী, প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান। সেথানে তখন দিবানিশি সৈন্য-কোলাহল হইতেছে। প্রভু লোকসঙ্গ ভয়ে বনপথেই গমন করিতেছিলেন, কেবল যেখানে দেবস্থান সেখানেই রাজপথে আসিতেছেন। প্রভু সাক্ষীগোপাল-দর্শন করিতে কটক আসিলেন। রাজা তখন রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের ভবিষ্যৎ "সংত্রাতা" তাঁহার ভবনের নিকট দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন। কটকের নিম্নে মহানদী। প্রভু গণসহ সেখানে স্নান করিয়া গোপাল দর্শনে গমন করিলেন। সাক্ষীগোপাল ঠাকুরটি শ্রীগৌরাঙ্গেরই মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন ও একরূপ ভঙ্গী। ভক্তগণের বোধ হইতে লাগিল যেন দুই জনেই এক বস্তু, কি এক প্রকার। বিশেষতঃ যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ও গোপাল উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া থাকিলেন, তখন ভক্তগণের মনে হইল দুই জনেই এক, তবে পৃথক হইয়া কথা কহিতেছেন। প্রকৃত কথা, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইত যে, তিনি যেন কোন জীবন্ত বস্তু দেখিতেছেন, ও তাঁহার সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেন গোপাল ও গৌরাঙ্গ দুই জনে কথা কহিতেছেন। শ্রীচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা,—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি। ভক্তগণ দেখে যেন দুই এক মুর্ত্তি॥
দুহে এক বর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর। দুঁহে রক্তাম্বর দুঁহে স্বভাব গম্ভীর॥
মহা তেজোময় দুঁহে কমল নয়ন। দুঁহার ভাবাবেশে দুঁহে শ্রীচন্দ্রবদন॥
দুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে। ঠারা ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥

এই সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

গোপাল—"অধর হইতে বেণু ভূমিতে রাখিল। গৌরচন্দ্র সঙ্গে যেন কথা আরম্ভিল॥"

কটকের মত জনাকীর্ণ স্থানে প্রেমতরঙ্গ উঠাইলে বিষম-ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা বলিয়া চুপে চুপে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু গণসহ ক্রমে ভুবনেশ্বরে আসিলেন। ভুবনেশ্বরের ন্যায় সুন্দর-মূর্ত্তি জগতে আর নাই। গ্রীস ও রোম দেশের অনেক মূর্ত্তি মনোহর বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের দেবমূর্ত্তির যে ভঙ্গী তাহা ইউরোপে কিরূপ অনুভূত হইবে? মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে কারিগরি ব্যতীত প্রেমভক্তির চর্চ্চাও চাই॥ যেরূপ গায়ক প্রেমভক্তির চর্চ্চা করিলে তাঁহার গীতে ভুবন মোহিত করিতে পারেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তিচর্চ্চা করিলে তাঁহার কারিগরিতে ভুবন মুগ্ধ করিতে পারেন। বিশাখা চিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের শিবের স্থান, কাশীর ন্যায় বিখ্যাত, সেই জন্য উহাকে গুপ্তকাশী বলে। প্রভু শিবের বৈভব দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং শিবের অগ্রে নৃত্য করিলেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে। হেন প্রভু নৃত্য করে সবে বিদ্যমানে॥"

শিবের প্রেমে প্রভু উন্মত্ত হইলেন, যথা—

"মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর। টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার॥

পরদিন প্রাতে বিন্দুসরোবরে আবার স্নান করিয়া সকলে কমলপুরে আসিলেন; এবং ভাগী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিতে চলিলেন; নিত্যানন্দ গেলেন না, ঘাটে বসিয়া রহিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্য কোন ঠাকুর দেখিতে সেরূপ স্পৃহা ছিল না। যাহা হউক, সকলে কপোতেশ্বর-শিব দেখিতে চলিলেন, তখন জগদানন্দ ভাবিলেন যে, ঐ সুযোগে ভিক্ষা করিয়া আনিবেন। তিনি ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষা করিবেন বলিয়া, দণ্ড-খানি শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে দিয়া গেলেন, এবং নিতাই দণ্ড লইয়া ভাগী নদীর তীরে বসিলেন। গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ডের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "দণ্ড! তোমার মত আমারও একখানি দণ্ড ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে পারিলে আমার মনের দুঃখ যায়। ভাল, দণ্ড! আমি যে ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন করি, সে ঠাকুর তোমাকে বহন করেন, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা কেন? এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে। ঠাকুর বংশী হাতে করিয়া ত্রিজগত মোহিত করিতেন। সেই বংশী তুমি দণ্ড হইয়া তাঁহাকে বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গাল করিয়াছ। আজ, দণ্ড! তোমায় আমি দণ্ড দিব।" ফল কথা, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে তাঁহার ভক্তগণ ও নিজ-জন বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট প্রভুর সন্ন্যাসের সমস্ত উপকরণ বিষের ন্যায় বোধ হইত; কিন্তু কিছু করিতে, বা কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না। এখন শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ডটিকে পাইয়াছেন, তাহাকে ছাড়িবেন কেন? প্রকৃতই তাহাকে ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন।

জ্ঞানী-লোকে বলে যে, দণ্ডটি বিধির প্রতিরূপ। শ্রীভগবান বিধির ভৃত্য নহেন, তিনি তাহার বাহিরে; তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। বিধি-ধর্ম্ম ও প্রেম-ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। নিতাই প্রেম ধর্ম্মের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী। তিনি প্রভুর এই দণ্ডরূপ ভণ্ডামী

রাখিতে দিবেন কেন? তাই দণ্ড-গাছটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিতাই বসিয়া রহিলেন, মনে মনে সাহস বান্ধিতে লাগিলেন যে, প্রভু যদি দণ্ড-ভাঙ্গা লইয়া ক্রোধ করেন, তবে প্রভুর সহিত ঝগড়া করিবেন। সেই হইতে ভাগা নদীর নাম হইল দণ্ডভাঙ্গা নদী!

তৃতীয় অধ্যায়

"শ্যাম-নাগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেলায়ে। চাহিছে আমার পানে হাসিয়ে হাসিয়ে ।।

— চৈতন্যমঙ্গল গীত।

প্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়া আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার জন্য দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইবেন না; তিনি যে ইহার কিছু অবগত আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না। কমলপুর ছাড়িয়াই প্রভু মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই যেন চেতনা পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?" ভক্তগণ বলিলেন, "শ্রীমন্দিরের চূড়া" ইহা শুনিয়া নানাভাবে প্রভুর শরীর তরঙ্গায়মান হইল, এবং এই সকল ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল; যথা—

"অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার। বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ ভার ।।
প্রসাদের দিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে। চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ।।"

সে শ্লোকটি এই—প্রসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো,
মমালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।

প্রভু যখন প্রাসাদাগ্র দর্শন করিলেন, তখন স্তম্ভিত হইলেন। প্রভুর মন তখন দাস্যভাবে নীলাচলচন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্থান

বৃন্দাবন। তখন তাঁহার স্থান নীলাচল হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলচন্দ্রের মন্দিরে অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্দিরের চূড়া—বহুদিন পরে, বহু কষ্টের পরে, বহু সাধনার পরে—প্রভু দর্শন করিলেন। এ চূড়াটি কি, না মন্দিরের সাক্ষী। মন্দির কি, না শ্রীকৃষ্ণ উহার মধ্যে আছেন। প্রভু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চূড়ার অগ্রভাগ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখেন যে বালক বনমালী প্রাসাদাগ্রে দাঁড়াইয়া, হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। যেন বলিতেছেন, "এই দেখ, তুমিও যেমন আমাতে মিলিতে ব্যস্ত, আমিও তেমনি তোমাকে অভ্যর্থনার্থে দাঁড়াইয়া আছি।"

শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর বালগোপাল ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহার গলে বনমালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া, সর্ব্বাঙ্গ কুসুমমালায় সজ্জিত, বাম-হস্তে মুরলী। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, আর বনমালী হাসিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা প্রভুকে ডাকিতেছেন। হে ভক্ত! এই চিত্রটি হৃদয়ঙ্গম কর। শ্রীনিমাই যে শ্রীভগবান বলিয়া বালগোপাল দর্শন করিলেন, তাহা নয়। তিনি ভক্তরূপ ধরিয়া, ভক্তের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, লাভালাভ এবং সুখাসুখ কি, তাহা জীবগণকে দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যেটুকু ভক্তির বলে গোপাল দর্শন করিলেন, তোমার যদি সেইটুকু ভক্তি হয়, তবে তোমাকেও বালগোপাল হাসিয়া হাসিয়া ঐরূপে ডাকিবেন; প্রভু "প্রাসাদাগ্রে" শ্লোকটি বালগোপাল দর্শনমাত্র রচনা করিয়া অর্দ্ধেক বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং উহার অপরার্দ্ধ জীবে আর জানিতে পারিল না। কিন্তু প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ এত হইল যে, হৃদয়ে না ধরিয়া উথলিয়া উঠিল। আনন্দ উথলিয়া উঠিতে থাকিলে যতক্ষণ পথ পায় ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে। কিন্তু আনন্দ-তরঙ্গের গতিরোধ হইলেই মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। প্রভুর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে

যে, উহার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। মূর্চ্ছা প্রভুকে অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাখিতে পারিল না। তিনি অল্প-চেতনা পাইয়াই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চেষ্টা মাত্র,—যাইতেছেন, আবার ধূলায় পড়িতেছেন। প্রভু যখন অল্প-চেতন পাইয়া উঠিতেছেন, তখন প্রাসাদাগ্রে চাহিয়াই দেখিতেছেন যে, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; আর চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "দেখ! দেখ! কৃষ্ণবর্ণ-শিশু! আহা মরি, কি সুন্দর নীলমণিকান্তি! কি সুন্দর বদন। কি সুন্দর হাস্য! ঐ দেখ আমার পানে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন!" কখন-বা নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখ!" নিতাই করেন কি, না দেখিয়াও বলিতেছেন, "হাঁ দেখিতেছি।" আবার কখন প্রভু "দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি এখনই আসিতেছি," বলিয়া দৌড়িতেছেন, কিন্তু আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন! এই স্থানে চৈতন্যমঙ্গলের অপরূপ বর্ণনা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।*

* স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি যান পথে। জগন্নাথ মন্দির দেখিলা আচম্বিতে॥
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম। দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত। নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥
তা দেখিয়া সব জন চিন্তিত অন্তর। "প্রভু" "প্রভু" বলি ডাকে না দেয় উত্তর॥
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর। পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল॥
দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্ব্বার। মরণ শরীরে যেন জীউর সঞ্চার॥
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে। দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে॥
নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল। ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ পায় পাছে, আশঙ্কা হইল॥
পথে যত দেখে সুকৃতি নরগণ। তারা বলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ। আনন্দধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশে॥

এইরূপে লীলা করিতে করিতে প্রভু মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। যে স্নিগ্ধ স্নেহময় মনোহর মুখ সহজ অবস্থায় দেখিলে লোকের জগৎ সুখময় বোধ হয়, এখন সেই বদন নানাভাবে, নানারূপ সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত হইয়াছে! যেমন দ্বাদশবর্ষীয়া বালার মনে আবেগ হইলে ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে, প্রভুর সুচিক্কণ হিঙ্গুলরঞ্জিত ঠোঁট সেইরূপ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, পদ্মচক্ষুদুটি লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে দুটি কারুণ্য-রসের সরোবর। প্রভুর গলিত-সুবর্ণ-অঙ্গ যখন ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, তখন অপরূপ শোভা হইতেছে। আবার একটু পরেই নয়ন-জলে সমস্ত অঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুর সুবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রভুর বয়স প্রকৃত যত তাহা অপেক্ষাও তাঁহাকে অল্প-বয়স্ক বোধ হইত। বয়স বৃদ্ধির সহিত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ-বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই সকলে ভাবিতেছে, ইনি যে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন, ইনিই ত কিশোর-নারায়ণ! প্রভু চলিয়াছেন কিরূপে, যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"হাসে কান্দে নাচে গায় হুঙ্কার গর্জ্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন।।"

কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ, এইটুকু পথ আসিতে দুই প্রহর বেলা হইল। যেমন প্রতাপরুদ্র কটকের রাজা, তেমনি শ্রীজগন্নাথ পুরীর রাজা। ইচ্ছা করিলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না! যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

"নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দরশন। পরিচায়ক বিনা নাহি পায় অন্য জন।।
তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব। তা সবার দরশন অত্যন্ত দুর্লভ।।
রাজার মনুষ্যে যদি করয়ে সহায়। তবে সে সুলভ হয় জগন্নাথ রায়।।"

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের দর্শন কিরূপে হইবে। তাঁহারা পরদেশী, কাহারও সহিত পরিচয় নাই। তবে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে আছেন। তিনি সহায়তা করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শন হইতে

পারে। কারণ এক প্রকার তিনিই পুরীর রাজা। উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহাকে রাজার নীচে সম্মান করেন। তবে তিনি বড়লোক, রাজমন্ত্রী হইতেও অধিকতর পূজ্য। রাজা তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনি কেন তাঁহাদের ন্যায় উদাসীনদিগকে সহায়তা করিবেন? এই সময় মুকুন্দ বলিলেন যে, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর ভক্ত, তিনি নীলাচলে আছেন। কাজেই তিনি সহায়তা করিবেন। আর ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি বলিয়া সহয়তা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব এই গোপীনাথের ভরসাকে প্রধান করিয়া ভক্তগণ নীলাচলে চলিলেন। অবশ্য প্রভু এ পরামর্শের কিছুই জানেন না। আঠারনালায় আসিয়া প্রভু সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "আমার দণ্ড কোথায়?" নিত্যানন্দ বরাবর ভাবিতেছেন যে, দণ্ডভাঙ্গার দণ্ড হইতে তিনি এড়াইয়াছেন। এখন প্রভুকে দণ্ডের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তবে প্রভু এখন নীলাচলে আসিয়াছেন, আর কি করিবেন? তাহার পরে, সন্ন্যাস-গ্রহণাবধি প্রভু ভক্তদিগের সুখ-দুঃখের কথা না ভাবিয়া আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছেন। কাজেই শ্রীনিতাইয়ের মনে রাগও আছে। এই দণ্ড-ভঙ্গ লইয়া প্রভুর সহিত কোন্দল করিবেন, সে সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল! কিন্তু প্রভুর সম্মুখে আসিয়া সে সাহস আর থাকিল না। কাজেই নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তখন প্রভু যেন কৌতূহলী হইয়া অন্যান্য ভক্তজনের দিকে চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিতেন। তিনি উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। কাজেই তিনি প্রভুকে বলিলেন, "আমাদের দিকে চাহেন কেন শ্রীপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।" ইহাতে প্রভু জগদানন্দকে দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, "তাহা তিন খণ্ড হইয়া গিয়াছে।" তখন প্রভু একটু হাসিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,

"দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন? পথে কি কাহারও সহিত দাঙ্গা করেছিলে?" শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন আমার হাতে দণ্ড দিল। তোমাকে ধরিতে যাইয়া দুই জনের ভরে উহা ভাঙ্গিয়া গেল।" ইহা শুনিয়া জগদানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া লাভ কি আর অব্যাহতিই বা কোথা? আমার নিকট দণ্ড ছিল, আমার এখন স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। প্রভু, শ্রীপাদ কি ভাবিয়া আপনার দণ্ড ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।" তখন প্রভু যেন কোপ করিয়া শ্রীনিতাইয়ের পানে চাহিলেন। নিতাইয়ের এখন, হয় প্রভুর চরণে পড়া, কি কোন্দল করা,—ইহার একটি বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একটু কোন্দল করিবার সাধও আছে। তাই বলিলেন, "তা আমি ইচ্ছা করেই ভেঙ্গেছি। একখানা বাঁশ বৈত নয়? ইহার যে দণ্ড হয়, কর।"

প্রভুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই ভয় পাইলেন, ভক্তগণও চিন্তিত হইলেন। প্রভুও একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমস্ত দেবতার বাস, সেই দণ্ডকে বল কিনা একখানা বাঁশ?" প্রকৃত পক্ষে নিতাইয়ের নিকট দণ্ডটি একখানা বাঁশ বই আর কিছু নয়। প্রেমভক্তি ভজনে সন্ন্যাসের বা অন্য নিয়মের প্রয়োজন কি? ব্রজের গোপীগণের মধ্যে কে কবে দণ্ড ধরিয়াছিলেন? কিন্তু নিতাই আর বাড়াবাড়ি না করিয়া একটি বড় মধুর উত্তর দিলেন,—বলিলেন, "ভাল, তোমার বাঁশে সমুদায় দেবগণ বাস করেন। তুমি বুঝি এখন তাঁহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া বেড়াইবে? আমরা তাহা কিরূপে সহিতে পারি?" এ কথায় প্রভুর ক্রোধ গেল না। কিন্তু ভক্তগণের যেরূপ ভয় হইয়াছিল তেমন কিছু ক্রোধ প্রভু করিলেন না। তবে, প্রভু বড়ই ক্রোধ করিবেন তাহা ভাবিবার কারণ ছিল। প্রভু কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন

না ; করিলে ভারি শাসন করিতেন। আর নিজেও নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না, তাহা নিশ্চিত। দণ্ড-ধারণ সন্ন্যাসের নিয়ম। গুরু দণ্ড দিয়াছেন, ইহা ভঙ্গ হইলে আবার তাঁহার কাছে যাইয়া আর একখানি দণ্ড লইতে হইবে। কিন্তু তিনিই বা কোথা, আর তাঁহার গুরু কেশব ভারতীই বা কোথা। যদি প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন যে, দণ্ড ভাঙ্গার সঙ্গে ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, তাহা বলিলেও পারিতেন। সুতরাং দণ্ড ভঙ্গ করা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে কম সাহসিকের কার্য্য হয় নাই। নিত্যানন্দই ইহা পারিয়াছিলেন, আর কাহারও সাহসে কুলাইত না, সাধ্যও হইত না। তবে, দণ্ডের উপর প্রভুর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। এ দণ্ড-গ্রহণ প্রকারান্তরে তাঁহার আপনার ধর্ম্মের বিরোধী। কাজেই দণ্ড ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে না। ক্রোধও যেটুকু করিলেন, সেও কেবল ভক্তগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত। প্রভু বলিতেছেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া খুব উপকার করিলে। সবে একখানি দণ্ড আমার সম্বল ছিল, তাহাও অদ্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভঙ্গ হইল। এখন আমার সহিত আর তোমরা যাইতে পারিবে না। হয় তোমরা অগ্রে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর, নতুবা আমি অগ্রে যাই।" ইহাতে মুকুন্দ বলিলেন, "তুমি অগ্রে যাও।" "সেই ভাল," বলিয়া প্রভু ছুটিলেন। প্রকৃত কথা, প্রভুর ইচ্ছা তিনি একা যাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একা জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেন এরূপ ইচ্ছা করিলেন তাহা পরের ঘটনা শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। তাই দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন ; আর ক্রোধ উপলক্ষ্য করিয়া, ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া একা শ্রীমন্দির অভিমুখে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

এখন উপরের কথা একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন যে, প্রভুকে লইয়া তাঁহারা কিরূপে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ও ঠাকুর-দর্শন করিবেন। এখন সেই ঠাকুর-দর্শন করিতে প্রভু একা চলিলেন—একেবারে অচেতন হইয়া। জগন্নাথের দ্বার, সেবকগণ রক্ষা করিতেছে। তাহাদের অতিক্রম করিয়া কাহারও ভিতরে যাইবার যো নাই। প্রভু না জানি আজি কি লীলা করেন! তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে গেলেও হয়ত কিছু সহায়তা করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা, কেহ সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তাহার পর, প্রভু বিদ্যুৎ-গতিতে গমন করিলেন। চেষ্টা করিলেও তাঁহার সঙ্গে কেহই যাইতে পারিবে না, তাহা তাঁহারা জানেন। এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভক্তগণ, প্রভু নয়নের অদর্শন হইলেই, দ্রুতপদে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ক্রমে মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহারা যে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা মনে নাই—মন্দির দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সিংহদ্বারে আসিয়া, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি একজন নবীন-সন্ন্যাসীকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছ? তাঁহার গায়ে ছেড়া কাঁথা, প্রকাণ্ড শরীর, বর্ণ কাঁচাসোণার ন্যায়, আর প্রেমে তাঁহাকে পাগলের মত করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "দেখেছি, সে বড় অদ্ভুত কথা।" এদিকে তিনি আঠারনালায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লইবামাত্র—

"মত্ত সিংহগতি জিনি চলিলা সত্বর। প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥"—চৈঃ ভাঃ।

যাঁহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা নিবারণ করিতে পারিলেন না, করিবার অবকাশও পাইলেন না। প্রভু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন, ও "মার" "মার" করিয়া তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িলেন। মনে ভাবুন, যেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাজ-সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আর বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে।

রাজার নিকটে গমন করা মক্ষীকারও সাধ্য নাই। এই অবস্থায় যদি কেহ দৌড়িয়া, বিনা অনুমতিতে, রাজার নিকট যাইতে থাকে, তবে রাজসভাস্থ সকলের ও দ্বারিগণের মনে কি ভাবের উদয় হয়? "কে" "কে" "মার্" "ধর্" শব্দ দিক হইতে উঠে; আর তাহাকে ধরিতে সকলে ধাবমান হয়। শ্রীমন্দিরেও তাহাই হইল। প্রভু একেবারে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত!

"দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে। ইচ্ছা হৈল জগন্নাথে কোলে করিবারে।।"

প্রভু দেখিলেন জগন্নাথ সিংহাসনে বসিয়া। তখনই ইচ্ছা হইল, হয় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন, কি তাঁহাকে আপন হৃদয়ে পুরিবেন। এইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু জগন্নাথকে ধরিতে গিয়া লম্ফ দিলেন, জগন্নাথকে স্পর্শও করিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথের যে সমস্ত সেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং যাঁহারা প্রভুর পাছে পাছে দৌড়িয়া আসিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহা দেখিলেন, কিন্তু কেহই বাধা দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মতে প্রভু আপন জোরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, সেই তাঁহার এক অপরাধ। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক অপরাধ হইল, শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করা। যদি কেহ এইরূপ বিনা অনুমতিতে, এবং রক্ষকগণকে অতিক্রম করিয়া, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মস্তকে যষ্টির আঘাত করে, তবে সেই সাহসিক ব্যক্তির—রক্ষক ও সভাসদগণের মতে,—যেরূপ অপরাধ হয়, জগন্নাথের সেবকগণের মতে, প্রভুর তাহা অপেক্ষাও অধিক অপরাধ হইল। এরূপ ভাবিবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীজগন্নাথ জীবন্ত-ঠাকুর। তাঁহার সেবকগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার তাঁহার সেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও নাই, এবং যদি অপর কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ শত-শত খণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু

প্রভু, জগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, অথচ তাঁহার অঙ্গ খণ্ড-খণ্ড হইল না, ইহাতে স্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ যখন দণ্ড করিলে না, তখন সেবকগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে "মার্" "মার্" বলিয়া সকলে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল। আবার যখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন কাজেই শত শত লোক সুবিধা পাইয়া প্রভুকে মারিবার উপক্রম করিল।

ঠিক সেই সময় একজন দীর্ঘকায় পঞ্চদশাধিক বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত। তাঁহার মনে কিন্তু কোনরূপ ক্রোধের উদয় হয় নাই, বরং বিপরীত ভাব হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, বিদ্যুল্লতা-জড়িত কোন মহাপুরুষ আসিয়া জগন্নাথের সম্মুখে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! ইহা দেখিবা মাত্র তাঁহার সমস্ত অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল; আর যখন শত-শত সেবকগণ প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল, তখন প্রভুকে প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবেন, এই সংকল্প করিয়া তিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কর কি? দেখিতেছ না, মহাপুরুষ?" যিনি এ কথা বলিলেন, তাঁহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয়। তিনি সে স্থানে আজ্ঞা করিতে পারেন, এবং তিনি আজ্ঞা করিলে উহা লঙ্ঘন করে এরূপ সাহস সেখানে কাহারও ছিল না। কিন্তু তবু জগন্নাথের সেবকগণ নিরস্ত হইল না। যেহেতু তাহারা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়াছে। তাহারা কাহারও কখন এরূপ স্পর্দ্ধা দেখে নাই; ইহাতে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিতেছিল। কাজেই সেই ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, আপন শরীর দিয়া প্রভুকে আবরণ করিলেন; তখন সেবকগণ বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইল। যখন সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে আবরণ করিয়া রাখিলেন, মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে মারিতে গেলে পাছে তাঁহার গাত্রে লাগে এই ভয়ে সেবকগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যিনি

প্রভুকে এইরূপে আবরণ করিয়া রাখিলেন, তিনি ভুবনবিখ্যাত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম। নদীয়ার বিখ্যাত-পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র,—বাচস্পতি ও সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথম ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। তিনি, শ্রীনবদ্বীপে ন্যায়ের "আদি-চিন্তামণি'' গ্রন্থরচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। তাঁহার যশঃ শুনিয়া, প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে যত্ন করিয়া পুরীতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সমুদায় ভারতবর্ষে বিখ্যাত; বলা বাহুল্য তিনি প্রতাপরুদ্রের গুরুস্থানীয়। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উড়িষ্যায় যে কিছু হয়, তিনি তাহার নেতা, মীমাংসক ও মন্ত্রী। কাজেই তিনি এক প্রকার জগন্নাথ-মন্দিরের কর্ত্তা। বাসুদেব মিথিলায় ন্যায় অভ্যাস করিয়া, বারাণসী-নগরীতে বেদ পড়িতে গমন করেন। সেখান হইতে বেদ সমাপ্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। এখন পুরীতে টোল করিয়াছেন। এখানে কেবল ন্যায় নহে, যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাকে তাহাই পড়ান,—কারণ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। বিশেষতঃ তিনি দণ্ডীদিগকে বেদ পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং বেদ পড়িতে কাশীতে না যাইয়া অনেকে তাঁহার নিকট পুরীতে আসিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন।

এরূপ অসময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাঁহার মন্দিরে থাকিবার কথা নহে, কিন্তু সে দিবস ছিলেন। কেন ছিলেন ভক্তগণ তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই জগন্নাথ-সেবকগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন,—তিনি ও কটকবাসী স্বয়ং মহারাজ ব্যতীত আর কেহই ইহা পারিতেন না। সার্ব্বভৌম যে মহাপুরুষের ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইতেন না, যেহেতু তাঁহারা জগন্নাথের সেবক। তাঁহাদের উপর আবার মহাপুরুষ কে? শ্রীভগবানের

আত্মীয়ই বা কে? তবে তাঁহারা যে নিরস্ত হইলেন, সে কেবল সার্ব্বভৌমের অনুরোধে;—তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। বলিয়া। তবু তাঁহাদের ক্রোধের শান্তি হইল না, মনে মনে রহিয়া গেল। শ্রীজগন্নাথের ভোগ মুহুর্মুহু দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয়া হয়, তখন ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কপাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আইসেন। সে সময় সেখানে কেহ থাকিতে পায় না। ভোগের সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সম্মুখে প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া। জগন্নাথের সেবকগণ সেই কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম তখন কিছু বিপদে পড়িলেন। এই মহাপুরুষটিকে অচেতন অবস্থায় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া বাড়ী যাইতে পারিলেন না। তখন চিন্তা করিয়া অচেতন সন্ন্যাসীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাব্যস্ত করিলেন, এবং সেবকগণের মধ্যে, যাঁহারা তাঁহার শিষ্য, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীকে বহন করিয়া তাঁহার বাড়ী পঁহুছিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তাঁহাদের ক্রোধ একটু শান্তি হইয়াছে, সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়াও কেহ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন। কাজেই সন্ন্যাসীকে সার্ব্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাইতে অনেকেই প্রস্তুত হইলেন। তখন কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ জানু, কেহ মস্তক, কেহ কটি, কেহ বক্ষ ধরিয়া সেই প্রকাণ্ড শ্রীঅঙ্গ বহন করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহাভিমুখেই চলিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়াই হউক, কি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই হউক, প্রভুকে লইয়া যাইবার সময় সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে জগন্নাথসেবকের স্কন্ধে, হরিধ্বনির সহিত, আমাদের প্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমের গৃহে শুভাগমন করিলেন! তখন প্রভুকে অভ্যন্তরে লইয়া পবিত্রস্থানে, পবিত্র আসনে শয়ন করাইলেন ও বাহকগণকে বিদায় দিয়া, নিজে প্রভুর শিয়রে বসিয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন, প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার আয়ত-নয়ন অৰ্দ্ধ-মুদ্রিত, তারা স্থির, আর হৃদয়ে স্পন্দন নাই। ইহাতে ভয় পাইয়া নাসিকায় তূলা ধরিলেন, এবং মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়া বুঝিলেন, তূলা ঈষৎ চলিতেছে। তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং অঙ্গ পুলকাবৃত দেখিয়া বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী মহাভাবে বিভাবিত হইয়া আছেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সমুদায় অবগত আছেন। তাহার মধ্যে কতক মনোগত ও কতক অভ্যাসবশতঃ বিশ্বাস করেন, আর কতক আদবে বিশ্বাস করেন না। "কৃষ্ণপ্রেম" শব্দ শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি ভাব হয় তাহাও পড়িয়াছেন; কিন্তু ভাবিতেন যে, কলিকালে উহা ঘটে না। "কৃষ্ণপ্রেম" বলিয়া প্রকৃত কোন বস্তু যদি থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গণেরই থাকিতে পারে, অপরের এরূপ প্রেম সম্ভবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছেন, কৃষ্ণপ্রেম শাস্ত্রের কল্পনা নয়, প্রকৃত বস্তু। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সন্ন্যাসীটিকে পাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ বড় অপরিষ্কার বলিয়া তাহাদের দেখিলে গৃহস্থের কখন কখন ঘৃণা হয়। কিন্তু প্রভুর লীলা-লেখকেরা বলিয়াছেন যে, প্রভুর অঙ্গের সৌরভে সর্ব্বদা নাসিকা মত্ত হইত। তাহার পর সার্ব্বভৌম দেখিতেছেন যে সন্ন্যাসীটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সুবলিত, এবং বর্ণ অলৌকিক। বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহ কখন পাপ কি কু-ইচ্ছা স্পর্শ করে নাই, আর ইহার হৃদয় করুণা স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ, অন্তর সরল ও বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ। সার্ব্বভৌম যত দেখিতেছেন, ততই সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন; তবে বহুক্ষণেও তাঁহার চৈতন্য হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত রহিয়াছেন।

ওদিকে ভক্তেরা সিংহদ্বারে আসিয়া মহা কলরব শুনিলেন। একটু

পরেই বুঝিলেন যে, অতি রূপবান নবীনবয়স্ক এক সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তখন সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইবেন স্থির করিয়া ভাবিতেছেন, কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন। এমন সময় গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া উপস্থিত। ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি, পরমপণ্ডিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। শ্যালকের নিকট আসিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলেই মহা হর্ষযুক্ত হইয়া ভাবিলেন, এ প্রভুর কার্য্য না হইলে, যে সময় যাহাকে প্রয়োজন, ঠিক সেই সময় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কেন? পরস্পরে বন্দন-আলিঙ্গনাদির পরে গোপীনাথ শুনিলেন যে, শ্রীনিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, আর এখন তিনি সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে। এই সংবাদ শুনিয়া গোপীনাথের সুখ দুঃখ উভয় হইল। দুঃখ হইল, নবদ্বীপনাগর এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন বলিয়া, আর সুখ হইল, প্রভুকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া। গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ সহ সার্ব্বভৌমের গৃহাভিমুখে দৌড়িলেন। ভক্তগণ এখানে মহা অপরাধ করিলেন,—মন্দিরের নিকট আসিয়াও শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলেন না। গোপীনাথের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিবিষ্ট, জগন্নাথের কথা একেবারে মনেই ছিল না। তবে যাইবার বেলা শ্রীমন্দিরকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইয়া, ভক্তদিগকে বহির্দ্বারে রাখিয়া গোপীনাথ ভিতরে গেলেন। যাইয়া দেখেন যে, নবদ্বীপচন্দ্র কাঙ্গাল বেশে ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শুইয়া আছেন। প্রভুর মুখ দেখিয়া গোপীনাথের কিছু সুখ হইল বটে, তবে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হৃদয়

বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সার্ব্বভৌম যদিও শ্যালক, তবু বহিরঙ্গ লোক বলিয়া সন্ন্যাসীর উপর নিজের কি ভাব তাহা প্রকাশ করিলেন না। তবে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর গণ পঞ্চজন আসিয়াছেন! সার্ব্বভৌম শুনিয়াই তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলেন। কারণ তিনি সন্ন্যাসীটিকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়াছিলেন। গোপীনাথও তৎক্ষণাৎ যাইয়া ভক্তগণকে ভিতরে লইয়া আসিলেন। প্রভুকে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন ও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহারাও, প্রভুকে যত্ন করিয়াছেন বলিয়া, সার্ব্বভৌমকে বহু ধন্যবাদ দিলেন। তখন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এরূপ ঘোরমূর্চ্ছা হইলে প্রভু অচেতন অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকেন। তাহার পরে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহাদের ভাগ্যে ঠাকুর দর্শন ঘটে নাই, তখন তিনি আপন পুত্র চন্দনেশ্বরকে, তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাকুরদর্শন করিতে পাঠাইলেন। ভক্তগণ গোপীনাথের তত্ত্বাবধানে প্রভুকে রাখিয়া, নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে চলিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে সেবকগণ শুনিলেন যে, পূর্ব্বে যে সন্ন্যাসী জগন্নাথকে ধরিতে গিয়াছিলেন, ইহারা তাঁহারি গণ। তখন তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আপনারা স্থির হইয়া দর্শন করিবেন, পূর্ব্বকার গোসাঞির মত অধীর হইয়া জগন্নাথকে ধরিতে যাইবেন না। ফল কথা পূর্ব্বকার গোসাঞির সাহসিক কাণ্ড দেখিয়া তাঁহারও তাঁহার গণের উপর সেবকগণের একটু ভয় ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা সেইজন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে মালা চন্দনাদি প্রসাদ আনিয়া দিলেন। তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শন সুখ অল্পক্ষণ ভোগ করিয়া প্রভুর কাছে যাইয়া দেখিলেন যে, তখনও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই।

যথা—"বাহুপরে শির রাখি প্রভু অচেতন। ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন॥"

তখন প্রভুকে চেতন করিবার জন্য ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মধুর হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রভু হুঙ্কার করিয়া "হরি" "হরি" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন সার্ব্বভৌম "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। প্রভুও "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম করজোড়ে বলিলেন, "স্বামিন্, সমুদ্র স্নান করিয়া আসুন, এবং এ অধমের গৃহে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন। প্রভু সম্মত হইয়া সেই তৃতীয়-প্রহর বেলায় গণসহ সমুদ্রস্নানে গেলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌম মনের সাধে প্রসাদ সংগ্রহ করিলেন, এবং প্রভু গণসহ স্নান করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম সুবর্ণ থালায় প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভক্তগণ সহ স্নান করিতে যাইবার সময়, তিনি কিরূপে অচেতন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে যাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, সেবকগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন ও সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং শেষে কিরূপে তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যান,—এ সমুদায় ভক্তগণের মুখে শুনিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমের উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু স্নান করিয়া আসিয়া "তৃণাদপি" নীচ হইয়া সার্ব্বভৌমকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবার জন্য তিনি অতি উপাদেয় প্রসাদ আনিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যদি তিনি সুরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম আপনি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম যাহা ভাবিয়াছিলেন, প্রভু তাহাই করিলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া করজোড়ে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "এই সমুদায় পিঠাখানা, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রীপাদ প্রভৃতিকে দিতে আজ্ঞা হয়। আমাকে কিঞ্চিৎ নফরা ব্যঞ্জন দিলেই যথেষ্ট হইবে।" প্রভু

গরুড়-পক্ষীর ন্যায় সার্ব্বভৌমের অগ্রে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে প্রসাদ ভুঞ্জাইবার নিমিত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, স্বামিন্! একবার আপনি আস্বাদন করিয়া দেখুন।" শ্রীসার্ব্বভৌম এইরূপ করজোড়ে প্রভুকে অনুরোধ করিতে থাকিলে, তিনি আর না বলিতে পারিলেন না, ক্রমে সমুদায় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম তাঁহার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া গোপীনাথ সহ ভোজন করিতে অভ্যন্তরে গেলেন।

এ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম জানেন না যে, ইঁহারা কাহারা। যতক্ষণ প্রভু অচেতন ছিলেন, ততক্ষণ কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। সমুদ্র-স্নান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই অন্যায়, তারপর প্রভু তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন। কাজেই তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। আর না করিবার অন্য কারণও ছিল। গোপীনাথ যে শ্রীগৌরাঙ্গের গণ ইহা সার্ব্বভৌমকে বলেন নাই। কারণ সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্যে নাস্তিক, তাঁহার নিকট নদীয়ার অবতারের কথা বলাও যা, বেণা-বনে মুক্তা ছড়ানও তা। কাজেই গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে এরূপ ভাব করিতেছেন, যেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহা গোপন থাকিল না। সার্ব্বভৌম বেশ বুঝিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসী গোপীনাথের কেবল পরিচিত নহেন, অতি প্রিয় ও আত্মীয়ও বটেন। তবে তিনি প্রভুর মুখে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী কৃষ্ণভক্ত। ভিতরে যাইয়াই সার্ব্বভৌম ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় গোপীনাথ বলিলেন যে, নবীন-সন্ন্যাসী নিমাই পণ্ডিত নামে শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত। ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের পুত্র; আর

সঙ্গীরা নবীন-সন্ন্যাসীর গণ!" ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বড়ই আনন্দিত হইলেন। উড়িষ্যার রাজা ও বাঙ্গালার বাদসাহে যুদ্ধের নিমিত্ত লোক গতায়াত বন্ধ। কাজেই তিনি নির্ব্বাসিতের ন্যায় দূরদেশে বাস করেন। এমত অবস্থায় গৌড়ীয় মাত্রই সার্ব্বভৌমের আদরের বস্তু। এখন দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী ও তাঁহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, নদীয়াবাসীও তাঁহার পরিচিত, এবং এক প্রকার আত্মীয়ও বটেন। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "বটে! তবে ইনি যে আমার নিজ-জন। আমার পিতা বিশারদ ও ইঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সমাধ্যায়ী, আর ইঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর আমার সমাধ্যায়ী। আমি বড় সুখী হইলাম।" ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর সম্মুখে আসিয়া, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন, প্রভুও "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "আমি আপনার মহিমা শ্রবণ করিলাম। আপনি আমার অতি নিজ-জন। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত আমাদের বরাবর ঘনিষ্ঠতা আছে, সহজেই আপনি আমার পূজ্য। আবার এখন সন্ন্যাস লইয়াছেন, অতএব আমাকে আপনার নিজ দাস বলিয়া জানিবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিহরিয়া উঠিলেন ও কর্ণে হস্ত দিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আপনি বলেন কি? আপনি জগদ্‌গুরু, সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমি সন্ন্যাসী বটে, আপনি সেই সন্ন্যাসীদের শিক্ষা-গুরু। আপনি পরম দয়ালু, এই জগৎকে নিজে দয়াগুণে শিক্ষা দিতেছেন। এই সমুদায় আনিয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি বালক, অজ্ঞ, ভাল মন্দ জানি না; বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। আপনি আমাকে আপনার শিশু ভাবিয়া, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। অদ্যকার বিপত্তির কথা মনে করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। আপনি উপস্থিত না থাকিলে আজ আমার যে কি

দুর্গতি হইত তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে বড় সন্দেহ ছিল, বুঝি আমি আপনার দর্শন পাইব না; শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, তাহা আমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন।” সার্ব্বভৌম প্রভুর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি আর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিও না তোমার যেরূপ ভাব, তাহাতে সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া দর্শন করা কর্ত্তব্য। শুন গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর দর্শন করাইও। গোসাঞিের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর দিলাম।”

প্রভু অতি দীনভাবে সার্ব্বভৌমকে আত্মসমর্পণ করায় তিনি পরমানন্দিত হইলেন। আর সেই সঙ্গে ধন্ধার বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার তেজ, আকার, প্রকৃতি ও ভাব দেখিয়া মনে করেন, এ বস্তুটি হয় স্বয়ং জগন্নাথ, না হয় কোন দেবতা, মনুষ্যরূপে বিচরণ করিতেছেন। কারণ ইহার আকৃতি প্রকৃতি ঠিক মনুষ্যের মত নয়। তারপর এই মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ় প্রেম, ইহা ত জীবে সম্ভবে না। ইহাতে সার্ব্বভৌমের মনে হইল এ বস্তুটি অতি দুর্লভ, পরম ভাগ্যে মিলিয়াছে। আর সেই জন্য তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার সঙ্গীরা মনুষ্য, মনুষ্যের মত আকার প্রকার এবং সেইরূপ কথাবার্ত্তা, তখন ভাবিলেন, ইনি একজন উচ্চ, শ্রেণীর সন্ন্যাসী,—দেবতা নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চেতনা পাইলে তাঁহার শরীরের তেজ লুকাইল, আর তখন তিনিও মনুষ্যের মত হইলেন। তাহার পরে তিনি স্নান করিয়া গরুড়পক্ষীর ন্যায় সার্ব্বভৌমের সম্মুখে বসিয়া মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করিলেন, ও অতি দীনভাবে কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সার্ব্বভৌমের চমক অনেকটা ভাঙ্গিল। আবার গোপীনাথের নিকট প্রভুর যে পরিচয় শুনিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিলেন

ইনি দেবতা বা কোন বিশেষ বস্তু নয়,—নদীয়ার একজন সামান্ত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, তাঁহার পুত্র। কাজেই প্রভুর উপর অতি বৃহৎ বস্তু বলিয়া প্রথমে যে ভক্তিটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা প্রায় গেল। সুতরাং প্রভুর নিকট আসিয়া যখন তাঁহাকে আবার প্রণাম করিলেন, তখন ভাবিলেন, সন্ন্যাস-আশ্রমে আশ্রয় করিলে দম্ভের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ তখন গুরুজনও তাঁহাকে প্রণাম করেন, আর তিনিও গুরুজনকে আশীর্ব্বাদ করিতে অধিকার পান। কিন্তু সার্ব্বভৌমের মনে প্রথমে যে কিছু কুভাবের উদয় হইতেছিল, প্রভুর বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া তাহা একেবারে গেল। তখন তাঁহার প্রতি ভক্তি হইল না বটে, তবে ঈর্ষা-ভাবের যে অঙ্কুর হইতেছিল, তাহার স্থানে বাৎসল্যরূপ ভালবাসার উদয় হইল। তখন তিনি প্রভুকে বলিলেন, "তুমি আর একাকী মন্দিরের মধ্যে যাইয়া দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি, আমার সহিত, কি আমি যে লোক দিব তাহার সহিত যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিও।" সার্ব্বভৌম তাহার পর গোপীনাথকে বলিলেন, "আমার মাসীর বাড়ী অতি নির্জ্জন স্থান, সেখানে ইঁহাদের বাসা দাও।" আর জলপাত্র প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দাও।" প্রভু ও প্রভুর গণ সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন হয় সার্ব্বভৌম প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, নচেৎ গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভিক্ষা করেন।

এ গ্রন্থের প্রথমে লেখা আছে যে গৌরাঙ্গলীলা বিচার করিলে, স্বভাবতঃ এইটিই বোধ হইবে যে, এ কাণ্ড হঠাৎ বা আপনা-আপনি হয় নাই; হয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান্; আর যদি ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে বুঝিবেন যে তিনি শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষরূপে চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার একটা মানিলেই যথেষ্ট। দেখুন, যখন গৌরাঙ্গ নীলাচল

যাইতেছেন, তখন যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের স্থান ঠিক সেখানে, সেই সময়ে, রাজা রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া উপস্থিত! আবার নীলাচলের নিকটে আসিয়া, দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া, প্রভু অগ্রে একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রভুর নীলাচল প্রবেশের অদ্ভুত আয়োজন দেখুন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেহ রোধ করিতে পারিল না। সকলে একত্রে গমন করিলে ইহা হইত না। আবার প্রভু যেখানে মূর্চ্ছিত হইলেন, সেখানে সার্ব্বভৌম দাঁড়াইয়া! তিনি না থাকিলে, জগন্নাথের দাম্ভিক সেবকগণ, প্রভুর অঙ্গে প্রহার করিত। তাহার পর সার্ব্বভৌমই বা এত বিচলিত কেন হইলেন? তিনি ত কিছুই মানেন না। যদি কিছু মানেন তবে সে আপনাকে। একটি সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপনার অঙ্গ দ্বারা আবরণ কেন করেন? কত সহস্র সন্ন্যাসী ত তাঁহার শিষ্য? আবার প্রভুর লীলাকার্য্যের নিমিত্ত সার্ব্বভৌমের সহিত পরিচয়েরও প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্যে শ্রীক্ষেত্রের রাজা, তিনি ব্যতীত সেখানে কিছুই হয় না। তাই তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া, তাই তিনি, যদিও জগৎপূজ্য, তথাপি আপনার দেহ দিয়া প্রভুকে রক্ষা করিলেন, আর তাই তিনি প্রভুকে আপনি বহিয়া ও জগন্নাথের সেবকগণ দ্বারা বহাইয়া হরিনামের সহিত আপনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এ সমুদায় আপনা-আপনি ও হঠাৎ হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রভু বাসায় আগমন করিলে, গোপীনাথ পরদিবস অতি প্রত্যুষে আসিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইলেন, এবং তার পরে সকলে সার্ব্বভৌমের সভায় আগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রণাম করিলে, প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুর কথা শুনিয়াই সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণের বড় আমোদ বোধ হইল। তাহারা

বলাবলি করিতে লাগিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া বলে কিনা "কৃষ্ণে মতি হউক!" এটা কি পাগল, না মূর্খ? ইহাই বলিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল। সার্ব্বভৌম ইহাতে লজ্জা পাইয়া প্রভুকে অন্য নির্জ্জন স্থানে লইয়া বসিলেন! প্রভুর কথাতে পড়ুয়াগণ যে হাস্য করিল, তিনি ইহা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানিতেও পারিল না। নির্জ্জন স্থানে বসিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আপনি জগতের উপদেষ্টা, আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। আমাকে আপনি উপদেশ করুন; দেখিবেন, যেন আমি ভবকূপে না পড়ি!" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যে ভক্তি তোমার হয়েছে ইহা মনুষ্যের পক্ষে দুর্লভ। তবে সরলভাবে তোমাকে একটা কথা বলি; সন্ন্যাস করিয়া তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়স অতি অল্প, এ বয়সে সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। প্রথমে সংসার-সুখ সমুদায় আস্বাদন করিয়া যখন ইন্দ্রিয়ের তেজ শিথিল হয়, তখনি সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। আবার দেখ,—সন্ন্যাস করিয়াছ ইহাতে গুরুজনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না?"

প্রভু বলিলেন, "আপনি আমার পরম-সুহৃৎ, আমার যাহাতে ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন। তবে, যখন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করি, তখন কৃষ্ণের জন্য আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং এ কার্য্যের জন্য আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।" এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "তাহা হউক, তুমি অতি ভাগ্যবান। তোমার যে প্রেম দেখিলাম, ইহাতে তোমার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে।

তোমার ভালই হইবে।" সার্ব্বভৌম, 'আমি তোমার ভাল করিব' না বলিয়া, 'তোমার ভালই হইবে' বলিলেন। কিছুকাল আলাপের পর প্রভু ভক্তগণসহ উঠিয়া গেলেন, কেবল গোপীনাথ ও মুকুন্দ রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বড় প্রীতি। তারপর তাঁহারা সার্ব্বভৌমের সঙ্গে সভায় ফিরিয়া আসিলেন।

আপনারা জানিবেন যে জগতে যত বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহার অধিকাংশই অনুগত জনের দোষে। দুটি নায়কের এক স্থানে নির্ব্বিবাদে বাস করা সম্ভব, কিন্তু তাঁহাদের গোঁড়াগণ তাহা পারিবে না! সার্ব্বভৌমের পড়ুয়াগণ তাঁহাকে প্রায় শ্রীভগবান্ বলিয়া মান্য করে। তাহারা বিদ্যাকে পূজা করিয়া থাকে, আর সার্ব্বভৌম বিদ্বান্ লোকের পরমপূজ্য। আবার প্রভুর যত গণ, তাঁহারা প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্মান ও পূজা করেন। কিন্তু সার্ব্বভৌমের পড়ুয়াগণ প্রভুকে খ্যাপা কি মূর্খ সন্ন্যাসী ভাবে। প্রভুগণ আবার সার্ব্বভৌমকে পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ড ভাবেন। সার্ব্বভৌমকে দেখিলে তাঁহার শিষ্যগণ জড়সড় হন, কিন্তু প্রভুর গণ সেরূপ কিছু হয়েন না। আবার প্রভুকে দেখিলে তাঁহার গণ সংজ্ঞাশূন্য হয়েন, কিন্তু সার্ব্বভৌমের প্রতি তাঁহারা দৃকপাতও করেন না। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর কি। এতক্ষণ যে হয় নাই সে কেবল প্রভু নিতান্ত নিরীহ, সার্ব্বভৌম বড় পদস্থ ও গম্ভীর বলিয়া।

প্রভু উঠিয়া গেলে, সার্ব্বভৌম মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামী কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন?" মুকুন্দ বলিলেন, "ভারতী সম্প্রদায়ে। ইঁহার গুরুর নাম কেশব ভারতী, আর ইঁহার নিজের নাম কৃষ্ণচৈতন্য।" সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, নামটি বেশ হয়েছে। আহা সন্ন্যাসীর প্রকৃতি কি মধুর! একেবারে বিনয়ের খনি। বলিতে কি ইঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় তরল হয়েছে। কি জন্য জানি না,

উঁহার প্রতি আমার বড় আকর্ষণ হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছি যে, ভারতী সম্প্রদায়টা ভাল নয়। গিরি, পুরী, তীর্থ, সরস্বতী,—এ সমুদায় সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলেন?” তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য্য! স্বামীর বাহ্যাপেক্ষা নাই। সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাহা যেন তেন প্রকারে করিয়াছেন।”

সার্ব্বভৌম। বাহ্যাপেক্ষা কাহাকে বল?

গোপীনাথ। এ সম্প্রদায় ভাল, ও সম্প্রদায় মন্দ, এ সমস্ত অসার বিষয়ে স্বামীর মন নাই; কোন প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ বিচার করিবার অবকাশ পান নাই।

সার্ব্বভৌম। তুমি ভাল বলিলে না। যখন সম্প্রদায় আশ্রয় করিতে হইবে, তখন বাছিয়া ভাল লওয়াই ত কর্ত্তব্য।

গোপীনাথ। এ সমুদায় মনের ভাব দম্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনাকে পোষণ না করাই ভাল।

সার্ব্বভৌম। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনার দোষ কি? তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া আছি কেন? গৌরব করিবে বলিয়াই ত লোকে এ সকল কার্য্য করিয়া থাকে? যাক্ ও সমুদায় বালকের কথা ছাড়িয়া দাও। স্বামীকে হঠাৎ কোন অনুরোধ করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমরা তাহাকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য কর। আমি একটি ভাল দেখিয়া ভিক্ষুক আনাইয়া পুনরায় তাহার সংস্কার করাইব।

এই সমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের হৃদয়ে শেলের মত বাজিতেছে। প্রথমত সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া হাসিল; ইহাতে তোমার আমার মর্ম্মান্তিক হয়, তাঁহাদের কি হইল

ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা ভাবিলেন, যেমন গুরু, শিষ্যগুলিও সেইরূপ হয়েছে। তাহার পর, সার্ব্বভৌমের প্রত্যেক কথায় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুকে তাঁহারা শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন; তাঁহার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ ভক্তেরা কিরূপে সহ্য করিবেন? যদিও প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের স্নেহ অকৃত্রিম, কিন্তু সে তাঁহার নিজের গুণে নয়, প্রভুর প্রকৃতির গুণে। সার্ব্বভৌম প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে অবকাশ পাইতেছেন না। একটু ঈর্ষার অঙ্কুর হইতেছে, আর প্রভুর সরল বদন দেখিয়া, ও চিত্তমোহন বাক্য শুনিয়া, শুধু যে তাঁহার সেই ঈর্ষা অন্তর্হিত হইতেছে তাহা নয়, এরূপ কুপ্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন বলিয়া মনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। তবে গোপীনাথের দন্তের সহিত কথা, সার্ব্বভৌমের অবশ্য ভাল লাগিতেছে না। জগতে এরূপ কথা কাহারও নিকট শ্রবণ করা তাঁহার অভ্যাস নাই। তবে যে অনেক সহিয়া রহিয়াছেন, সে কেবল প্রভুর গুণে। তাহা না হইলে গোপীনাথ আরও রূঢ়বাক্য শুনিতেন। তবুও গোপীনাথের কথায় সার্ব্বভৌমের ক্রোধ হইতেছে, ও তাঁহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন। গোপীনাথকে আঘাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। তবে প্রভুকে আঘাত করিয়া অনায়াসে তাঁহাকে ব্যথা দিতে পারেন। তাই সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "আহা! কি সুন্দর এই সন্ন্যাসীটি। কিন্তু ইঁহার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে? আমি ইঁহাকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইয়া যাহাতে ইঁহার ধর্ম্ম থাকে, তাহাই করিব।"

গোপীনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাহ্য হারাইলেন। তিনি প্রভুর আগমন অবধি প্রাণপণে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা উঠান নাই উঠাইতে দেনও নাই। সেই তিনি, সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে, আর

সার্ব্বভৌমের সভায় শিষ্যগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "ওখানে পাণ্ডিত্য চলিবে না। তুমি যাহার ভাল করিবে বলিয়া বারম্বার ঔদার্য্য দেখাইতেছ, তিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্।"

যেমন কোন নির্জ্জন সরোবরে বন্দুকের শব্দ করিলে বিবিধ পক্ষী বিবিধ স্বর করিয়া উড়িতে থাকে, সেইরূপ গোপীনাথের বাক্যে সার্ব্বভৌমের সভায় নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া ও অন্যান্য কারণে হঠাৎ কিছু বলিলেন না। আবার একটু ঠাহরিয়া বলেন, তাহার অবকাশও পাইলেন না। কারণ তাঁহার শিষ্যগণ চারিদিক হইতে "কি প্রমাণ?" বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপীনাথ তখনি বুঝিলেন কাজ ভাল করেন নাই কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আপনি বিচলিত হইয়া যে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার উপায় হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তবে শিষ্যগণের সহিত মারামারি করিবেন না। ইহা তখনই স্থির করিলেন। শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিলেন না। সার্ব্বভৌমের পানে চাহিয়াই উত্তর করিলেন।

সার্ব্বভৌমও দেখিলেন যে, কাজ ভাল হয় নাই। নবীন-সন্ন্যাসীটি তাঁহার প্রিয়বস্তু, বাড়ীতে অতিথি ও নির্দ্দোষী। তাঁহাকে লইয়া যে তাঁহার শিষ্যগণ চর্চ্চা করিবে, ইহা তাঁহার অভিমত হইতে পারে না। আর তিনি সেখানে থাকিতে শিষ্যগণ বিচার করিবে, তাহাও হইতে পারে না। তাহার পরে গোপীনাথ তাঁহার ভগিনীপতি; তাঁহার ভগিনীপতির সহিত যে তাঁহার শিষ্যগণ সমান হইয়া বিচার করিবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি, শিষ্যগণকে লক্ষ্য না করিয়া গোপীনাথের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। গোপীনাথের

উচিত ছিল যে, তখনি সার্ব্বভৌমের নিকট ক্ষমা চাহিয়া চুপ করা। তিনি তাহাই করিতেন; কিন্তু তিনি তখন একটু বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ঐ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ইহা লইয়া তোমার সহিত বিচার করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবে ভট্টাচার্য্য, তুমি উহার মহিমা জান না তাই বলিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে যে, ও বস্তুটি কি।" কিন্তু শিষ্যগণ চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সার্ব্বভৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া, "কি প্রমাণ?" "কি প্রমাণ?" বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল। গোপীনাথ তখনও চুপ করিতে পারিতেন, কিন্তু চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হওয়ায় তাহা পারিলেন না। সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া শিষ্যগণের কথার উত্তরে বলিলেন, "প্রমাণ এই যে, তাঁহাতে শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। শিষ্যগণ আবার সার্ব্বভৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই সন্ন্যাসী শ্রীভগবান্, কি অনুমানে সাধিবে?" গোপীনাথ আবার সেইরূপে সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুমানে জ্ঞান হয় না। ইহা জানিবার এক মাত্র উপায় ঈশ্বর-কৃপা।" তাহার পর শিষ্যগণকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! পৃথিবীতে তোমার মত পণ্ডিত নাই, তুমি জগতের গুরু. শাস্ত্রে তোমার দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তুমি যে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর-জ্ঞান সে বলের অধীন নয়। যেহেতু তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা নাই।"

সার্ব্বভৌম নৈয়ায়িক। গোপীনাথের তর্ক করিতে ভুল হইল, তিনি কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন? অমনি বলিতেছেন, "তোমাতে যে ঈশ্বর-কৃপা আছে তাহার প্রমাণ? গোপীনাথ তখন ঠকিলেন, এবং কতক কান্দ-কান্দ হইয়া, কতক কোপের সহিত বলিলেন, "তুমি স্বচক্ষে

যাহা দেখিয়াছ তাহাতেও প্রভুকে চিনিতে পারিলে না, কাজেই বলি যে তোমাতে ঈশ্বর-কৃপার লেশ মাত্র নাই।”

সার্ব্বভৌম গোপীনাথের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইলেন। কুলীন ভগিনীপতি, উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন। যদি কোপ করিয়া চলিয়া যান, তাই গোপীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, “ভাই, ক্রোধ করিও না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে বলি। শাস্ত্রে কলিযুগে অবতারের উল্লেখ নাই! তাই শ্রীভগবানের নাম ত্রিযুগ হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, সন্ন্যাসীটি পরম ভাগবত, কিন্তু তিনি যে ভগবান্ এ কথা শাস্ত্রে পাই না।”

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েছেন, শ্রীনবদ্বীপে এ কথা প্রথমে উঠিলেই বিপক্ষ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহাই বলিতে লাগিলেন। কাজেই গৌরভক্তগণ দেখিলেন যে, সাধারণ লোকের নিকট গৌর-অবতার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন। তাই গৌরভক্ত পণ্ডিতগণ, অন্বেষণ করিয়া নানা প্রমাণ বাহির করিলেন। যখন শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসী হইবেন তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সেই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ মহাভারত হইতে বাহির করিতেও ভক্তগণ বাধ্য হইলেন। তখন পণ্ডিতগণ ন্যায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যে কোন কথা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিতেন। সুবিধার মধ্যে শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাজেই প্রমাণেরও অবধি ছিল না। অতএব শাস্ত্রের এত বড় শাসন সত্ত্বেও লোকের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে বড় বাধা হইত না। ন্যায়ের চর্চ্চাতে আবার সেইরূপ লোকের “কি প্রমাণ?” ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রভাতে এক পড়ুয়া আর এক

পড়ুয়াকে বলিতেছেন, "উঠ, প্রভাত হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া চক্ষু মেলিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাত হইয়াছে তাহার প্রমাণ?" জাগরিত পড়ুয়া বলিলেন, "যেহেতু আলো হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া বলিলেন, "আলো হইলেই প্রভাত হয় না, গৃহ-দাহ হইলেও রজনীযোগে আলো হয়।" এইরূপে দুই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত বিচার হইল। শেষে ক্লান্ত হইয়া উভয়ে ক্ষান্ত দিলেন।

এখন বিচার করুন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যখন কথা উঠিল যে, নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহার পূর্ব্বে অবতার বলিয়া কথা আদৌ জগতে ছিল না। এখন অবতারে বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, কিন্তু তখন শ্রীভগবান্ মনুষ্যসমাজে আসিয়াছেন, এরূপ কথা শুনিলে স্বভাবতঃ সর্ব্বদেশে, সকল স্থানে হাসি পাইবার কথা ছিল। কিন্তু গৌর-অবতারের কথা যখন ও যে স্থানে উঠিল, সে সময়ের ও সে স্থানের অবস্থা মনে করুন। সে সময়ে সে স্থানে প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ইহাও ভদ্রলোকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং বিবেচনা করুন যে, এইরূপ সময়ে ও সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবের নিকট শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্মান লইতে, কত শক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন, ইহা মুখে নয়, একেবারে হৃদয়ের সহিত। তাহা না হইলে, যে সমুদায় মহান্তগণ পরকালের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হয়েছেন, তাঁহারা হিন্দু হইয়া তাঁহার শ্রীপদে তুলসী, চন্দন ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে পারিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কি কিঞ্চিন্মাত্র অবিশ্বাস থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করা অসম্ভব হইত।

সেই সময়ের ও সেই সমাজের কথা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে কিছু

আলোচনা করিয়াছি এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম বস্তু কি তাহাও কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যতীত, প্রভাত হইয়াছে কি না, লোকে ইহা গ্রহণ করিত না, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি এই সমাজের দুগ্ধফেণ, কি প্রকাশ, কি শক্তি। তাঁহার সহিত শ্রীপ্রভুর রঙ্গ অতএব অতিশয় রহস্যজনক। বিশেষতঃ পাঠকমহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সতেজ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা আপনাদের ও সার্ব্বভৌমের মনের ভাবের অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন, সেই জন্য আমি ঐ সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিয়া লিখিলাম।

শ্রীগোপীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি পণ্ডিত-শিরোমণি হইয়া কিরূপে বলিতেছ যে কলিযুগে অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই। তবে এ সমুদায় শ্লোকের অর্থ কি ?" ইহাই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ, প্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তখন সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদায় শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ নীরস বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। প্রথমতঃ আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়তঃ গোপীনাথ যাহা সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস না করাই ভাল। গোপানাথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিতে থাকিলে, সার্ব্বভৌম তাঁহার প্রতিপক্ষ করিতে পারিতেন; করিলেও হয়ত তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু সার্ব্বভৌম অনেক কারণে সহিয়া গেলেন, আর তর্ক উঠাইলেন না। বলিলেন, "ও সমুদয় এখন থাকুক। তুমি এখন তোমার শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার গণসহ আমার হইয়া নিমন্ত্রণ কর গিয়া। তবে আমাকে শিক্ষা দেওয়া, তাহা পরে দিলেই পারিবে।"

এইরূপ কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম সমুদয় মনের বেগ ব্যক্ত করিলেন।

প্রথমতঃ তোমার শ্রীভগবান্‌কে গণসহ নিমন্ত্রণ কর, ইহা হাসিবার কথা। শ্রীভগবানের আবার "গণ" কে? আর তাঁহাকে মনুষ্যে নিমন্ত্রণ করিবে তাহাই বা কি? আবার সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে উপরের কথাগুলিতে ইহাও বলিলেন যে, শ্রীভগবান্‌কে নিমন্ত্রণ করা, ইহাও যেরূপ হাস্যকর, তুমি গোপীনাথ আর আমি সার্ব্বভৌম, তোমার আমাকে শিক্ষা দিতে আসা, সেও সেইরূপ হাস্যকর। এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের সভা ত্যাগ করিয়া প্রভুর ওখানে চলিলেন। এখন সার্ব্বভৌমের অবস্থা শ্রবণ করুন। তিনি দিগ্বিজয়,—জয় করা তাঁহার ব্যবসায়, পরমার্থ ও আনন্দ। এইরূপে অন্যকে জয় করিয়া তাঁহার কয়েকটি প্রবৃত্তি বড় প্রবল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্যের উপর আধিপত্য করা একটি প্রধান। তিনি যেখানেই থাকুন, কর্ত্তা হইয়া থাকিবেন। এরূপ না হইলে তাঁহার সে স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা হইত না। এ অবস্থার বিপরীতও কখন হয় নাই, কারণ তাঁহার সমকক্ষ লোক তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। কাজেই তাঁহার কোথাও থাকিতে অসুবিধা হয় নাই। এখন তাঁহার নিজ স্থানে, এমন কি তাঁহার নিজ ভবনে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু নয়, তাঁহার বড়, স্বয়ং ভগবানের ন্যায় পূজিত। সার্ব্বভৌমের এ অবস্থা ভাল লাগিতেছে না। আবার নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা-ভাব যে অতি গর্হনীয় কার্য্য তাহাও বুঝিতেছেন। কাজেই তখনি আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন এবং এই ঈর্ষা-ভাব আপনার মনের নিকট আপনি গোপন করিতেছেন; আর ভাবিতেছেন, "জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উপর আমার ঈর্ষা, তাহা হইতেই পারে না। তাহার উপর মাঝে মাঝে একটু ক্রোধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমারও দোষ নাই, তাহারও দোষ নাই,—সে দোষ তাহার গোঁড়াগণের। তাহারা বলে কি না,—

তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্! এ কথা শুনিলে সহজেই একটা বিরক্তিভাব হয়; কিন্তু এ সামান্য কথা লইয়া আমার মত লোকের চিত্তচাঞ্চল্য ভাল দেখায় না! অবশ্য আমার চিত্তের চাঞ্চল্য হয় নাই, সন্ন্যাসীর উপর কোন প্রকার ঈর্ষাও নাই। তবে সন্ন্যাসীটি অপরূপ বস্তু, আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমিও বলিয়াছি যে, তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিব। এখন পাঁচজন মূর্খেতে যদি তাহাকে "ভগবান্" বলিয়া পূজা করিতে থাকে, তবে তাহার চিত্ত আর কতদিন স্থির থাকিবে?—এ অপরূপ বস্তুটি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব এই সন্ন্যাসীকে কেহ ভগবান্ না বলে তাহার উপায় করিতে হইবে। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে, সন্ন্যাসীকে ভগবান্ বলে, তাহাতে তাহাদেরই বা লাভ কি? শাস্ত্রে দেখি যে, জীবকে শ্রীভগবান্-বুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব গোপীনাথ প্রভৃতি তাঁহাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে. এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি তাহাও করিতে দিব না। গোঁড়াগণ যে সন্ন্যাসীকে শ্রীভগবান্ বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহা হইলে সন্ন্যাসীরও ভাল, তাহার অনুগতগণেরও ভাল, আর আমারও কর্ত্তব্য করা হয়,—যেহেতু ইহারা সকলেই আমার আশ্রিত। অতএব এ সন্ন্যাসীটি ভগবান্ এ কথাটি আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। এই সমুদায় ভাবিয়া সার্ব্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ষা নাই, আর তিনি যে সন্ন্যাসীর ভগবত্তা উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে নহে। কিন্তু সরল কথায় বলিতে, তিনি যে সন্ন্যাসীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, তিনি সন্ন্যাসীর আধিপত্য সহিতে পারিতেছেন না। সার্ব্বভৌম সেই জন্য সন্ন্যাসীর ভগবত্তা কিরূপে উড়াইয়া দিবেন তাহার উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। সে উপায় কি, পরে বলিতেছি।

এ দিকে মুকুন্দ ও গোপীনাথ প্রভুর ওখানে আসিলেন। পরে গোপীনাথ সার্ব্বভৌম-প্রেরিত অতি অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ প্রভুকে ও ভক্তগণকে ভুঞ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রভু ও ভক্তগণ বসিলেন। তখন গোপীনাথ করজোড়ে প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু ভট্টাচার্য্য আর এক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও আপনার নামটি ভাল, কিন্তু আপনার সম্প্রদায় ভাল নয়। অতএব তিনি ভাল একজন ভিক্ষুক আনাইয়া আপনার পুনঃসংস্কার করাইবেন। তাঁহার বড় ভয় হইয়াছিল যে, আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও ধর্ম্ম থাকিবে। তাহার উপায়ও তিনি ঠাহুরিয়াছেন। তিনি আপনাকে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন ও স্বয়ং ক্লেশ করিয়া নিয়ত আপনাকে বেদ শ্রবণ করাইবেন।"

গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরূপ ভাবে বলিলেন, যাহা শুনিয়া প্রভুর রাগ হয়। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না,—প্রভুর মুখে বিরক্তি কি কোন মন্দ ভাবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। বরং এ কথা শুনিয়া প্রভু যেন বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "বটে বটে, তাঁহার উপযুক্ত কথাই হয়েছে। তাঁহার আমার উপর বাৎসল্য-ভাব ও বিস্তর অনুগ্রহ; তিনি আমার মঙ্গল সর্ব্বদা কামনা করিতেছেন। আমি এ কথা শুনিয়া বড়ই কৃতার্থ হইলাম।"

কিন্তু ভক্তগণের কাহারও এ কথা ভাল লাগিল না। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, প্রভু ভট্টাচার্য্যের দম্ভের কথা শুনিয়া অন্ততঃ মনে মনে ক্রোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহার মুখে, কি কথায়, ক্রোধের লেশমাত্র উপলক্ষিত হইল না। বরং তিনি যেন সার্ব্বভৌমের উপর বড় খুসী। কাজেই ভক্তগণের তখন প্রভুকে বুঝাইয়া, যাহাতে সার্ব্বভৌমের উপর তাঁহার রাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ

বলিতেছেন, "তুমি ভট্টাচার্য্যের এ সমুদায় অভিপ্রায় বিষম অনুগ্রহ ভাবিতে পার, কিন্তু তাহার কথা সমুদায় তোমার ভক্তগণের গাত্রে অগ্নিকণার ন্যায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় দুঃখ পাইয়াছেন, যেহেতু ভট্টাচার্য্য তাঁহার কুটুম্ব। এমন কি, গোপীনাথ দুঃখে অদ্য উপবাসী আছেন।" এ কথা শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোপীনাথের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া বলিতেছেন, "গোপীনাথ, সে কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয়, স্নেহ ও বাৎসল্যে, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তিনি যেরূপ বুঝেন, সেইরূপ বলিয়াছেন; তাহাতে তুমি দুঃখ পাও কেন? গোপীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; বলিতেছেন, "সার্ব্বভৌম আমার কুটুম্ব। তিনি তোমাকে কথায় কথায় অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন, আমি ইহা কিরূপে সহ্য করিব? যথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে—

"গোপীনাথ কহে পুন সজল নয়ন। ভট্টাচার্য্য বাক্য হৈল শেলের সমান॥
মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ। সেই শেল তুমি প্রভু উদ্ধারো আপন॥
তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ॥"

গোপীনাথের প্রার্থনা অতি অল্প,—নয় কি? জগতের যে সর্ব্ব-প্রধান নৈয়ায়িক, প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল খাইবেন, প্রাণ রাখিবেন, নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। শ্রীভগবানের সংসারই এইরূপ অবুঝ-ভক্ত লইয়া, তাহাদের কথা না শুনিলে তাঁহার সংসার থাকে না। কাজেই তিনি আর করেন কি? দামোদরকে বলিতেছেন, "তুমি গোপীনাথকে লইয়া গিয়া প্রসাদ গ্রহণ করাও।" তাহার পরে গোপীনাথের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিলেন, শেষে বলিলেন, "তুমি ভক্ত, আর শ্রীজগন্নাথ বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি অবশ্য তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাও এখন প্রসাদ গ্রহণ কর গিয়া।" প্রভুর এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

তাঁহারা জানেন প্রভুর শক্তির সীমা নাই, ও তাঁহার বাক্য অখণ্ডনীয়। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, সার্ব্বভৌমের সৌভাগ্যচন্দ্র উদয় হইতে আর বিলম্ব নাই। গোপীনাথ অমনি আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাহিলেন।

এখন শ্রীনবীন-সন্ন্যাসী ও সার্ব্বভৌম, এই দুই জনের দুই কথা মনে করুন। উভয়েই শক্তিধর পুরুষ, উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন সঙ্কল্প করিলেন। যুদ্ধটিতে বিশেষ রস আছে। যখন দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ হয়, তখন সাধারণ লোকে জ্ঞানহারা হইয়া তাহা দাঁড়াইয়া দেখে।

পাঠক মহাশয়, তোমার নিকট আমার একটি প্রশ্ন আছে; বল দেখি—গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়া ভাল? যদি বল শিষ্য হওয়া ভাল, কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাহিবে,—শিষ্য হইতে কেহই চাহে না। এখন গুরু ও শিষ্য উভয়ের কার্য্য দেখ। গুরু দান করেন, আর শিষ্য গ্রহণ করেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, শিষ্যেরই সমুদায় লাভ। এমত স্থলেও দেখিবে সকলেই গুরু হইবার বাসনা করিতেছে। মনে কর, দুই জনে দেখা হইল। একজন বলিলেন, তুমি আমার নিকট শিক্ষা কর। অন্য জনও বলিলেন, তাহা কেন, তুমি আমার নিকট শিক্ষা কর। এমত স্থলে, যে সুবোধ সে শিখাইতে না গিয়া নিজে শিখিতে স্বীকার করে। কারণ, তাহার যাহা আছে তাহা ত আছেই, আরও যদি কিছু নূতন শিখিতে পায়, তাহা ছাড়িবে কেন? কিন্তু এই যে, "আমি গুরু হইব, অন্যকে শিক্ষা দিব, অন্যের নিকট শিখিব না,"—এই কুপ্রবৃত্তিতে জগতের জীব নষ্ট হইল। যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও, তবে দীন হইয়া আঁচল পাত। যে মাত্র আঁচল পাতিতে শিখিবে, সেই তোমার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হইবে। বিবেচনা করিতে গেলে, তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই। এক মুহূর্ত্ত পরে তোমার

কি দশা হইবে, তাহা তুমি বলিতে পার না। ত্রিতলে থাকিয়া, সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াও যখন তোমার নিশ্চিন্ততা নাই, তখন তোমার অভিমান কেন আসে? শ্রীভগবান তাই জীবকে আঁচল পাতিবার অধিকার দিয়াছেন; আঁচল পাতিলেই, সরল মনে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এই আঁচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দম্ভ ও অভিমান। "আমি উহার নিকট কেন খর্ব্ব হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিব?—এই প্রকার প্রায় জীব-মাত্রেরই মনের ভাব। জীবগণ অন্যকে আপন পদতলে আনিবে, অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাইবার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। "আমি গুরু হইব, ও ব্যক্তি আমার পদতলে পতিত হইবে,"—এই সামান্য সুখের জন্য জীব অনায়াসে পরম লাভ ত্যাগ করিতেছে।

সার্ব্বভৌম যখন নবীন-সন্ন্যাসীর মহাভাব প্রথম দেখিলেন, তখন এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে নিজ-গৃহে আনয়ন করিলেন। তারপর ভাবিলেন, ত্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তিই ভাগ্যবান। তখন আপনার বিদ্যাবুদ্ধি অতি নিষ্ফল ধন বলিয়া বোধ হইল। তাহার যে বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাহা আর যাইবে না; কিন্তু নবীন-সন্ন্যাসীর কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ যে ভাব, তাহা তাঁহার নাই, এবং উহা যে পরম-ধন তাহাতেও সন্দেহ নাই। সেরূপ বোধ না হইলে তিনি তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়া বাড়ী আনিতেন না। এরূপ অবস্থায় সার্ব্বভৌমের কর্ত্তব্য ছিল যে, কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ মহাভাব, যাহা তাঁহার নাই, তাহাই যদি পারেন আদায় করুন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি সে দিকে গেল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লইবেন না, তিনি তাঁহার নাস্তিকতারূপ ছাইভস্ম প্রভুকে দিবেন। কেন? কারণ দিলে তিনি গুরু হইবেন, আর আধিপত্যের সুখভোগী হইবেন। এই অতি তুচ্ছ কুপ্রবৃত্তির তৃপ্তির নিমিত্ত তিনি পরম-ধন

অবহেলায় ছাড়িলেন। তাই বলি, গুরু হইবার এই লোভে জীব ছারেখারে যাইতেছে।

এই যে পুরুষ-ভাব, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের পক্ষে একেবারে বিষ। তাঁহার দাসেরা বলেন যে, ত্রিজগতে 'পুরুষ' কেবল একজন, তিনি—কানাইলাল ; আর সকলেই 'প্রকৃতি'। সুতরাং আর সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা পুরুষ হইতে চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। অতএব প্রকৃতির যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর,—ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার-কথা। তুমি প্রকৃতি হও, আর তুমি যে পুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়া দাও। পুরুষ এ অভিমান করিলে তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইতে পারিবে না।

সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য কামনা করেন। ঐশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান সম্পত্তি যে ত্রিজগতে আছে, তাহা তিনি জানেনই না। তিনি আপনি বড় হইয়া অন্যের মস্তকে পদ দিবেন, এই তাঁর চরম-আশা। কাজেই তিনি প্রভুকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয় আপনি যদি বৃদ্ধি পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন। আমি এ সম্বন্ধে প্রভুর আজ্ঞা বলিতেছি। তাঁহার শ্রীমুখের শ্লোক শ্রবণ করুন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন,—"সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্ত্তনে অধিকার পায় যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন-ভাব ধরিয়া অন্যকে মান দেয়।" অতএব পাঠক, জীব মাত্রকেই গুরু ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিও। কারণ এমন জীব নাই, যার কাছে তুমি কিছু-না-কিছু শিখতে না পার! আপনি নীচ হইয়া অন্যকে মান দিলে তোমার অনেক লাভ হইবে। প্রথমতঃ তোমার মন কোমল হইবে। দ্বিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে সুখ পাইবে, ও অন্যের হৃদয়ে সুখ দিবে; তৃতীয়তঃ তুমি ক্রমে শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে!

আর চতুর্থতঃ তুমি কি শুন নাই যে, তিনি "দীনদয়ার্দ্র-নাথ", অর্থাৎ দীনজন-দর্শনে শ্রীভগবানের পদ্ম-চক্ষু করুণার জলে ডুবিয়া যায়?

তবে কি অন্যকে শিক্ষা দিবে না? তুমি দীনভাব অবলম্বনে যেরূপ শিক্ষা দিতে পারিবে, গুরুভাবে তাহা পারিবে না। প্রতিষ্ঠা-লোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিলে তাহার ফল সদ্য উদয় হইবে। এখন, বিনয়ের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, ও দম্ভের পর্ব্বত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংঘর্ষণে কি ফলোৎপত্তি হইল শ্রবণ করুন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন, তাঁহার এই সংকল্প। তাঁহার এই কার্য্যের সহায় এই কয়েকটি উপকরণ, যথা—অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্র-বিদ্যা, শীর্ষস্থানীয় পদ-মর্য্যাদা ও তীব্র শাসন-বাক্য। সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর দেখা হইল, দুই জনে নিভৃতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ আপনার নিস্বার্থতা প্রমাণ করিলেন। বলিলেন, "স্বামিন্! তুমি আমার এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয় ও পরম গুণে ভূষিত। তোমাতে সহজে আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে গুটি কয়েক কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য বিচার করিয়া তুমি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবে।

এ স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। সার্ব্বভৌম যতই দাম্ভিক ও পদস্থ হউন, প্রভুর নিকট আসিলেই একটু নম্র হইতে বাধ্য হন। কেন, তাহা বুঝিতে পারেন না; তবে ইহা বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষে তাঁহার যতখানি সাহস, প্রভুর নিকট আসিলে ততখানি থাকে না।

সার্ব্বভৌম এক ঠাকুরকে উপাসনা করেন,—সে বিদ্যাবুদ্ধি। প্রভুর কতদূর বিদ্যা ও কতটুকু বুদ্ধি তাহা জানেন না। তবু তাঁহার এ বিশ্বাস অটল-রূপে রহিয়াছে যে, বালক-সন্ন্যাসী কোন ক্রমে তাহার সমকক্ষ হইবেন না। কিন্তু তবু সেই বালক-সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেই একটু

স্তম্ভিত হয়েন, আর চেষ্টা করিয়াও আপনার সেই সহজ স্বচ্ছন্দতা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারেন না। সার্ব্বভৌম সে দিবস সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, আর প্রভুর নিকট নত হইবেন না। সেই নিমিত্ত রুক্ষ কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবে। কিন্তু তোমার সমুদায় কার্য্য যে শাস্ত্র ও ন্যায়সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। তুমি অল্প-বয়সে সন্ন্যাস লইয়া ভাল কর নাই; তবে তোমার যে ভক্তি উদয় হইয়াছে উহা দুর্ল্লভ। কিন্তু যদি ভাবুকের ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে, তবে কেন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্ত্তন-গায়ন অতি দূষ্য-কার্য্য, কিন্তু উহাই হইল তোমার ভজন-সাধন। তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত, নর্ত্তন ও গায়নে কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে?"

শ্রীনিমাই তখন করজোড়ে বলিলেন, "আমি অজ্ঞ বালক, ভাল মন্দ বুঝি না; সেই জন্য আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আমার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনি তাহাই করুন।" সার্ব্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন। প্রভু যদি বলিতেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি অন্ধ, দাম্ভিক ও বৃথা-রস লইয়া আছ। আমার নিকট অমূল্য-ধন আছে, উহা বিনা-বিনিময়ে তোমাকে দিতে আসিয়াছি"; তবে ভট্টাচার্য্য মহা-ক্রুদ্ধ হইতেন। এই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীপ্রভু যে তাহা না বলিয়া, বলিলেন—"তুমি বড়, আমি ছোট," তাই এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য,—যিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান,—একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। হে প্রতিষ্ঠা-লোভ, তোমাকে ধন্য। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি অতি সুপাত্র, তাই তোমার গুণে তোমার প্রতি আমার চিত্ত এইরূপে ধাবিত হইতেছে। তুমি যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লইয়াছ, ইহা ভাবুকের ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইব। সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম বেদ-শ্রবণ। তুমি উহা শ্রবণ কর, ক্রমে তোমার জ্ঞান-স্ফুরিত হইবে, ও ইন্দ্রিয়-দমনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। আমি প্রত্যহ অপরাহ্নে বেদ পাঠ করিয়া তোমাকে শুনাইব।" প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা; আমি প্রত্যহ অপরাহ্নে আসিয়া আপনার নিকট বেদ শ্রবণ করিব।" পর দিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্ব্বভৌম মিলিত হইলেন। সেখান হইতে তুইজনে সার্ব্বভৌমের বাড়ী আসিলেন। তুইজনে নিভৃত স্থানে বিভিন্ন আসনে বসিলেন, এবম সার্ব্বভৌম বেদ পাঠ করিতে ও প্রভু শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল;—তিনি তাঁহার যে স্থান তাহা পাইলেন, পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সেই আসন ত্যাগ না করিলে তাঁহার মঙ্গল নাই। তাঁহার প্রকৃতি-ভাব অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করিতে হইবে, তবে প্রেম কি ভক্তির বীজ পাইবেন। সার্ব্বভৌম বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রভুও মনোনিবেশ-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে নির্ব্বাক হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন,—হাঁ-কি-না কিছুই বলিলেন না। কেবল তাহাও নয় বেদ শ্রবণে তাঁহার মনে কিরূপ ভাব খেলিতেছে, তাহার চিহ্ন-মাত্রও বদনে প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি খেলিতেছে? প্রভুর তখন ভক্তভাব। কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়েন; এই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা। কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কথা আইসে না, কর্ণে তিনি অন্য কথা শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাঁহার অন্য কথার স্থান নাই। কিন্তু সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন; বলিতেছেন যে, "এ সমুদায় মায়া, জগৎ মায়া, ভগবান্ আর কোন পৃথক্ বস্তু নয়, তুমিই ভগবান্।" ইহাতে শ্রীভগবান্ গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগবদ্ভক্তি গেলেন;—এমন কি

পরকাল পর্য্যন্ত গেলেন। রহিলেন কি? না—নাস্তিকতা। কাজেই ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীপ্রভুর হৃদয়ে বিষাক্ত-শরের ন্যায় বিন্ধিতেছে। ইহাতে প্রভু এত বিকল হইতেছেন যে, তাঁহার প্রাণ বাহির হয় আর কি? কিন্তু তিনি শক্তিধর; সমুদায় সহিয়া, নীরব হইয়া, বসিয়া রহিয়াছেন। সার্ব্বভৌমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, বেদ শুনিবেন, তাহাই শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইল, পুস্তকে ডোর দেওয়া হইল। প্রভু বাসায় আসিয়া, তাপিত-হৃদয় শীতল করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে আরত্রিক দর্শন করিতে গমন করিলেন।

সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিলেন, তাঁহার যতদূর সাধ্য। বাসনা, নবীন সন্ন্যাসীটিকে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে চমকিত করিবেন। এক-একবার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির চমক উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, নবীন-সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু তাহা না হওয়াতে সার্ব্বভৌম একটু মনস্তাপ পাইতেছেন। আবার প্রভুর মুখের ভাব ঠাহুরিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন ভাবিলেন, নবীন-সন্ন্যাসীর ধান্দা লাগিয়াছে; দুই এক দিবস ধান্দা ভাঙ্গিতে যাইবে, তখন কথা বলিবেন। দ্বিতীয় দিবসও ঠিক সেইভাবে গেল। সার্ব্বভৌমও দুঃখিত হইয়া পাঠ বন্ধ করিলেন। এইরূপে সাত দিবস গত হইল। সার্ব্বভৌম তখন ধৈর্য্য হারাইয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ ত ভোগ মন্দ নয়? এত পরিশ্রম করিয়া আমি কোন কালে কাহারও নিকট বেদ ব্যাখ্যা করি নাই! কিন্তু ফল কি হইতেছে? সন্ন্যাসীটি একবার আমার নিকট উপকার স্বীকারও করিল না? ভাল, তাই না করুক, একবার ভাল কি মন্দ কিছুই বলিল না? ইহার মানে কি? এটি কি পাগল, না নির্ব্বোধ, না মূর্খ? সত্যই কি এ মূর্খ! আমি যাহা বলিতেছি তাহা বুঝিতেছে না? কিম্বা ইহার কাছে আমার ব্যাখ্যা

ভাল লাগিতেছে না? তাহাই বা বলি কিরূপে? যেরূপ বিনয়ী, লাজুক ও নম্র, ইহার দম্ভ ও অভিমানের লেশমাত্র আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যাহা হউক, কল্য ইহার তথ্য জানিতে হইবে। ইহার তথ্য না জানিয়া আর ব্যাখ্যা করিব না। এদিকে প্রভুও সার্ব্বভৌমের বিষাক্ত বাণ-স্বরূপ ব্যাখ্যায় জরজর হইয়াছেন। তিনি শক্তিধর বলিয়াই সহিয়া আছেন, ত্রিজগতে আর কেহ পারিতেন না।

অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম পুস্তক খুলিয়া বলিতেছেন, "স্বামিন্! এই সপ্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিলাম, কিন্তু তুমি হাঁ-কি-না কিছুই বল না কেন?"

প্রভু। আপনার আজ্ঞা বেদ শ্রবণ করা, তাই করিতেছি।

সার্ব্বভৌম। সে উত্তম, কিন্তু আমি ত শুধু পাঠ করিতেছি না, ব্যাখ্যাও করিতেছি। ব্যাখ্যা তোমার নিমিত্তই করিতেছি। কিন্তু তুমি চুপ করিয়া শুনিতেছ, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছ না।

প্রভু। আমি অজ্ঞ, অধ্যয়ন নাই। আপনি ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম। বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি? তুমি বুঝিতে পারিবে, এই জন্মেই ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাক; বুঝ-না-বুঝ আমি কিরূপে জানিব? যে না বুঝে, সে জিজ্ঞাসা করে। তোমার এ কি ভাব? বুঝ না বলিতেছ, তবে জিজ্ঞাসা কর না কেন?

প্রভু। বেদের সূত্রগুলি পরিষ্কার, তাহা বেশ বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, প্রভু কি বলিতেছেন, সার্ব্বভৌম হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কারণ প্রভু যাহা বলিলেন, সেরূপ কথা তাঁহার

শুনা অভ্যাস নাই। আর ২৪ বৎসর বয়স্ক একটি নিরীহ বালক-সন্ন্যাসীর নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বালক-সন্ন্যাসীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, পণ্ডিত-প্রবর সার্ব্বভৌম ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন! সার্ব্বভৌম উগ্রভাবে বলিলেন, "কি বলিলে? বেদের সূত্র বেশ বুঝিতে পার, কিন্তু আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যায় ভুল যাইতেছে, আর তোমাব মনোমত হইতেছে না?" প্রভু বলিলেন, "শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে, শঙ্করাচার্য্য বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া মনঃকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে মনঃকল্পিত, তাহা বেদের সূত্র ও তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ মাত্র জানা যায়। সূত্রের একরূপ অর্থ, শঙ্করাচার্য্য কল্পনা-বলে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুযায়ী। সে ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার অন্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে। কিন্তু আপনি বেদ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই আপনার আজ্ঞানুসারে শ্রবণ করিতেছি।"

সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, প্রভু তাহার অর্থের ভুল ধরিতেছেন, তাঁহার অর্থ কল্পিত বলিতেছেন। তিনি পুরীতে টোল স্থাপন করিয়া বেদ পড়াইয়া থাকেন। কাশীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদের টোল, শ্রীক্ষেত্রে তেমনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদের টোল। বহুতর পড়ুয়া এখন কাশীতে না যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি, বহুতর দণ্ডী সার্ব্বভৌমের টোলে বেদ পড়িয়া থাকেন। সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শুনিতেছেন কে, না নদে নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, বয়স ২৪ বৎসর, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। আর ব্যাখ্যা করিতেছেন কে, না সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যিনি স্বয়ং

সেই বেদের আকরস্থান কাশীতে যাইয়া সেখানকার সমুদায় বিদ্যাবুদ্ধি শুষিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সেই বালক-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার বাৎসল্য-ভাব। তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, শত সহস্র কার্য্যের মধ্যে, তিনি বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন। সেই বালক এখন বলে কি না,—তোমার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি। তোমার ব্যাখ্যা আমূল কেবল ভুল!" কাজেই সার্ব্বভৌম ধৈর্য্য হারাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, "হুঁ! আবার পাণ্ডিত্যাভিমানও আছে! বাহিরে দীনতা, অন্তরে দেখি অভিমানপূর্ণ! তুমি আমাকে শিখাইবে নাকি? তাই হউক, এখন বৃদ্ধকালে তোমার নিকটেই বেদ শিখিব। তুমি ব্যাখ্যা কর, আমি শ্রবণ করি। দেখি, তুমি কাহার কাছে কিরূপ ব্যাখ্যা শিখিয়াছ।" *

* ভট্টাচার্য্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে। বেদান্ত শুনহ, নাচ কাচ ত্যজ দূরে॥
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত— হয় তাহা কৃপা করি কর যে উচিত॥
মূর্খ মুঞি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান। দয়া করি কর যাহে মোর পরিত্রাণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে। ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যান। সাত দিন করেন প্রভু বসিয়া শ্রবণ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান। মায়াময় বাদ যাহা পাষণ্ডী বিধান॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য। কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ। বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥
প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ। সকলি যে বিপর্য্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান্। অনন্ত স্বরূপ শক্তি যোগমায়া হন॥
জীব মায়াদাস সেবা-সেবক সম্বন্ধ। ইহার অন্যথা কহ এ বড়ই ধন্ধ॥
মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান। লক্ষণ করিয়া সব কহ অবিধান॥
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনর্থ। অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে॥

সার্ব্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কথা বলিতেছেন, প্রভু তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা মায়াবাদ স্থাপন। সেটি যেন তেন প্রকারেণ করিতে হইবে। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী। বেদ বিরোধী হইলে কেহ তাঁহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, তিনি বেদের সূত্রের পরিষ্কার অর্থ ত্যাগ করিয়া, মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। কাজেই সূত্র বুঝিতে যত সহজ, তাঁহার ভাষ্য বুঝা তাহা অপেক্ষা কঠিন। বেদ বলেন যে, "শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাঁহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম-পুরুষার্থ।" প্রভু এই কথা বলিয়াই বেদের সূত্র আওড়াইলেন, ও তাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রথমে ভাবিলেন, তাড়া দিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিবেন। সেইরূপ উদ্যোগও করিলেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই প্রভুর মুখে নূতন কথা শুনিলেন, শুনিয়া একটু আকৃষ্ট হইলেন। তখন প্রভুকে তাড়া না দিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে অবসর দিলেন। ইহাতে আরও ধান্দায় পড়িলেন; যেহেতু প্রভুকে আরও নূতন কথা বলিতে অবকাশ দিলেন। ইহাতে আরও আকৃষ্ট হইলেন, হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী নির্ব্বোধ নহেন। আর একটু পরে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিতও বটেন। আর একটু পরে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও সুবোধ নহেন, একজন উচ্চ-শ্রেণীর পণ্ডিত। প্রভুর উপর সার্ব্বভৌমের শ্রদ্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি

কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও? কি শিখেছ তুমি তবে, শুনি দেখি কও ॥
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি। কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি।
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল। ষাটি প্রকার তার সদর্থ করিল ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে। ইহা ত সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে ॥
ভট্টাচার্য্যের যেই পাণ্ডিত্য অভিমান। গেল যদি প্রভু তবে হৈল কৃপাবান ॥

পাইতেছে। সার্ব্বভৌম যখন বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র ত নহেন, বরং তাঁহার সমকক্ষ, ইহাতে কিছু ব্যস্ত ও ভীত হইলেন। তখন ভাবিতেছেন, তাঁহার গুরুর আসনখানি বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে; সুতরাং আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। তখন ভট্টাচার্য্য উত্তর আরম্ভ করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ আবার করিল। বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল॥"

অর্থাৎ তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকদিগের যত ন্যায্য ও অন্যায্য উপায় আছে, ভট্টাচার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ১২শ সর্গঃ—

ইত্থং প্রমাণৈরখিলৈশ্চ শক্ত্যা তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গৌণ্যা।
মুখ্যা জহৎস্বার্থ তদন্যমিশ্রস্বরূপয়া স্বমতমাবভাষে॥ ২১

অর্থাৎ "এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অখিল প্রমাণ দ্বারা তথা তাৎপর্য্য, লক্ষণা, গৌণী, মুখ্যা, জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, এবং জহদজহৎস্বার্থা নামক শব্দের শক্তি দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈনিরস্ত ধীরপথ্য পূর্ব্বপক্ষং।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা সচাস্ত স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ॥

অর্থাৎ "অনন্তর বিপ্রবর সার্ব্বভৌম বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরস্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, এবং স্বভাব-সিদ্ধ সিদ্ধান্তবিদ্ মহাপ্রভু শীঘ্র পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন।" তখন ভট্টাচার্য্যের প্রাণপণ হইয়াছে, তিনি যান যান, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তাঁহার চিরজীবনের সাধনের ধন সেই গুরুর আসন, তাঁহার অর্থের চরমসীমা সেই ভুবন-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠা—যায় যায় হইয়াছে। কিন্তু করেন কি? আবার অন্যায় ছল উঠাইয়া পদে পদে আপনি অপদস্থ হইতে লাগিলেন।

যখন দুই বীরে মল্লযুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ধীরেই আরম্ভ হয়, ক্রমে প্রাণপণ হয়। একজন ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে

তাহার সমুদায় শক্তি লোপ হইয়া পড়ে। তখন সে নিরাশ হইয়া পৃষ্ঠাসন অবলম্বন করে, আর তাহার জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার বক্ষস্থলের উপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। পরাজিত মল্ল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে কাতরভাবে চাহিতে থাকে।

পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছেন; বুঝিতেছেন, দুর্ব্বল হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই; প্রাণপণ করিয়াও পারিতেছেন না। অগ্রে যে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। আর শক্তি নাই। তখন নিরাশ হইয়া, অতি কাতর বদনে চুপ করিয়া বসিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তখন সার্ব্বভৌম হইয়াছেন যেন একটি পঞ্চমবর্ষের শিশু, আর প্রভু তাঁহার পরম উপদেষ্টা;— অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাঁহাকে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি জীবের পরম সাধন; যাঁহারা মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।" ইহা বলিয়া প্রভু অন্যান্য অনেক শ্লোকের মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

সার্ব্বভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, "স্বামিন্! এই শ্লোকটির অর্থ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।" প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা তাই করিব। তবে অগ্রে আপনি অর্থ করুন। পরে আমি ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি করিব।"

সার্ব্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন,—তিনি মরিয়াছিলেন, নবজীবন লাভের একটি উপায় পাইলেন। অর্থাৎ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শাইবার অবকাশ পাইলেন। এই শ্লোক অবলম্বন

করিয়া তাঁহার বিচ্যুতপদ, যতদূর সম্ভব পুনঃ অধিকার করিবেন, এই আশা করিয়া অতি আগ্রহের সহিত ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। নানা তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা কথার নানা অর্থ করিলেন, এইরূপে শ্লোকের নয়টি অর্থ করিলেন। শেষে ভাবিলেন, তিনি যাহা করিলেন ইহা জগতে অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু প্রভু সেরূপ কোন ভাব দেখাইলেন না,—তিনি সার্ব্বভৌমের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া প্রশংসার আশয়ে মহাপ্রভুর মুখপানে চাহিলেন। প্রভুও সার্ব্বভৌমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া শেষে বলিলেন, "পৃথিবীতে তোমার সমান পণ্ডিত বিরল। তুমি ইচ্ছা করিলে এক শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে পার। তবে তুমি পাণ্ডিত্যের শক্তিতে অর্থ করিয়াছ। কিন্তু এই শ্লোকের আরও তাৎপর্য্য থাকিতে পারে।

ভট্টাচার্য্য ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ন্যায্য ও অন্যায্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শ্লোকটির নয়টি অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় যখন শ্লোক-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু রহিল না তখনই ক্ষান্ত দিয়াছেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে, শ্লোকের আরও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন, "সে কি? আপনি বলিতেছেন ইহার আরও অর্থ আছে! আর কি অর্থ আছে বলুন দেখি?"

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যে সকল অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটিও স্পর্শ করিলেন না,—সে পথেই গেলেন না। তিনি যে পথ লইলেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং যতগুলি অর্থ করিলেন তাহাও সমুদায় নূতন। এইরূপে প্রভু ইহার অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন!

কিরূপে প্রভু এই এক শ্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। প্রভুর ব্যাখ্যা পদ্ধতি দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমে প্রভু শ্লোকের 'আত্ম' শব্দ লইয়া ইহার যত প্রকার অর্থ আছে বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

"আত্ম শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি। বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥"

তথাহি বিশ্ব-প্রকাশে—'আত্মা, দেহ, মনো, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধিষু প্রযত্নে চ।"

প্রভু এইরূপে এই শ্লোকে যতগুলি শব্দ আছে, এবং অভিধান অনুসারে প্রত্যেক শব্দের যত রকম অর্থ আছে, সব বলিলেন। তারপর এই সকল শব্দের নানাবিধ অর্থ যোগ করিয়া শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে লাগিলেন। শেষে দেখাইলেন যে, এই সমুদায় অর্থের তাৎপর্য্য একই,—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বজীবের পরম পুরুষার্থ।

সার্ব্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার নিমিত্ত, প্রভু অন্যান্য বহুতর শ্লোকের সঙ্গে "আত্মারাম" শ্লোকটিও আওড়াইয়া ছিলেন। ইহার অর্থ যে তাঁহার করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। আর শ্লোকের ব্যাখ্যা করাও প্রভুর কার্য্য নহে, ইহা পণ্ডিতগণের কার্য। সার্ব্বভৌমের নিকট শ্লোক পাঠ করিতে গিয়া, যে তাহার মধ্যে বাছিয়া প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিবেন, তাহাও অননুভবনীয়। ঘটনাটি এইরূপে হইল। প্রভু কথায় কথায় অন্যান্য শ্লোকের মধ্যে "আত্মারাম" শ্লোকটি আওড়াইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম (কেন তিনিই জানেন) উহার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "আগে তুমি ব্যাখ্যা কর, পরে আমি করিব।" এই অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম (অর্থাৎ সেই ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত) তাঁহার যতদূর

সাধ্য সেই শ্লোকটি নিঙড়াইয়া অর্থ বাহির করিলেন। শেষে প্রভুকে উহার অর্থ করিতে দিলেন। প্রভুও অমনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যত প্রকার অর্থ করিলেন, প্রভু তাহার একটিও না লইয়া নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই দেখাইলেন যে, সমগ্র অভিধান-খানি তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাহার পর, এই সমস্ত শব্দ সংযোগ করিয়া প্রভু প্রথমে একটি সম্পূর্ণ নূতন অর্থ করিলেন। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন,—অদ্ভুত! অদ্ভুত! তাহার পর শ্লোকের শব্দের অর্থ দিয়া যখন প্রভু আর একটি অর্থ করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম আরও আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছেন,—হরি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাণ্ডিত্য! কি অমানুষিক শক্তি!!!

প্রভু এই প্রকারে ঐ শ্লোকের আরও একটি অর্থ করিলেন। এই নূতন অর্থের মধ্যে সার্ব্বভৌম আরও কারিগরি দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি দেখিতেছেন যে, যদিও প্রভু শ্লোকের নূতন নূতন অর্থ করিতেছেন, কিন্তু সমুদায় অর্থ দ্বারাই তাঁহার মত, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া সার্ব্বভৌমের বুদ্ধি-শুদ্ধি ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। আবার তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের একটি অর্থও লইলেন না, তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে প্রভু যখন শব্দের অর্থ করিতে লাগিলেন, তখন সার্ব্বভৌম ভাবিলেন, শব্দ উঁহার খেলার সামগ্রী। ইনি যে সরস্বতীর বরপুত্র! ক্রমে নূতন নূতন অর্থ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে বুঝিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসী মনুষ্য নহেন। শ্লোকের অর্থ করিতে প্রভু যে অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, ইহা যে কত বিস্ময়কর তাহা পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারেন; কিন্তু সার্ব্বভৌম উহা যেরূপ বুঝিলেন, সেরূপ আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না; কারণ তিনি নিজে কারিগর লোক। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য পণ্ডিতে

যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্যে তাহা পারেন না! আবার যাঁহার যত বড় পাণ্ডিত্য, তিনি অন্যের পাণ্ডিত্য-শক্তি তত বেশী অনুভব করিতে পারেন। কাজেই নবীন সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য সার্ব্বভৌম যেরূপ অনুভব করিলেন, তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিতে তাহা পারিতেন না। প্রভু এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখেন নাই, উপস্থিত মত করিলেন।

প্রভুর নিকট শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্ব্বভৌমের মনের ভাব ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে প্রভুর মুখে বেদের অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনিই অদ্বিতীয় পণ্ডিত নন, তাঁহার উপরে আরো পণ্ডিত আছেন। কিন্তু প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রথমেই বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসীর শক্তি কেবল যে অসাধারণ তাহা নহে, এরূপ শক্তি মনুষ্যের হইতেই পারে না। তখন ভাবিতেছেন, তবে ইনি কি স্বয়ং বৃহস্পতি, মনুষ্য-রূপ ধরিয়া আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে আসিয়াছেন? যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য—১২শ সর্গে :—

অথৈষ বিস্মেরমনা দ্বিজাগ্র্যো হৃদাহৃদি ব্যাকুলিতো জগাদ।
ক এষ মৎপ্রাতিভখণ্ডনার্থমিহাবতীর্ণঃ কিমুগীষ্পতিঃ স্যাৎ ॥২৮

"তদনন্তর দ্বিজাগ্রণী সার্ব্বভৌম ব্যাকুলিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, ইনি কি বৃহস্পতি, যিনি আমার প্রতিভা হরণ করিতে আসিয়াছেন? আবার ভাবিতেছেন, বৃহস্পতি হইলেও আমি একটু যুদ্ধ করিতে পারিতাম,—ইনি তাঁহা অপেক্ষাও বড়।"

তখন তাঁহার গোপীনাথের কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন, গোপীনাথ বলেছিল যে, এ সন্ন্যাসী স্বয়ং—তিনি। সেইরূপ আকৃতি প্রকৃতি বটে, —যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি মধুর প্রকৃতি, আবার সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যে মণ্ডিত। এত রূপ গুণ কি অপরের সম্ভবে? এই কথা মনে হওয়াতে

সার্ব্বভৌমের শরীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত অবিদ্যা অন্তর্হিত হইল! তাহাতে কি হইল? না,—তাঁহার চিত্তদর্পণ নির্ম্মল ও সমুদায় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হইল। তখন বুঝিলেন, তিনি অভিমান ও ঈর্ষা দ্বারা চালিত হইয়া সম্মুখের বৃহদ্বস্তুটিকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, আর তাঁহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন। তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া গলায় বসন দিয়া "আমি অপরাধী" বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; কারণ দেখেন যে সম্মুখে নবীন সন্ন্যাসী আর নাই। সে স্থানে বিদ্যুল্লতা-মণ্ডিত সুবর্ণ-বর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন অতি সুন্দর-পুরুষ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! তাঁহার ষড়ভুজ। উর্দ্ধের দুই বাহু দুর্ব্বাদলের ন্যায় বর্ণ উহাতে ধনুর্ব্বাণ; মধ্যে দুই বাহু নীলকান্তমণির ন্যায়, উহাতে মুরলী আর নিম্নের দুই বাহু সুবর্ণ-বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু। এই সুন্দর-মূর্ত্তির শ্রীবদন মুরলীরন্ধ্রে চুম্বিত। ইহার মুখে মধুর হাস্য, মস্তকে চূড়া, আর অঙ্গের জ্যোতি সুশীতল স্নিগ্ধকারী ও আনন্দপ্রদ। ইহা দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে

"অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়। দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।"

সার্ব্বভৌমের চিত্তদর্পণ বিদ্যামদে মলিন হইয়াছিল। চাঁদকাজীকে বাহুবলে অন্ধ করে। তাঁহার বাহুবল অন্তর্হিত হইলে, তাঁহার চক্ষু পরিষ্কার হইল। যে বলে চাঁদকাজীর উদ্ধার হইয়াছিল, সে বলে সার্ব্বভৌমের কিছুই হইত না। যে শক্তিতে সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইলেন, উহা চাঁদকাজীকে স্পর্শও করিত না। সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান হরণ করিবার প্রয়োজন হয়, প্রভু তাহাই করিলেন। অমনি তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান গেল, তিনি দিব্যচক্ষু

পাইলেন। সার্ব্বভৌম ষড়্ভুজমূর্ত্তি যেরূপ দর্শন করেন, তাহা তিনি জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে ও আপনার বাসগৃহে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। উহা অদ্যাপিও বিদ্যমান। সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলে প্রভুর "শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।" অমনি সার্ব্বভৌম চক্ষু মেলিলেন, ও প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমাকে দর্শন দিলাম।"

"সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুই বহি নাই আর॥"

সার্ব্বভৌম ক্রমে অল্প চেতন পাইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু সে মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলেন না। তবে দেখিলেন, সে স্থানে নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া। সার্ব্বভৌম সম্পূর্ণরূপে চেতন পাইবার পূর্ব্বেই প্রভু উঠিয়া বাসায় গেলেন। ক্রমে সার্ব্বভৌমের নিপট্ট বাহ্য হইল। তিনি তখন কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন ও দেখিবার পূর্ব্বে কি কি ঘটনা হয়, ক্রমে সমুদায় স্মরণ করিতে লাগিলেন। কখন ভাবিতেছেন, সমুদায় ইন্দ্রজাল; আবার ভাবিতেছেন,—কিন্তু বেদের যে নূতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত ইন্দ্রজাল নয়। আর আত্মারাম শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহা ত সমুদায় মনে আছে। অবশ্য যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু মূর্ত্তি দেখিবার পূর্ব্বে আমি না সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গিয়াছিলাম? সন্ন্যাসী যে মনুষ্য নহেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রকাশ। যাহার এরূপ অমানুষিক শক্তি, তাঁহার পক্ষে ষড়্ভুজ হওয়ার বিচিত্রতা কি? তবে এ ষড়্ভুজের অর্থ কি? ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে যে অগ্রে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ, শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ; অর্থাৎ আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আর আমিই সেই গৌরাঙ্গ। প্রভু ষড়্ভুজের দ্বারা আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। স্বপ্নে এত

জ্ঞানগর্ভ অর্থ কিরূপে থাকিবে? প্রভু মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তবে প্রকারান্তরে আমাকে সমুদায় পরিচয় দিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম আবার ভাবিতেছেন, "যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক। তবে কে, কিরূপে, উহা আমাকে দেখাইলেন?" তখন মনে হইল, সন্ন্যাসীর যে এই কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সন্ন্যাসীটি কি শ্রীভগবান্?

অমনি সার্ব্বভৌমের মন বলিয়া উঠিতেছে,—"না, না, সন্ন্যাসী ভগবান্ কিরূপে হইবেন?" সার্ব্বভৌমের এরূপ মনের ভাবের কারণ এই যে, জীবের দুইটি মন্ত্রী আছে—সন্দেহ ও বিশ্বাস। দুটিই উপকারী; তাহার মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাস অপেক্ষাও বলবান। সন্দেহ ও বিশ্বাসে হুড়াহুড়ি বাধিলেই সন্দেহের জয় হয়। সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন, ইনি শ্রীভগবান্ কখনও নয়; শ্রীভগবান্ কলিকালে নব-সমাজে আসিয়াছেন, তাহা কি হইতে পারে? এ যে হাসিবার কথা। তবে সন্ন্যাসীটি সম্ভবতঃ ইন্দ্রজাল জানেন, তাহার দ্বারা আমার ভ্রম জন্মাইয়াছিলেন। তিনি ভগবান্ কখনও হইতে পারেন না।"

আবার বিশ্বাস আসিতেছে। তখন ভাবিতেছেন, "তবে সন্ন্যাসী আপনিই স্বীকার করিলেন যে, তিনি শ্রীভগবান্। ইহা ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড ব্যতীত আর কেহ কি বলিতে পারে? কিন্তু সন্ন্যাসী নাস্তিকও নয়, মূর্খও নয়, ভণ্ডও নয়। ইঁহার প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায়, যাহা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ইঁহার বুদ্ধি বিদ্যা সরস্বতীকান্তের ন্যায়, বৈরাগ্য অকথ্য আর স্পৃহা মাত্র নাই। ইঁহার দীনতা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহার বদনের সারল্য দেখিলে, অতি কঠিন পুরুষেরও নয়নে জল আইসে। ইনি আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিবেন কেন? ইঁহার স্বার্থ কি? ইঁহার ত কোন স্পৃহা নাই? ইঁনি কখনই ভণ্ড-ভক্ত হইতে পারেন না; কারণ ইঁহার বায়ুতে জীবের হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হয়। যিনি প্রকৃত

ভক্ত, তিনি কি কখন শ্রীভগবান্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাকে সেখানে বসাইতে পারেন? ইনি যে শ্রীভগবান্ তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ না হইলে, আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিতেন না।” ইহা ভাবিয়া সার্ব্বভৌম আবার আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

সার্ব্বভৌমের এইরূপে সমস্ত নিশি কাটিয়া গেল। এই এক নিশির মধ্যে তাঁহার হৃদয় কর্ষিত হইল। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র কণ্টকবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল; প্রভু তখন তাহার মধ্যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিলে উহা অঙ্কুরিত হইত না। এই নিমিত্ত ভক্তি-বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে হৃদয়স্থ কণ্টকী-লতাগুলি উৎপাটিত ও হৃদয় কর্ষণ করিতে হইল। ষড়্‌ভুজ দর্শন করিয়া এবং প্রভুর সহবাসে সার্ব্বভৌম ভক্তি পাইলেন না। তবে ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র হইলেন। এই এক নিশির মধ্যে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত ও সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত এবং নয়ন-জলে আর্দ্র হইল। তখন কেবল বীজ রোপিত হইতে বাকি রহিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে তিনি নিদ্রা গেলেন।

এদিকে প্রভু বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যুষে শয্যোত্থান দর্শন করিতে চলিলেন। প্রভু দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ নিকটে দাঁড়াইয়া। শ্রীজগন্নাথদেবের গাত্রোত্থান, মুখধাবন, স্নান, বস্ত্রপরিধান, বাল্যভোগ ও পরে হরিবল্লভ-ভোগ হইল। তখন আন্ধার আছে। তাহার পরে প্রাতে ধূপপূজা হইল। এমন সময় শ্রীজগন্নাথের দুইদিক হইতে দুইজন সেবক হঠাৎ বাহির হইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন। একজনের হস্তে মালা, আর একজনের অঞ্জলিতে ধূপপূজার প্রসাদান্ন। তাঁহারা প্রভুর নিকট আসিলে,—যথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ে—

“মহাপ্রভু অধো মাথা করিলা আপনে। এক জন মালা গলে দিলেন তখনে॥
বহির্ব্বাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান্। প্রসাদান্ন আর জল করিলা স্থাপন॥”

শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা পরান হইলে, তিনি বহির্ব্বাসের অঞ্চলে প্রসাদান্ন লইলেন। ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন এত ভোরে উঁহারা কাহারা আসিলেন? আর কেন আসিলেন? আপনা আপনি আসিবার ত কোন কথা নয়, কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! কে পাঠাইলেন? প্রভুর কি গোপনে গোপনে সেবকগণের সহিত কোন বন্দোবস্ত হইয়াছিল? তাই বা কখন হইল? আমরা ত সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে।" শেষে ভাবিলেন, এ কাণ্ড স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ করিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয় তাঁহার,—অর্থাৎ জগন্নাথ ও প্রভু,—দুই জনে কি যুক্তি করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভক্তগণ এই কাণ্ড দেখিতেছেন। তাঁহাদের আশ্চর্য্য ভাব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন প্রভু সমুদায় জানিতেন; অর্থাৎ দুইজনে আসিয়া যে তাঁহাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা যেন প্রভু প্রত্যাশা করিতেছিলেন। প্রভু প্রসাদ পাইলেন, কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, অমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু যদি দৌড়িলেন, ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে গমন করিলেন, সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না; তবে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন; এবং নিজ-বাসার পথ ছাড়িয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ী যে পথে সেই দিকে ছুটিলেন। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহারাও সেই পথে চলিলেন। প্রভু দৌড়িয়া, একেবারে সার্ব্বভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষের ভিতরে, দ্বার অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে সার্ব্বভৌম নিদ্রা যাইতেছেন, দাওয়ায় একজন ব্রাহ্মণকুমার শয়ন করিয়া। প্রভু যাইয়া "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিলেন। ইহাতে প্রথমেই সেই ব্রাহ্মণবালক উঠিল উঠিয়া প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিতে

লাগিল। বলিতেছে, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! শীঘ্র উঠুন, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন।" সার্ব্বভৌম ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাই তুলিতে তুলিতে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার অগ্রে কৃষ্ণনাম করিতেন না। এই প্রথম বলিলেন। তারপর যখন বুঝিলেন যে প্রভু আসিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আসিয়াই প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

এখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিরূপ ধর্ম্ম মানেন, তাহা একটু বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইতেছে। এখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা যেরূপ, তিনিও সেইরূপ। তবে এখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অধিক তেজস্কর ও অধিক সূক্ষ্মদর্শী। ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের আচরণীয় নহে। কিন্তু সার্ব্বভৌমের অঙ্গে যদি ঐরূপ জলের ছিটা লাগিত তবে তিনি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। সমাজের ঘোর শাসন ছিল, তাহা ভট্টাচার্য্যেরাই পালন করিতেন; কাজেই তাঁহাদের সেই শাসনের অধীন থাকিতে হইত। আপনারা না মানিলে অন্যে মানে না, সুতরাং সেই শাসন অন্য অপেক্ষা আপনারা অধিক মানিতেন। আচার বিচার ও শুচি লইয়া দেশ সমেত লোক বিব্রত। এ ব্যক্তি অস্পৃশ্য, এ দ্রব্যটা অশুচি—ইহার বিচারই ক্রমে জীবের প্রধান ধর্ম্ম হইল। জাতি বিচার ইহার প্রধান কারণ। আর এক বিচার দেহধর্ম্ম লইয়া। অস্নাত ভোজন করিতে নাই, দন্তধাবন না করিলে পূর্ব্বপুরুষ নরকে যায়, রাত্রি-কালের বসন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য উচ্ছিষ্ট। অমুক চণ্ডাল, তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই। অমুকের বাড়ী মুসলমান ভৃত্য তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের মুখে জোর করিয়া মুসলমানের জল দেওয়া হইয়াছিল

বলিয়া, নবদ্বীপের পণ্ডিতমহাশয়গণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তাঁহার তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে! এই সব কঠোর শাসনের শাস্ত্রবেত্তা শ্রীনবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যগণ; আর এই ভট্টাচার্য্যগণের প্রধান সার্ব্বভৌম।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। জাতি-বিচার আবার কি সকলেই ত শ্রীভগবানের? যে ভক্ত সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি, অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত-চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। হরিদাস যবন, তাঁহার পাদোপক ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন, আর তিনি হইলেন কুলীনগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু বসুগণের গুরু। যে অন্ন শ্রীভগবানকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা অতি পবিত্র, অঙ্গে মাখিতে হয়। অতএব ভট্টাচার্য্যগণের নিয়মাবলী এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম এক সঙ্গে যাজন করা যায় না। এই নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যগণ, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের প্রতিবাদী হইলেন। যদিও প্রভু সমাজের কোন বিরোধী উপদেশ দিতেন না, তবু তাঁহার ধর্ম্ম যে সামাজিক নিয়মের বিরোধী, তাহা পণ্ডিতগণ বেশ বুঝিলেন, আর সেই নিমিত্ত উহা ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সার্ব্বভৌম শাস্ত্রবেত্তা-ভট্টাচার্য্যগণের প্রধান। তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত ভক্তি-পথে আনা হইল। সার্ব্বভৌম ভক্তি পাইলেন, ষড়ভুজ দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবুও তিনি উপরি উক্ত সামাজিক বন্ধনে আষ্টে-পিষ্টে আবদ্ধ রহিলেন। সেই সমুদায় বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার কিছুই হইবে না। প্রভু এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে, প্রভু অতি যত্ন করিয়া, অঞ্চলের প্রসাদান্ন বাহির করিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিয়া, মধুর হাসিয়া বলিলেন,

"গ্রহণ কর, ইহা শ্রীমুখের প্রসাদ।" তখন সার্ব্বভৌম স্নান করেন নাই, বাসী-বসন ত্যাগ করেন নাই, শৌচে যান নাই, দন্তধাবনও করেন নাই; তিনি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? প্রসাদ কি, না ভাত! ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, শতবার মৃত্যু স্বীকার করিবেন, তবুও মুখ না ধুইয়া অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সেই ভাত লইয়া, অতি প্রত্যুষে, স্নান না করিয়া, মুখ না ধুইয়া প্রভু উহা সার্ব্বভৌমকে গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ খাইতে বলিতেছেন। প্রভু যে বলিলেন, "শ্রীমুখের প্রসাদ গ্রহণ কর", তাহার অর্থ (ভট্টাচায্য ব্রাহ্মণের নিকট) এই যে, "মুখ না ধুইয়াই তুমি এই কয়টি শুখ্না ভাত খাও।" কিন্তু সার্ব্বভৌম তখন আর পূর্ব্বকার ভট্টাচায্য-ব্রাহ্মণ নাই; তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনের বায়ু তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছে। (যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)—"প্রভু খাও খাও ভট্টাচার্য্যে বলে হাসি।" ভট্টাচার্য্য আর দ্বিধা করিলেন না; অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন, করিয়া অভ্যাসবশতঃ তবু দুইটা শ্লোক পড়িলেন, যথা—

(১) শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥

(২) ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

সার্ব্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুলধর্ম্ম ছাড়িলেন।

কিন্তু সেই প্রসাদান্ন ভোজন মাত্র সার্ব্বভৌমের এক অপরূপ ভাব হইল। (যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে) "চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত কণ্টকিত গাত্র।" তাহার পরে সার্ব্বভৌম আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন না, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার কি দশা হইল শ্রবণ করুন। "নিরন্তর কণ্ঠ হয় শব্দ ঘরঘর। অপস্মার রোগে যৈছে ব্যগ্র কলেবর॥ মহীতলে গড়াগড়ি যায় বার বার।"

এই মহাপ্রসাদে কি শক্তি নিহিত ছিল তাহা প্রভুই জানেন। সার্ব্বভৌম এই কয়েকটি শুষ্ক প্রসাদান্ন যেই মুখে দিলেন, অমনি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভুর হাতে এই প্রসাদ গ্রহণরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সার্ব্বভৌম নির্ম্মল হইলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—"চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।"

সার্ব্বভৌম অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন; হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, যেহেতু তখন তাঁহার উঠিবার শক্তিমাত্র ছিল না। উঠাইয়া প্রভু অতি আদরে, অতি প্রেমে—আহা! ভগবানের প্রেমের কি বর্ণনা করিব, যে প্রেমের কণা পাইয়া সতী নারী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরেন, সেই ভগবানের প্রেমে সার্ব্বভৌমকে বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন দিতে দিতে প্রভু বলিতে লাগিলেন;—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"আজি মুই অনায়াসে জিনিল ত্রিভুবন। আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ। সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন॥ আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন। বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥"

সেই আলিঙ্গনের সহিত সার্ব্বভৌম পঞ্চম-পুরুষার্থ পাইলেন। তাঁহার যে শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরো কিছু হইল। যেরূপ বিদ্যুৎমালা মেঘের সহিত খেলা করে, সেইরূপ আনন্দ-লহরী তাঁহার অঙ্গের সহিত খেলা করিতে লাগিল। সেই লহরী, শরীরের সমস্ত ধমনী বহিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল, অঙ্গের প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া চোয়াইয়া পড়িতে লাগিল, আর তাঁহাতেই প্রত্যেক লোমকূপে পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন হৃদয়-কপাট খুলিয়া ঝলকে ঝলকে আনন্দের

তরঙ্গ আসিতে লাগিল। শেষে হৃদয়ে স্থান না পাইয়া মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। কিন্তু প্রভু তখন সার্ব্বভৌমের আনন্দ-তরঙ্গের নালী কাটিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং দুই জনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের এই প্রথম নৃত্য এবং ইহা বন্ধন ছেদনের অব্যর্থ প্রমাণ। চির-আবদ্ধ পশুগণ কোন ক্রমে বন্ধন ছেদন করিতে পারিলে একবার ছুটাছুটি করে। সমাজের বন্ধনে লোক স্থির-শান্ত ভব্য-সভ্য হইয়া বেড়ায়। মদ্যপানে সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন সে নির্লজ্জের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। যখন মদ্যপান করিয়া কেহ নৃত্য করে,—সে যে উন্মত্ত হইয়াছে, নৃত্যই তাহার প্রমাণ। সার্ব্বভৌম নৃত্য করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

একজন যুবক এক দস্যুপতির নিকট আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইতে চাহিল। দস্যুপতি দেখিল, যুবক বলবান বটে। পরে তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "বাপু! তুমি পারিবে না, দস্যু হইবার যে সমস্ত গুণ প্রয়োজন তাহা তোমার নাই।" যুবক দুঃখিত হইয়া বলিল, সে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে। দস্যুপতি তখন হাসিয়া একখানি তরবারি যুবকের হস্তে দিয়া বলিল, "ঐ যে ষাঁড়টি চরিতেছে, উহার মাথাটি লইয়া আইস।" যুবক বলিল, "অনর্থক কেন একটি জীব হত্যা করিব!" তখন দস্যুপতি তাহার ভৃত্যকে ঐ পশুর মস্তকটি আনিতে বলিল। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। যদি যুবকটি আজ্ঞামাত্র পশুটির মস্তক ছেদন করিতে পারিত, তবে দস্যুপতি বুঝিতে পারিত যে, সে তাহারই গণ বটে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মদ্যপান করিয়া যে নৃত্য করে, তাহাকে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, "হ্যাঁ, এ মাতাল বটে। সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেম ও ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে, তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, সে ভক্ত কি প্রেমিক বটে। জগাই

মাধাই উদ্ধার হইলে, জগাই প্রথমে নাচিতে লাগিলেন। তাহার পরে মাধাইও নাচিলেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল, বিশেষতঃ তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে বাঁচাইয়াছিলেন! সুতরাং জগাই নাচিতে থাকিলে ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। কিন্তু যখন মাধাই নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"প্রভুর একি ঠাকুরাল! জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে, এ যে মাধাই নাচে!" মাধাই যখন প্রেম-ভক্তিতে নাচিতে পারিলেন, তখন বুঝা গেল যে, তাঁহার সর্ব্ববন্ধন ছেদন হইয়াছে।

দেবাদিদেব-মহাদেব-অবতার শ্রীঅদ্বৈত সকল ভক্তের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার দাস্যভক্তি। তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করিতেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ, যাজক ও মন্ত্রবিৎ। তিনি পূজা অর্চ্চনাদি সমুদায় ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য গীত তাঁহার ভজন নয়। যখন তিনি প্রভুর প্রকাশ দেখিলেন, তখন নানা উপহারে ও শাস্ত্র-বিধানে শ্রীভগবানের চরণ পূজা করিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার জাড্য রহিয়াছে! পূজা সমাপ্ত হইলে প্রভু বলিলেন, "নাড়া, একবার নৃত্য কর।" অমনি সেই পরম-গম্ভীর পৃথিবী-পূজিত বৃদ্ধব্রাহ্মণ ভঙ্গি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন নৃত্য করিলেন তখন তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইল। সার্ব্বভৌম যখন নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব বন্ধন ছেদন হওয়াতে, নাচিবার আর বাধা রহিল না। নাচিতে বাধা না থাকিলেই কি লোকে নাচিতে পারে? ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কি কেহ আপনা-আপনি নাচিতে পারে? তাহার সে ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাই,—কিছু উত্তেজক মাদকদ্রব্য চাই। ভট্টাচার্য্যের পক্ষে সেই মাদক-দ্রব্য হইতেছে—প্রেম ও ভক্তি।

ভট্টাচার্য্য কেবল মুক্ত হইয়াছেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে নৃত্য করিবার শক্তি,—যে শক্তি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তিতেই আছে—তাহাও পাইয়াছেন; তাই তিনি প্রভুর হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এখন ব্রজের দুই সখীর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন—

প্রমথ সখী। ভদ্রে একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ?

দ্বিতীয় সখী। কেন? একটু নাচিব না? তোরা নাচিস, আমি কেন নাচিব না?

প্রথম সখী। আমরা নাচি,—আমরা কুলটা, কুল হারাইয়াছি, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমার অনেক প্রভেদ। তুমি কুলবালা, ধীর, গম্ভীর; আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়া তুমি ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইতে, আমাদিগকে নিন্দা করিতে; এমন কি, আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশা কেন?

দ্বিতীয় সখী। সই! আমিও শ্যামের হাতে কুল হারাইয়াছি।

প্রমথ সখী। সে কি! সই, তুই এত বড় গম্ভীর, তোর এ দশা হ'ল কেন, বল্ দেখি?

দ্বিতীয় সখা। শুন্‌বি?

"শুন সই মনের মরম। ধ্রু।

এত দিন জাতি কুল, রাখিয়াছিলাম গো,
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম॥

কানু সেই কালিন্দি তীরে, মুই গেনু যমুনা নীরে,
গাখানি মাজিতেছিলাম একা।

যুবতীর চিতচোরা, জলের ভিতর গো,
যৌবন-রতনে দিল দাগা॥

হৃদয় মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো,
উপরেতে ঝাঁপি দিলাম বাস।

হেনকালে গুরুজনা, চিনিতে পারিল গো,
অনুমানে কহে কানুদাস ॥*

সার্ব্বভৌমও শ্যামকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—নাচিয়া উঠিলেন ; তখনি "অনুমানে" বুঝা গেল যে. তাঁহার হৃদয়ে শ্যামকে আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া রাখিয়াছেন ! ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত। সেই দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই গর্ব্বিত দণ্ডীদিগের গুরু, সেই জ্ঞানের প্রস্রবণ, সেই নদীয়া-বিজয়ী পণ্ডিতের নৃত্য,—ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে সূর্য্য উদয়ও সেইরূপ অদ্ভুত। ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেমের নৃত্য ক্রমে প্রস্ফুটিত ও মধুর হয়। প্রথম দিনকার নৃত্যে মাধুর্য্যের সঙ্গে একটু হাস্য-উদ্দীপক ভাবও থাকে। যে ব্যক্তি কখন নৃত্য করে নাই, কি যাহার করিবার সম্ভাবনাও নাই, সে যদি নৃত্য আরম্ভ করে, তবে তাহার নৃত্য প্রথম প্রথম কতকটা হস্তীর কি গণ্ডারের নৃত্যের ন্যায় হয়। সার্ব্বভৌম সেইরূপ কত অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে "ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ।"—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

গোপীনাথ বলিতেছেন, ভট্টাচার্য্য, "কর কি ? তোমার পড়ুয়াগণ কি বলিবে ? ত্রিভুবন কি বলিবে ? বলিবে যে. সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পাগল হয়েছে। ছি ! সম্বরণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা করিতেছে না ?" তখন সার্ব্বভৌম এই অপরূপ শ্লোকটি রচনা করিয়া বলিলেন। যথা—

"পরিবদতু জনো যথা তথায়ং, নমু মুখরোঽয়ং ন বিচারয়ামঃ
হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা, ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ ।।

অর্থাৎ—"অরে ! মুখর লোক যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক,

* এ ছড়াটি অতি অপূর্ব্ব সুরে শ্রীবদন অধিকারী গাইতেন।

কিন্তু আমরা বিচার করিব না, হরিরস-মদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব।"

তাহার পরে সার্ব্বভৌমকে শান্ত করিয়া প্রভু ভক্তগণ সহ বাসায় আসিলেন। একটু পরে সার্ব্বভৌমও একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

"প্রভু দরশনে তবে চলে শীঘ্রগতি। পাছে এক ভৃত্য তার চলিল সংহতি ॥
জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি। প্রভুর বাসায় কাছে যান ত্বরা করি ॥
তাঁর ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তাঁরে কয়। জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয় ॥"

সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া ভৃত্যের এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। সার্ব্বভৌমের ভৃত্যগণ তখন বুঝিয়াছে যে, তিনি আর এখন ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি যে একটু পূর্ব্বের ঘরের পিঁড়ায় অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানিয়াছে, কেহ কেহ বা দেখিয়াছে। সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে নানারূপ তর্ক-বিতর্কও হইয়াছে; নবীন-সন্ন্যাসী তাঁহাকে পাগল করিয়াছেন, এ কথাও উঠিয়াছে। সার্ব্বভৌম ঢুলিতে ঢুলিতে চলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ ঐরূপ সময়ে শ্রীঠাকুর দর্শন করিতে গমন করেন। সে দিবস তাহা না করিয়া মন্দিরের পথ ছাড়িয়া, অন্যপথে চলিলেন। কাজেই ভৃত্য ভাবিল ভট্টাচার্য্যের এখনও সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই। তাই বলিল. "ঠাকুর, ও পথে নয়! ও পথে নয়!"

তাহার পরে শ্রবণ করুন। সার্ব্বভৌম আসিতেছেন,—যথা—
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে)

আর" ভট্টাচার্য্য মনে মনে কথা হয়। গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয় ॥
সত্য গৌর ভগবান্ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর ॥
এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে চলিল। আপন মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল ॥
গোপীনাথ আচার্য্য ভট্টাচার্য্যেরে দেখিয়া। অগ্রসরি তথা হইতে আইল উঠিয়া ॥

গোপীনাথে দেখি সার্ব্বভৌম সুখী মর্ম্মে। জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু আছেন কিবা কর্ম্মে।
গোপীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া। এসো এসো প্রভুর চরণ দেখি গিয়া ॥"

সার্ব্বভৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম অন্য প্রকার, পূর্ব্বকার "রোগী যেন নিম খায় নয়ন মুদিয়া," মত নয়। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, দুই কর জুড়িয়া তিনি অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতে লাগিল এবং তিনি গদগদ হইয়া এই দুইটি শ্লোক উপস্থিত মত রচনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যথা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

নানালীলারসবশতয়া কুর্ব্বতো লোকলীলাং
সাক্ষাৎ করোহপিচ ভগবতো নৈব তত্ত্বাববোধঃ
জ্ঞাতুং শক্নোত্যহ ন পুমান দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তি তরাং লোহমাত্রং ন হেম ॥

অপিচ স্বজনহৃদয় সদ্মা নাগপদ্মাধিনাথো
ভুব চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
কথমিহ পশুকল্লান্স্তা মনাল্লানুভাবং
প্রকটমনুভবামোহস্য বামোবিধি র্নঃ ॥

তারপর সার্ব্বভৌম করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু! গোপীনাথ আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তখন তাহা বিশ্বাস হইল না। তাই আমি তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভু আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা কর। এখন মনুষ্যরূপ ধরিয়া কপট-সন্ন্যাসী হইয়া আমার অগ্রে আসিয়াছ। আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে তুমি গোপন থাকিবে, তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ করিব? আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে [illegible] চাহিলাম, তাহা পাইলাম না,

কাজেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি কৃপালু। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার তর্কনিষ্ঠ মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে। স্পর্শমণিকে কেহ চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহা দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। প্রভু! আমি তর্ক করিয়া যে লৌহপিণ্ড হইয়াছিলেন, আমাকে স্পর্শন দ্বারা যখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি।"

সার্ব্বভৌমের আর দম্ভ নাই। তিনি তখন বিনয়ী, দীনহীন, কাঙ্গাল। তখন তাঁহার সর্ব্ব-বচন ও সর্ব্ব-অঙ্গ মধুময় হইয়াছে। তাঁহার বাক্য শুনিয়া ও ভঙ্গি দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন? তিনি সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমকে প্রসাদান্ন ভোজন দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার কিছু মনে নাই। অন্ততঃ সে সমুদায় যে তাঁহার মনে আছে, কি কস্মিন্‌-কালে তিনি অবগত ছিলেন, তাঁহার কথায় ও ভঙ্গিতে তাহা কিছুমাত্র বোধ হইল না। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া স্তব করিতেছেন শুনিয়া তিনি প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না, তাই (যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে)—

"দুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল দুই কাণ, সার্ব্বভৌমে কহেন বচন।
শুন ভট্টাচার্য্য তুমি, তোমার বালক আমি, মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য।
তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে যে কথা কও, লোক উপহাসের প্রাবল্য॥"

সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিতেছেন, "আমি তোমার বালক, তুমি আমাকে কেন লজ্জা দিতেছ?" গোপীনাথ তখন আর থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! কেমন বলেছিলাম, এখন ঠিক হ'লো।" ভট্টাচার্য্য গোপীনাথের পানে চাহিলেন। আর দ্বন্দ্বের ইচ্ছা নাই, বিদ্রূপের শক্তি নাই। সার্ব্বভৌম কৃতজ্ঞ-চক্ষে গোপীনাথকে

দর্শন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "গোপীনাথ! আমার এই সম্পত্তি কেবল তোমা হতে। আমি প্রভুর কৃপা পাইবার কিছু করি নাই; কোন মতে উপযুক্তও নহি। তবে তুমি প্রভুর ভক্ত, আর আমার দুরবস্থায় তোমার বড় দুঃখ হইতেছিল। প্রভু তোমার দুঃখ দেখিতে পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত আমাকে উদ্ধার করিলেন।"

এ কথা শুনিয়া প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না,—সার্ব্বভৌমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন মহাপ্রীতিতে দুইজনে বসিয়া ভক্তিতত্ত্ব-কথা কহিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম তখন বেদ ও নানা শাস্ত্র হইতে, শ্রীভগবানের ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রভু মহাসুখে শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আমি এখন কি করিব? আমাকে উপদেশ করুন।" প্রভু বলিলেন, "কেন? শাস্ত্র ত উপদেশ করিয়াছেন,—হরিনাম ব্যতীত কলিকালে আর গতি নাই।" ইহা বলিয়া প্রভু "হরের্ণামৈব কেবলং" শ্লোক পাঠ করিলেন। ইহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য ঐ শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন। প্রভু আবিষ্ট হইয়া অর্থ করিলেন। এই এক সামান্য শ্লোকের দ্বারা প্রভু জীবের কি ধর্ম্ম তাহা বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্ব্বভৌম শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। এ শ্লোকের মধ্যে যে এত নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা তিনি কস্মিনকালেও জানিতেন না। প্রভু এই শ্লোকের অর্থ দুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ করেন, তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তাহা আমি প্রথম খণ্ডে দিয়াছি।

সার্ব্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, যাইবার সময় জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাহার পরে (যথা চরিতামৃতে)—

"উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আনিল। নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিল॥
নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে। প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে॥"

এই দুই শ্লোক ও প্রসাদ লইয়া চারিজনে প্রভুর নিকটে আসিলেন।

মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাতা দেখিয়া, উহা লইয়া শ্লোক পাঠ করিলেন। তিনি বুদ্ধির কার্য্য করিয়া ঐ দুই শ্লোক ঘরের প্রাচারে লিখিয়া রাখিলেন। জগদানন্দের সেই পত্র প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু পড়িয়া অমনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন! কিন্তু মুকুন্দ পূর্ব্বে উহা প্রাচীরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া শ্লোক নষ্ট হইল না।

"এই দুই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠমণি হার। সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যকার॥"

সে দুইটি শ্লোক এই :—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগঃ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥১॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥২॥

সার্ব্বভৌম প্রথমে এই দুই শ্লোকে পরিচয় দিলেন যে, প্রভু তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, "সেই পুরাণ-পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীভগবান, দেখিলেন যে তাঁহাতে যে ভক্তি ইহা ক্রমে নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধরিয়া যিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্ম আমার চিত্ত-ভৃঙ্গ গাঢ়রূপে প্রাপ্ত হউক।" সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে আর গোটা দুই কথা বলিতে বাকি আছে। সার্ব্বভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

"সার্ব্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত একজন। মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥"

কিন্তু সার্ব্বভৌমের মনের ভাব কি হইল তাহার অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে স্তুতি করিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম শ্লোকচ্ছন্দে প্রভুর রূপ

ধ্যান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

উজ্জ্বল বরং গৌরবর দেহং, বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহং।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
অরুণাম্বর ধর সুচারু কপোলং, ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজ গুণ নাম বিনোদং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষণ নব রস ভাব বিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণগতি রুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
ভূষণ ভূরজ অলকাবলিতং, কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরং।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
নিন্দিত অরুণ কমলদল নয়নং, আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
নব গৌরবরং নব পুষ্পশরং, নব ভাবধরং নবোল্লাস্তপরং।
নব হাস্যকরং নব হেমবরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং, নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং।
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং, করজপ্য করং হরিনাম পরং।
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নিজভক্তি করং প্রিয় চারুতরং, নট নর্ত্তন নাগরী রাজকুলং।
কুলকামিনী মানসোল্লাস্তকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং, মৃদঙ্গ রবাব সুবীণা মধুরং।
নিজভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

যুগধর্ম্ম যুতং পুন নন্দসুতং, ধরণী সুচিত্র ভবভাবোচিতং।
তনুধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
অরুণনয়নং চরণবসনং, বদনে স্খলিত স্বনাম মধুরং।
কুরুতে সুরসং জগতো জীবনং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

এই শ্লোকগুলি সার্ব্বভৌমের। তিনি চর্ম্মচক্ষে ও দিব্যচক্ষে প্রভুকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকগুলি দ্বারা বুঝা যাইবে। শ্রীনিমাইয়ের কি রূপ, কি গুণ, কি প্রকৃতি ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এই শ্লোকগুলি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। ভক্তগণ এই শ্লোকগুলি দ্বারা প্রভুর রূপ গুণ ও ধ্যান হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন।

সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু বাকি রহিলেন,—রূপ, সনাতন, রামানন্দ রায়, বৌদ্ধাচার্য্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভুর কার্য্য করিতে বড় বড় যে সকল বাধা ছিল, সে সমুদায় আপনি ক্রমে ক্রমে দুরীভূত করিতেছেন। যে কার্য্য ভক্তের দ্বারা সম্ভব, তাহা ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন; যাহা ভক্তের দ্বারা সম্ভব নয়, তাহা আপনি করিতেছেন। প্রভুর প্রথম বাধা নবদ্বীপের কোটাল জগাই মাধাই। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় বাধা চাঁদকাজী, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। তৃতীয় বাধা অধ্যাপক পণ্ডিত ও নৈয়ায়িকগণ। ইহাদের আদিস্থান শ্রীনবদ্বীপ, আর এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদীসম্মত রাজা শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম। প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এখন বাকী রহিলেন কয়েকজন; তাঁহাদের ও অন্য সকলের কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখনএকটু বলি।

নবদ্বীপ যেরূপ ন্যায়, তন্ত্র, স্মৃতি ও পুরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ বেদের স্থান। বেদ পড়িতে কাশীতে যাইতে হয়, সেখানকার উপাস্য

দেবতা শঙ্করাচার্য্য। সেখানে তাঁহার তখনকার সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ সরস্বতী। এই প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ইনি সার্ব্বভৌমের ন্যায় ভারতবিখ্যাত। সার্ব্বভৌম যেরূপ নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ, প্রকাশানন্দ সেইরূপ কাশীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ। শঙ্করাচার্য্যের মত প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গের মত ঠিক বিপরীত। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "আমি তিনি, তিনি আমি।" প্রভু বলেন, "আমি তাঁহার, তিনি আমার।" শঙ্করাচার্য্যের মত যদি ঠিক হয়, তবে প্রভুর মত বাতুলামি। আর প্রভুর মত যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করের মত কর্ত্তব্যে নাস্তিকতা। শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হন, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বড় হইতে সকলেরই সাধ, আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়লোকের দ্রব্য। জ্ঞানীলোকে ভক্তের ভাবকালী দেখিয়া হাসিবেন, আর ভক্তের ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই যাহা ভক্তগণের বিদ্রূপের সামগ্রী হইতে পারে। জ্ঞানীলোক বলিবেন, "স্ত্রীলোকের ন্যায় তুমি রোদন কর কেন। নৃত্য করিতে তোমার লজ্জা করে না? এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া ঢলিয়া পড়, এই কি মনুষ্যত্ব?" জ্ঞানীলোকের এই সমুদায় বিদ্রূপ-বাণের তীক্ষ্ণ আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন কবচ ভক্তের নাই। এই সমুদায় কথা শুনিয়া ভক্তের পরাজিত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কাজেই সাধারণের ধারণা যে শঙ্করের ধর্ম্ম বড় লোকের ধর্ম্ম, আর ভক্তের ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। কাজেই লোকে স্বভাবতঃ শঙ্করের ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের ধর্ম্মযাজন অপেক্ষাকৃত সহজ। শঙ্করের ধর্ম্ম পালন করিতে আরাম আছে। "আমি তিনি, তিনি আমি" এই বলিয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার আর কোন ভজনের কাজ রহিল না,

কেবল খাও আর আমোদ কর। পিতা যত্ন করিয়া পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করান। বিদ্যাভ্যাস করিলে তাঁহার পুত্রের মানসিক বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে ও পরকালে ভাল হইবে। কিন্তু দুর্বৃত্ত পুত্রের নিকট এ শাসন ভাল লাগে না। বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট। এ ভুবনে পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু পুত্রের এ কষ্ট সহ্য হয় না। পিতা মরিয়া গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল "বাঁচিলাম, আর পড়িতে হইবে না।" এইরূপে, ভজন নাই এরূপ ধর্ম্মযাজন প্রথম সুলভ, তাই অনেকে উহাতে আকৃষ্ট হন। তাঁহারা জানেন না যে, ভজনের ন্যায় সুখ ত্রিভুবনে আর নাই। তাহা জানা থাকিলে, ভজনকে একটি দণ্ড বলিয়া ভাবিতেন না।

ভক্তের ধারণা যে, শ্রীভগবদ্ভক্তি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ কাজ শ্রীভগবানের ভজন। মোটামুটি, ভক্ত হওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যে নাস্তিক হওয়ায় আপাততঃ অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ভক্তি-ধর্ম্মের একটি শক্তি আছে, উহা অনির্ব্বচনীয় ও অনিবার্য্য। একটি গল্প এখানে বলিব। বৈদ্যনাথ-দেওঘরে একজন তেজস্কর সন্ন্যাসী গিয়াছিলেন আমাকে দর্শন দিতে। তিনি বাঙ্গালী, ইংরেজী জানেন, সবল, বয়স ৫৫ বৎসর। দেখিলাম, লোকটি সাধু বটে। আমি প্রণাম করিয়া বসাইলাম। কিন্তু মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম, কারণ আমি তখন বিরলে বসিয়া কিঞ্চিৎ ভজন করিতে যাইতেছিলাম। শেষে ভাবিলাম, অগত্যা এই সন্ন্যাসীকে লইয়াই আজ ভজন করিতে হইবে; দেখি, যাহা থাকে কপালে। আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি কি কর, তোমার এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি?" সন্ন্যাসী নানারূপ কথা বলিলেন। দেখিলাম, তিনি একপ্রকার উদ্দেশ্যশূন্য। বলিতে কি, প্রায় জীবমাত্রেই এইরূপ উদ্দেশ্যশূন্য। যে কোন সাধু হউন, যদি

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ, ইহার উদ্দেশ্য কি? তবে অনেক সময়ে দেখিবে যে, তিনি নিজের যে কি উদ্দেশ্য তাহা ভাল করিয়া জানেন না।

ঠাকুরের মনের ভাব এই যে, তিনি একটি ভাল কাজ করিতেছেন; তবে সে ভাল কাজ যে কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি যে সমুদায় বড় বড় কথা বলিতেছ, উহার অধিকারী আমি নই। তুমি কৃপা করিয়া অধমের বাড়ী পদধূলি দিয়াছ, আমি তোমাকে দুই একটি গীত শুনাইব।" ইহা বলিয়া আমি সুরে সুর মিলাইয়া মহাজনের একটি বিখ্যাত পদ গাইতে লাগিলাম। সে পদটির প্রথম চরণ এই—

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদমুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গো!)।"

এই পদটি কেন গাইলাম তাহা বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের ভজন করিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু যাইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। মনের মধ্যে এই ভাব ছিল বলিয়া ঐ পদটি মুখে আসিল। প্রথম চরণ গাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, ঠাকুরের বদন ভক্তিতে লাবণ্যময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তাহার পরে দ্বিতীয় চরণ গাইলাম, যথা—

"দুই ভুজ-লতা দিয়া, হৃদিমাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তারে রাখি, (সজনী গো!)"

তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তাঁহার সুন্দর বদন বাহিয়া পরিসর ধারা পড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও বদন কমনীয় হইল। একটু পরে শান্ত হইয়া বলিতেছেন, "এই ঠিক আমি ইহার চাই। আমি এ সম্পত্তি কিরূপে পাইব, তাহারই নিমিত্ত ঘুরিয়া

বেড়াইতেছি।” যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট, তাহা প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। সদ্যোজাত শিশুর মুখে এক বিন্দু তিক্ত দিলে সে কান্দিয়া উঠিবে, আর এক বিন্দু মধু দিলে চাটিতে থাকিবে। তাহাকে আর একথা বুঝাইতে হয় না যে, এই বস্তু তিক্ত, এ বস্তু মিষ্ট। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কখনই বুঝাইতে পারিতাম না যে, যে ভক্তি-ধর্ম্ম বলিয়া একটি সামগ্রী আছে যাহা অতি মধুর, অতি সরল ও অতি তেজস্কর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিত। তবে আমি করিলাম কি, না, তাঁহার বদনে ভক্তিধর্ম্মরূপ মধু এক বিন্দু দিলাম। তিনি চাখিলেন, আর বেশ! বেশ! বলিয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

শ্রীভগবানের সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। আম্র দেখিতে সুন্দর ইহার গন্ধ সুন্দর, আস্বাদও সুন্দর। সেইরূপ ভক্তিধর্ম্ম যাজন যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার কয়েকটি সহজ লক্ষণ বলিতেছি। শ্রীভগবান অর্থাৎ একজন যে কর্ত্তা আছেন, ইহা মনুষ্যমাত্রেরই মনের অটল ভাব। যাঁহারা মুখে বলেন শ্রীভগবান্ নাই, তাঁহারা অন্তরে বলিতে পারেন না। কারণ যেমন মস্তক না থাকিলে জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবান্ আছেন, এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে, মনুষ্যের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। সার কথা, যখন শ্রীভগবান্ আছেন, এই ভাব মনুষ্যমাত্রকে স্বভাব দিয়াছেন, তখন অবশ্য শ্রীভগবান আছেন। দ্বিতীয়তঃ, জীব দিবানিশি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছে। সেই নিমিত্ত জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে চুপ করিয়া থাকে না। প্রথমে নিজে নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। যখন না পারে, তখন হতাশ হইয়া কান্দিয়া বলে, “হে শ্রীভগবান রক্ষা কর।” যদি শ্রীভগবান রক্ষা-কর্ত্তা না হইতেন, তবে স্বভাব মানুষ্যকে “ত্রাহি মাং রক্ষ মাং” ভাব দিতেন না। ইহাতে কি বুঝিলাম, না—“হে শ্রীভগবান্! তুমি আমার আশ্রয়। আমি দুর্ব্বল জীব, বিপন্ন, আমাকে

রক্ষা কর।” এই ভাব স্বাভাবিক, আর ইহাকে ভক্তিধর্ম্ম বলে। লোক যাহাকে শঙ্করাচার্য্যের মত বলে, তাহা ইহার বিপরীত। অতএব ভক্তি বলিয়া একটি মানসিক বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তি আলোচনা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কাজেই উহা আলোচনায় সুখ আছে। লোকে তাই ভক্তির সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং পাইলে কৃতার্থ হয়। এইরূপে কেহ স্বামীকে, কেহ গুরুকে, কেহ রাজাকে, আপনার ভক্তিটুকু দিয়া সুখ ভোগ করেন।

ত্রিপুরার মহারাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট। সরস্বতী বরপুত্র যদুভট্ট তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাম্বুরা লইয়া সুস্বরে তান লয় মিলাইয়া তিলোক-কামোদ রাগিণীতে নিজ-কৃত এই গীতটি গাইয়া মহারাজের স্তুতি করিতেছেন। যথা—

জয়তি ত্রিপুরেশ্বর দয়াল বীরচন্দ্র, গুণী-জন প্রতিপালক,
তোমা সমান দাতা কই নহি রাজা।

এই গীত শুনিয়া মহারাজের হৃদয় দ্রব হইল; গাইতে গাইতে যদুভট্টের হৃদয় আরো দ্রব হইল; তখন উভয়ে উভয়ের রসে পরিপ্লুত হইলেন। মহারাজ ভক্তিরূপ সুধা গ্রহণ ও ভট্ট উহা প্রদান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। উপরে ভক্তির ছবি দিলাম; এখন সিংহাসনে সামান্য রাজার স্থানে যদি রাজার রাজাকে, আর যদুভট্টের স্থানে একজন ভক্তকে বসাও, তাহা হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির একটি নিদর্শন পাইবে এবং ভক্তি-ভজন কিরূপ মধুর তাহাও বুঝিবে; তবে ভক্তি-ভজন অপেক্ষা প্রেম-সাধন আরো মধুর লাগিবে।

তবে ভক্তি-আলোচনার সুখে একটি বাধা আছে। ভক্তির পাত্র মাত্রেই প্রায় মলিন ও স্বার্থপর। এইজন্য পতিব্রতা স্ত্রী পতির এবং শিষ্য গুরুর মলিনতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়া ক্লেশ পান। সুতরাং ভক্তি

হইতে তখনই অখণ্ড সুখোৎপত্তি হয়, যখন উহা শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। যেহেতু তিনি দোষশূন্য ও গুণময়। অতএব হে মূর্খ-জীব! শ্রীভগবান্ না থাকিলে স্বভাব কি কখন ভগবদ্ভক্তি দিতেন? স্বভাব জীবকে ভগবদ্ভক্তি দিয়াছেন বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে শ্রীভগবান্ আছেন। জীবের আনন্দের একটি প্রস্রবণ প্রেম, আর একটি ভক্তি। তাই শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং," কি "তুমি কৃপাময় ও পবিত্র" কি "তুমি নয়নানন্দ" ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিয়া আনন্দভোগ করিবার নিমিত্ত জীবকে ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন।

তাহার পর, ভক্তি-চর্চ্চা যে মানুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার আরো কারণ বলিতেছি। গোপীগণ কি আয়োজনে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, দ্বিতীয় খণ্ডের মঙ্গলাচরণে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তি-ধর্ম্ম যাজন করিবার উপকরণগুলি একবার স্মরণ করুন। যথা, পূর্ণিমানিশি, বৃন্দাবন, কুসুম-কানন, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি। ইহা যাজন করিলে দেহের বাহ্য-সৌন্দর্য্য ও প্রতি অঙ্গ লাবণ্যময় হয়। যিনি যাজন করেন, তাঁহার নয়ন মনোহর, গলার স্বর মধুর ও হৃদয় কোমল হয়। সুতরাং তাহাতে তাঁহার জ্ঞানরূপ বীজ সহজে ফলবতী হয়, তাঁহার প্রকৃতি মধুর হয়, আর তাঁহার দশদিক সুখময় বোধ হয়।

উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রধান বিরোধী শঙ্করাচার্য্য। অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ যেরূপে ব্যাখ্যা করেন, উহা ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধী। তাঁহার তখনকার প্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ সরস্বতী, আর প্রভুর তখন প্রকাশানন্দকে উদ্ধার কার্য্য বাকী রহিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে এই কার্য্য সমাধা হয়।*

* যাঁহারা প্রকাশানন্দের উদ্ধার বিবরণ জানিতে উৎসুক তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার কৃত "প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট" গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

"তোরা আইরে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সঙ্কীর্ত্তন।
তোদের ভবের মেলা ধূলো খেলা, হারাসনে জীবন রতন।
তোদের গোলকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত-পাবন।"

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস লইয়া, ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিলেন এবং ভক্তগণ লইয়া সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর ভিক্ষা করেন, আর প্রায়ই সার্ব্বভৌম ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন! প্রভু অতি গোপনে বাস করিতেছেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা থাকেন, কেহ নিকটে আসিতে পারে না। প্রভুর মহিমা কাজেই নীলাচলবাসীরা ভাল করিয়া জানিতে পারিলেন না। তবে অবশ্য কিছু কিছু জানিলেন। সার্ব্বভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন। কথায় আছে গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাকে না। সার্ব্বভৌম আপনার দশা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পূর্ব্বে তাঁহার এক ভাব. এখন আর এক ভাব। পূর্ব্বে দাম্ভিক, এখন অতি বিনয়ী। পূর্ব্বে নীরস গভীর কঠিন; এখন সর্ব্বদা তরল চঞ্চল প্রফুল্ল মধুর ও পরোপকারী, এবং কথায় কথায় নয়নে জল আসিয়া, তাঁহার গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করে। পড়ুয়াগণ ইহা জানিল; আর ইহাও জানিল যে, এ সব নবীন সন্ন্যাসীর কার্য্য। সুতরাং এ কথা নীলাচলময় ব্যক্ত হইল যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এখন বড় ভক্ত হইয়াছেন। আর তাঁহার পরিবর্ত্তনের কারণ, একজন অতি সুন্দর নবীন-বয়স্ক সন্ন্যাসী। কিন্তু তবু নীলাচলবাসী কেহ প্রভুকে দেখিতে আসিলেন না। তাহার নানা কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, পুরী [illegible] সাধু ও সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ, কে কাহার তল্লাস লয়।

প্রভু নীলাচলে দোল দেখিলেন, সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন; পরে এক দিবস ভক্তগণকে লইয়া যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার চিরদিনেব বান্ধব; তোমাদের ঋণ শোধ দিব, এমন আমার কিছুই নাই। তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে নীলাচলচন্দ্র দেখাইলে, এখন সেইরূপ কৃপা করিয়া আমাকে দক্ষিণ-দেশে যাইতে অনুমতি কর। শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষিণ দেশে যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আরও বলিলেন, তুমি নীলাচলে বাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন আবার নীলাচল পরিত্যাগ করিবে কেন?" প্রভু বলিলেন, "আমার দাদা প্রায় বিংশতি বৎসর হইল অনুদ্দেশ হইয়া দক্ষিণদেশে গমন করেন। আমি এতদিন তোমাদের ও জননীর গাঢ় অনুরাগে তাঁহার তল্লাস লইতে পারি নাই। এখন আমি তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছি। কাজেই আমার এখন প্রথম কর্ত্তব্য তাঁহার তল্লাস করা।"

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিব। বিশ্বরূপ পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুরে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে অদর্শন হন। শিবানন্দ সেন উহা জানিতে পান। তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপুর পিতার মুখে সেই ঘটনা শুনিয়া তাঁহার কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যথা—

যদা শ্রীবিশ্বরূপঃহসৌ তিরভূতং সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ॥
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা ভবন সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জর্জ্জাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত॥

তথা ভক্তমাল গ্রন্থে—

শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি। দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরিতে নিজ শক্তি। অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥

নিত্যানন্দ প্রভুতে এক শক্তি সঞ্চারিলা। ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিলা। শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা।

অতএব বিশ্বরূপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছোট ভাই নিমাইকে ত্যাগ করেন নাই। বিশ্বরূপ প্রথমে ঈশ্বরপুরীর দেহে প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে মন্ত্রদান করেন। দাদা ব্যতীত অপরের নিকট শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন ? তাহা হইলে যে তাঁহার মর্য্যাদায় ব্যাঘাত হয়। আবার ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বিশ্বরূপও শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া বৃন্দাবন হইতে একদৌড়ে শ্রীনবদ্বীপে চলিয়া আসেন। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশ্যে দক্ষিণদেশে গমন করিব !"

এখন 'শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূপ', এ কথার অর্থ কি ? আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অতি আশ্চর্য্য সুখপ্রদ কথাটির বহুতর প্রত্যক্ষ-প্রমাণ পাইতেছি। হে পাঠক ! পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রবণ করুন। মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাসী বিদুরের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলে, তিনি যুধিষ্ঠিরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া আপন দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে 'পরকায়া প্রবেশ' শক্তির কথা বহুস্থানে উক্ত আছে। সে কথার অর্থ এই। এই দেহটি একটি গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান, আর দেহ দ্বারা তিনি (জীবাত্মা) জড়জগতের সহিত পরিচয় করেন। জীবাত্মা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শ্রবণদর্শনাদি করিয়া জড়জগত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীব সৃষ্ট হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটি, তাঁহার দেহরূপ-গৃহ ভঙ্গ হইলে অন্যস্থানে গমন করেন। সে স্থান তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু জীবাত্মার গোচর, এই গেল

সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কোন পৃথকীকৃত জীবাত্মার এ জগতে কোন কর্ম্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা আছে। তখন তিনি কি করিবেন? তাঁহার দেহ নাই, সুতরাং জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। কাজেই তখন তাঁহার অন্যের দেহের সাহায্য লইতে হয়। ইহাকে বলে "ভূতে পাওয়া", কি সাধু ভাষায় "আবেশ"। এইরূপে সুরাসক্ত ব্যক্তি পরকালে মদ্য না পাইয়া, অথচ মদ্যের লোভে অভিভূত হইয়া, তাহার পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি করিবার নিমিত্ত, মদ্যপায়ীর দেহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। আর এইরূপে দেহশূন্য-জীব তাহার শোকাকুল নিজজনকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করে। "চেষ্টা করে" একথা উপরে বারবার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টা করে, কিন্তু সহজে কি সর্ব্বদা পারে না। দেহশূন্য জীব মনে করিলেই যদি কাহারো দেহে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে আর লোকের সংসারযাত্রা সর্ব্বদা নির্ব্বাহ হইত না। দেহশূন্য জীব জীবিত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ব্বদা পারে না, কখন কখন পারে। কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি তোমার ঘরে বাস করিতেছ। সেখানে যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তবে তোমার সম্মতি লইয়া, কি জোর করিয়া, কি তোমার নিদ্রিত অবস্থায় তোমাকে লুকাইয়া, তাহার যাইতে হইবে। সেইরূপ কোন দেহশূন্য জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিয়া এবং তোমাকে কোণ-ঠাসা করিয়া আপনি তোমার দেহটি লইয়া আমোদ করিবে,— এরূপ বন্দোবস্তে তুমি কখন সম্মত হইতে পার না। কাজেই যদি কোন দেহশূন্য জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তুমি জানিতে পার না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার বিরোধী হইয়া

থাক, সে জন্য তোমার দেহ কেহ সহজে অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু কখন হয়তো তুমি সচেতন থাক না; তখন যে কেহ অনায়াসে চুপে-চুপে তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাই নিদ্রিত অবস্থায় কখন কখন দেহশূন্য জীবের সহিত পরিচয় হয়। কখন বা তুমি ইচ্ছা করিয়া আপনার দেহে দেহশূন্য জীবকে আসিতে আহ্বান কর। যেমন প্রেত-সাধন কি স্পিরিচুয়াল সার্কেল করা। কখন বা তুমি অন্যমনস্ক, কি অসাবধানে আছ, আর সেই ফাঁকে দেহশূন্য জীব তোমার শরীরে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকের যে ভূতাবেশ হয়, তাহা প্রায় এইরূপে। স্ত্রীলোকের বিরোধ-শক্তি অল্প। সেইজন্য কোন দেহশূন্য জীব হঠাৎ তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহশূন্য জীবের প্রেতভূমি ভাল লাগে না বলিয়া, সেখানে থাকিতে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা। এখন এ জগতে একটি দেহ পাইয়া সে আবার বাঁচিয়া উঠিল। উহা সে কেন ছাড়িবে? কাজেই নানা উপায়ে তাহাকে সেই দেহ হইতে তাড়াইতে হয়। ইহাকে বলে "ভূত-ছাড়ান"।

আবার কোন কোন দেহশূন্য জীব শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তবে তাঁহারা মহৎ লোক, বিশেষ কারণ ব্যতীত স্বার্থের নিমিত্ত অন্য দেহে বল পূর্ব্বক প্রবেশরূপ কুকর্ম্ম কেন করিবেন?

দেহ ভঙ্গ হইলে জীব দেহশূন্য হইয়া অন্যস্থানে গমন করে। আবার যোগ বলে কেহ আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিতে, ও আবার উহা দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। আত্মা দেহ হইতে বাহির হইলে, দেহ মরিয়া পড়িয়া থাকে; আবার দেহে প্রবেশ করিলে বাঁচিয়া উঠে। এইরূপে কেহ আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া, অন্য দেহেও প্রবেশ করাইতে পারেন। ইহাকেই বলে 'পরকায়া-প্রবেশ'। পরকায়া-প্রবেশ

দুইরূপ। (১) দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্য যোগবলে পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন, আর (২) মৃত ব্যক্তির আত্মাও পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন। দেহ-স্বামীর সহিত, দেহশূন্য আত্মা-অতিথির চারি প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে। প্রথম, কোন দেহশূন্য-জীব অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন, দেহ-স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিলেন না, এবং তিনি যে সেখানে আছেন তাহাও জানিতে দিলেন না; যেমন বিদুর তাঁহার দেহ জীর্ণ হওয়ায় আর উহাতে বাস করিতে পারিতেছিলেন না, অথচ পৃথিবীতে আর কিছুকাল কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হইল। তাই নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন; অথচ যুধিষ্ঠির তাহা জানিতে পারিলেন না। এইরূপে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেহশূন্য-জীব চুপে-চুপে অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে গোপনে বাস করেন,—এত গোপনে যে দেহ-স্বামী পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন না। শিশুগণ, যাহাদের দৈবাৎ দেহ-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অথচ জগতে তাহাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা হয় নাই, তাহারা এইরূপে, তাহাদের ভ্রাতা, কি ভগ্নী, কি পিতা, কি মাতার দেহে চুপে চুপে বাস করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

দেহশূন্য-জীব, দেহী-জীবের সহিত আরও কয়েক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকে। (১) দেহশূন্য-জীব দেহ-স্বামীর দেহে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে;—কতক পারিতেছে, কতক পারিতেছে না। (২) দেহশূন্য-জীব কাহারও দেহে প্রবেশ করিয়া কখন সম্পূর্ণ অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে। (৩) দেহশূন্য-জীব অন্যের দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, আর ছাড়িয়া দিতেছে না; আর যাহার দেহ, তাহাকে কোণ-ঠেলা করিয়া

আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন এই কয়েক প্রকার পরকায়া-প্রবেশের কথা বিবরিয়া বলিতেছি।

(১) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়া চুপে-চুপে বাস করিতে লাগিল, দেহ-স্বামী তাহা জানিতে পারিল না। (২) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দেহটি সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিল না। (৩) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল ও দেহটি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। এইরূপে ইচ্ছামত দেহটি অধিকার করে, ইচ্ছামত ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটি এইরূপ আবেশের ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। (৪) আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া দেহ-স্বামীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনি দেহটি অধিকার করিয়া বসিল, আর তাড়াইয়া না দিলে ঐ স্থান ছাড়িল না। ইহাকে "ভুতে পাওয়া" বলে।

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখা হইল, তিনি তাহার এক আখরও বিশ্বাস করেন না। আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না। যেহেতু এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি। তুমি পশু-জীবন না দেব-জীবন যাপন করিবে? অর্থাৎ পশুর মত খাইলাম, নিদ্রা গেলাম ও মরিয়া গেলাম,—ইহাই করিবে; না, পশুত্ব অপেক্ষা অন্য কোন সম্পত্তি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিবে? যদি তোমার পশু-জীবন ব্যতীত অন্যরূপ জীবনে স্পৃহা থাকে, তবে অগ্রে তোমার মলিন চিত্ত-দর্পণকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা কর, সাধন-ভজন কর ও সাধুসঙ্গ কর। তাহা হইলে ক্রমে তোমার চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে। তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি দেখিতে পাও না, তাই বলিয়া যাহারা বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথা দম্ভের সহিত উড়াইয়া

না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্য সৃষ্টি অনুশীলন ও অনুসন্ধান কর। তাহা হইলে সেই কারিগর-শিরোমণির অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে। তখন আর এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না। তবে তোমার যাহাতে এই কথাগুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত দুই-একটি কথা বলিব। যে কথা সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে, তাহা যে অমূলক হইতে পারে না, ইহা বিজ্ঞলোকের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই উপরে যে আবেশের কথা বলিলাম, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসময়ে,—কি অসভ্য বর্ব্বর, কি সুসভ্য জাতির মধ্যে,—দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ। বাইবেলে এই আবেশের কথা লেখা আছে; মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট হইতেন; বুদ্ধদেবের ও হিন্দুদের ত কথাই নাই।

যখন ইউরোপের মেস্মেরিজমের কথা প্রথম শুনিলাম, তখন আমরা উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম; ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়া রোগ আরাম করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন মেস্মেরিজমের প্রক্রিয়া দেখিলাম, তখন জানিলাম উহা ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানোর মত। অগ্রে মেস্মেরিজম মানিতাম না, মন্ত্রদ্বারা ঝাড়ানও মানিতাম না। পরে এই দুইরূপ প্রক্রিয়াই মানিতে বাধ্য হইলাম। দেখিলাম, মেস্মেরিজমে গাত্রে হস্ত বুলায়, ফুৎকার দেয়, আর রোগীকে বলে, "বল, নাই।" পূর্ব্বে ঝাড়ানতেও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম যে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ-আরোগ্যের পদ্ধতি দুই স্থানে দুই সময় অবলম্বিত হইত না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই পরকায়া-প্রবেশের কথা শাস্ত্রে দেখিতাম,

শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়,—বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, খ্রীষ্টিয়ান-শাস্ত্রে ও মুসলমান-শাস্ত্রেও বটে। পরে, ঠিক এই কথা, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেও উঠিল। তাহার পরে, আমরা যখন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিলাম, এবং দেখিলাম, উহাতেও কেবল ঐ কথা,—তখন বিস্মিত হইলাম, ও ভাবিলাম, এই আবেশ সত্য না হইলে উহা সর্ব্বদেশের মহাপুরুষগণ মানিতেন না। তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতপ্রেত লইয়া, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কাণ্ড দেবদেবী, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান লইয়া।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরকাল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, উহাই সাধন-ভজনের ভিত্তিভূমি। পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে নাস্তিক বা কুকর্ম্মান্বিত হয়, ও দুঃখে অভিভূত হয়। পরকালে বিশ্বাস হইলে শ্রীভগবানে বিশ্বাস হয়, আর জীব জগতের দুঃখে কাতর হয় না। পুত্র-শোক বড় দুঃখ; কিন্তু যদি পুত্রের সহিত আবার মিলন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে শোকে বেশী কাতর করিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যের যে কোন দুঃখ হউক, যদি পরকালে বিশ্বাস থাকে, তবে সে দুঃখ সহ্য করা সহজ হয়। পরকালে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট মৃত্যু অতি প্রিয়-সুহৃদ, আর দুঃখ তৃণের ন্যায় তাচ্ছিল্যের সামগ্রী। কাজেই পরকালে বিশ্বাসই মনুষ্যের সুখের ভিত্তিভূমি। তাই আমি এ কথা একটু বিস্তার করিয়া বিচার করিতেছি।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিলাম যে, এই পরকায়া-প্রবেশের কথা সর্ব্বশাস্ত্রে যেরূপ আছে এবং আমেরিকায় যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে, উহাতেও তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। গৌরাঙ্গ-লীলার প্রমাণগুলি দেখিলে সেগুলি যে সত্য, তাহা আপনা-আপনি মনে বিশ্বাস হয়। এমন কি, আমেরিকার কাণ্ডগুলি যদিও এ কালের কথা আর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কথা চারি শত বর্ষেরও পূর্ব্বের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ

অপেক্ষা-শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-ঘটিত প্রমাণগুলিই বলবৎ বলিয়া মনে হয়। কেন, তাহার কারণ বলা বাহুল্য। প্রথমতঃ ঘটনাগুলি শুনিলেই বুঝা যায় যে, উহা কল্পনার কথা নয়, এবং আপনা-আপনি মনে বিশ্বাস হয়। কোন ঘটনা সত্য কি অসত্য, তাহার ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর নাই যে, শুনিলেই মনে বসিয়া যায়। আমেরিকায় এই আবেশ লইয়া কেবল ছাইপাঁসের আলোচনা হয়, কিন্তু গৌরলীলায় ইহা দ্বারা মনুষ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সাধুপুরুষ। তাঁহাদের নাম-স্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। আর তৃতীয়তঃ, যাঁহারা ঐ লীলা লিখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন বলিয়া জানিতেন। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে কখন সাহস করিতেন না। এবং তাঁহার লীলা লিখিতে, কোন আনুমানিক কথা লেখা যে মহাপাপ, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার নিজের কাহিনী এইরূপে বলিয়াছেন। তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, তাহাতে তদ্দণ্ডে তাঁহার সংস্কৃত-ভাষা-জ্ঞান ও কবিত্ব স্ফূর্ত্তি হয়। যদিও তখন তিনি কিছুমাত্র-সংস্কৃত জানিতেন না, তবু অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ মাত্র একটি শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর তাঁহার গৌরাঙ্গ-লীলা-ঘটিত "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নামক অপরূপ নাটক সমাপ্ত করিয়া বলিতেছেন, যথা—

যস্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থী কৃত ইহ সময়োৎকীর্ত্ত্য তস্যাবতারম্।
যৎ কর্ত্তব্যং মমৈতৎকৃতমিহ সুধিয়ো যেঽনুরজ্যন্তি তৎমী,
শৃণ্বন্ত্বাম্রমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু॥

প্রেমদাস কর্ত্তৃক এই শ্লোকের অনুবাদ—

যত্নুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে, ইচ্ছা হইল কাব্য রচিবারে।
বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীলা বর্ণে সুখে, দ্বার মাত্র করিয়া আমারে ॥
আমার কর্ত্তব্য যেই, তা আমি করিল এই, সুবুদ্ধি হয়েন সেই জন।
ইথে অনুরাগ তার, গৌরলীলামৃত সার, নিরবধি করুন শ্রবণ ॥
গৌরলীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিচারিনু সত্য এই না কহি কল্পন।
ইথে রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার, তার মুখ না দেখি কখন ॥

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের আর একটি শ্লোক :—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং,
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎ প্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যৈকশেষং গতে,
কো জানাতু শৃণোতু কন্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্ ॥

প্রেমদাস কর্ত্তৃক ইহার অনুবাদ—

শ্রীচৈতন্য-কথামৃত, দেখিনু শুনিনু যত, কোটি গ্রন্থে না যায় বর্ণন।
অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তাঁর কৃপা পাঞা, কিছু মাত্র করিল লিখন ॥
গৌরপ্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল, স্মৃতি পথে গেল তারা সব।
পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা, অন্য কেবা জানিব শুনিব ॥
অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি, অন্তর্ব্বাহ্য তোমাতে গোচর।
যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞা তুমি, প্রীতি হবে আমার উপর ॥

হিন্দুগণ কখন শপথ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইংরাজ অধিবাসীগণ তাহা বেশ জানেন। কেন চাহেন না, পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া একটি মিথ্যাকথা বাহির হয়। কবিকর্ণপুর পরমভাগবত, হিন্দু হইয়া ও কৃষ্ণের নাম লইয়া, এইরূপ কঠোর শপথ করিয়া, তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিতেছেন যে, "যদি তিনি সত্য বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইবেন।" অর্থাৎ যদি মিথ্যা লিখেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিমাই যে কৃষ্ণলীলা, অর্থাৎ দানলীলার যাত্রা করিলেন, সেই লীলা বর্ণনা করিবার সময় কর্ণপুর বলিতেছেন যে, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রজের পরিকর একে একে প্রবেশ করিলেন। যথা, শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীগদাধরের দেহে ললিতা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই-বুড়ী। অদ্বৈতের বয়স তখন পঞ্চাশ-বর্ষ, কিন্তু তাঁহাকে পঞ্চদশ-বর্ষীয় নবীন যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে; এমন কি, দেখিতে ঠিক কৃষ্ণের মত। কবি-কর্ণপুর বলিতেছেন যে, শুদ্ধ বেশে যে অদ্বৈতকে ওরূপ দেখা যাইতেছিল তাহা নয়, কারণ কেবল বেশে ওরূপ আমূল, আন্তরিক ও বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তবে অদ্বৈতের ঠিক কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইবার কারণ এই যে, তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা—

"এহো ত অদ্বৈত নহে বুঝিনু নিশ্চয়। বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়? কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি কৈল আবির্ভাব।" (প্রেমদাসের চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ।)

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই কৃষ্ণযাত্রা বর্ণিত আছে। পাঠকমহাশয় এই দানলীলা পাঠ করিয়া দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তাহার পরে কি লীলা হইল, তাহা নরলোককে দেখিতে দিবেন না বলিয়া, ব্রজের সমুদায় পরিকর অন্তর্দ্ধান করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই-বুড়ী, গেলেন; রহিলেন,—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রীগদাধর ও শ্রীনিতাই।

এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে কিছু অনুবাদ করিযা দেখাইতেছি। মৈত্রী ও প্রেমভক্তিতে কথা হইতেছে। মৈত্রী প্রভুর দান-লীলার কথা শুনিতেছেন, আর প্রেমভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। অদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই-বুড়ী প্রবেশ করিয়া দান-লীলা করিতেছেন।

প্রেমভক্তি বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলে, বড়াই-বুড়ী কোপাবিষ্ট হইয়া রাধাকে লইয়া অন্তর্ধান হইলেন। তখন নিত্যানন্দ নিজরূপ ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

মৈত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? বড়াই-বুড়ী গেলেন কোথা, আর শ্রীনিত্যানন্দই বা কিরূপে আসিলেন?"

প্রেমভক্তি বলিলেন,- "বড়াই-বুড়ী নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লীলার শেষাংশ কাহাকেও দেখাইবেন না বলিয়া, তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন, কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। সে কিরূপ বলিতেছি। যেমন জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা তপ্ত হয়, আবার তাপ চলিয়া গেলে উহা পূর্ব্বকার মত শীতল হয়; সেইরূপ যখন বড়াই নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করেন, তখন একরূপ হইয়াছিলেন, বড়াই চলিয়া গেলে, তিনি আবার নিত্যানন্দ হইলেন।

এই ঘটনাটি দ্বারা পরকায়া-প্রবেশরূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং প্রকারান্তরে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা হইতে ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত দুই চারিটি ঘটনা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ শ্রীভগবানের, অতএব উহাতে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ হইতে পারে। আর সেই দেহে অক্রুর, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি প্রকাশ হইতেন। যে দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারির দেবগৃহে নর-বরাহ-আকার ধারণ করেন, সেদিন দেবগৃহে প্রভু প্রবেশ করিয়াই আপনা-আপনি বলিতেছেন, "একি! ইনি যে প্রকাণ্ড শূকরাকৃতি! ইনি যে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে আসিতেছেন!" ইহা বলিতে বলিতে—যেন বরাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত—পশ্চাৎ হটিতে হটিতে অচেতন হইলেন, এবং নর-বরাহাকৃতি হইয়া বিশাল গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলরাম-রূপে প্রকাশ হন, সে কাহিনী

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অমানুষিক বল ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেছেন না, প্রভু তখন কাহার প্রকাশ-রূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রভু যখন একটু চেতন পাইতেছেন তখনি বলিতেছেন, "আমার প্রাণ যায়।" প্রভুর এই চেতন অবস্থায় চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপ তোমার এ কি ভাব, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু প্রকারান্তরে এইরূপে তাঁহার তখনকার পরিচয় দিলেন, যথা (চৈতন্য-ভাগবতে)—

"হলায়ুধ (বলরাম) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।"

হয়ত কাহারও কাহারও হিন্দু-দেবদেবীর উপর বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বলরাম, কি মহাদেব, কি ব্রহ্মা প্রভৃতি যত দেবগণের নাম উল্লেখ আছে, উহা কেবল রূপক বর্ণনা। ইহারা প্রকৃত কেহ ছিলেন না, অতএব ইঁহাদের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এরূপ বলিলেও আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। যদি ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি শ্রীভগবানের রূপক-বর্ণনাই হন, তবে শ্রীভগবান্ সেই রূপক-রূপেই অন্যের দেহে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীহরিদাসের দেহে শ্রীব্রহ্মার প্রকাশ হইত। যদি পাঠক ব্রহ্মার পৃথক অস্তিত্ব না মানেন, এবং বলেন যে, ব্রহ্মা শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। শ্রীহরিদাসের যেরূপ দেহ, উহা শ্রীভগবানের এই ব্রহ্মারূপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, তাই হরিদাসের দেহে তিনি ব্রহ্মারূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মাকে রূপক-সৃষ্টি বলিলেও 'পরকায়া প্রবেশ' সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের উদ্দেশ্য, এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে জীবের যে প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্মের উপদেশ আছে, উহা কি, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া।

কেহ কেহ হয়ত শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা আছে, উহা রূপক-বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত তাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায়, এই রূপক বর্ণনা কি, তাহা বিবরিয়া বলিয়াছেন। এই লীলা যাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা উত্তমাধিকারী; আর যাঁহারা রূপক-বর্ণনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অধম-অধিকারী। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বলিতে পারেন যে, "বড়াই-বুড়ী, কি বৃন্দাদেবী, কি ললিতা,—ইঁহারা প্রকৃত কোন বস্তু নহেন, রূপক-বর্ণনা মাত্র। তবে ইঁহারা কোথা হইতে আসিলেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রার দিবসে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করিলেন?" দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের বিশ্বাস কিছু মৃদু, তাঁহারা ইহা মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ সেই রূপক অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের নিগূঢ়-রস কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক একখানি নাটক আছে। তাহাতে যে সমুদায় ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে,—যথা বিবেক, অধর্ম্ম, বিদ্যা ও উপনিষদ,—উহা মনঃকল্পিত, তাহা সকলে জানেন। এই নাটকখানির উদ্দেশ্য জীবকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া। মনে ভাব, তোমরা কয়েকজন, কেহ দয়া, কেহ ধর্ম্ম সাজিয়া, সেই নাটক অভিনয় করিয়া সভ্যগণকে দেখাইলে; পরে আপনাপন স্বাভাবিক আকার ধারণ করিলে। যে সকল ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা রূপক মনে করেন, তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ ব্রজের নিগূঢ়-রস বুঝাইবার নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তের মধ্যে যাঁহার দেহ যেরূপ উপযোগী, তাঁহার দেহে সেইরূপে প্রকাশ পাইলেন। কি ইহাও হইতে পারে যে, কোন গোলকবাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্রকৃতি শ্রীললিতার ন্যায়, আবার গদাধরের প্রকৃতিও ললিতার ন্যায়। পূর্ব্বোক্ত জন তাই ব্রজের নিগূঢ়রস বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদাধরের দেহে ললিতারূপে প্রবেশ করিলেন।

বন্ধু ও এক দেশস্থ, এবং নবদ্বীপের এক স্থানে বাস করিতেন। কাজেই তিনি প্রভুর সমুদায় আদিলীলা প্রত্যক্ষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন যে, নবম বর্ষ বয়সে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত হইল। তিনি নিয়মানুসারে গোপনীয় স্থানে বসিয়া ছিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা তিনি তাঁহার কড়চার প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ, ১৮ হইতে ২৪ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

ততঃ কদাচিন্নিবসন্ স্বমন্দিরে সমুদ্যদাদিত্যকরাতিলোহিতঃ।
স্বতেজসাপূরিতদেহ আবভৌ উবাচ মাতর্ব্বচনং কুরুষ্ব মে ॥ ১৮ ॥

তাহার পরে নিজ মন্দিরে বাস করিতে করিতে কোন দিন শ্রীমহাপ্রভু সমুদিত সূর্য্যকর অপেক্ষা অধিক লোহিত বর্ণ হইলেন ও নিজ তেজঃ দ্বারা পরিপূরিত দেহ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই সময় জননীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে মাতঃ! আমার একটি কথা প্রতিপালন কর।"

তথা জ্বলন্তং স্বসুতং স্বতেজসা বিলোক্য ভীতা তমুবাচ বিস্মিতা।
যদুচ্যতে তাত করোমি তত্ত্বায় বদস্ব যত্তে মনসি স্থিতং স্বরম্ ॥ ১৯ ॥

সেই সময় স্বীয় ঐশ্বরিক তেজোযুক্ত নিজ পুত্রকে বিকোলন করিয়া শ্রীশচীদেবী ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "হে তাত! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। তোমার মনের কথা বল।"

তদিত্থমাকর্ণ্য বচোঽমৃতং পুনস্তাং প্রাহ মাতর্ণ হরেস্তিথৌ ত্বয়া।
ভোক্তব্যমাকর্ণ্য বচঃ সুতস্য সা তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টবৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীমহাপ্রভু জননীর এই প্রকার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া পুনরপি কহিলেন, "হে মাতঃ! তুমি আর শ্রীহরিবাসরে ভোজন করিও না। শ্রীশচীদেবী প্রহৃষ্টবৎ "তাহাই করিব" বলিয়া এই বাক্য গ্রহণ করিলেন।

নিবেদিতং পুগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাম্।
ব্রজামি দেহং পরিপালয়স্ব সুতস্য নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্দ্ধম্ ॥ ২১ ॥

তাহার পরে এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিবেদিত পুগ (গুবাক) ফলাদি আহার করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, "হে মাতঃ! আমি চলিলাম তোমার পুত্রের নিশ্চেষ্টগত দেহ প্রতিপালন কর।"

ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চাপতদ্ভূবি।
বিশ্বম্ভরং গতং দৃষ্ট্বা মাতা দুঃখসমন্বিতা॥ ২২॥

এই কথা বলিয়া সহসা উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। জননী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া দুঃখ সমন্বিত হইলেন।

স্নাপয়ামাস গাঙ্গৈয়েরমৃতকল্পকৈঃ।
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোঽসৌ ভূত্বা স হ্যবসৎ সুখী॥ ২৩॥

তৎপরে অমৃততুল্য গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন। তাহাতে প্রভু চৈতন্য লাভ করিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক তেজযুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

তেজসা সহজেনৈব তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতোঽভবৎ।
জগন্নাথোঽব্রবীচ্চৈনাং দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে॥ ২৪॥

তাহা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীশচীদেবীকে বলিলেন, "দৈবমায়া বুঝিতে পারিলাম না।"

স্ত্রীলোকের ভূতে পাওয়ার কথা যে শুনা যায়,—কেহ কেহ এরূপ ঘটনা দর্শন করিয়াও থাকিবেন,—উপরের কথাটি ঠিক সেইরূপ। ভূতগ্রস্ত স্ত্রীলোক হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্যের ন্যায় কথা বলিতে থাকে, এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'আমি' অমুক। তাহার পর ভূত ছাড়ান হয়, কি ভূত আপনি ছাড়িয়া যায়। ভূত ছাড়িয়া গেলে স্ত্রীলোকটি অচেতন হইয়া পড়ে। তখন তাহার মুখে ও কপালে শীতল জলের ঝাপ্টা দেওয়া হয় ও তাহাকে ডাকা হয়। সে ক্রমে সহজ অবস্থা পায়। শ্রীমুরারির কাহিনী অনুসারে নিমাইয়ের ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

ভগবান্ প্রকট হইবার পরও শ্রীগোরাঙ্গকে অদ্বৈত এইরূপ ভূতগ্রস্ত ভাবিতেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে :—

"অদ্বৈত বলেন ভূত আবেশ যে করে। তাতে আর কৃষ্ণাবেশ সম ভাব ধরে॥"

মনুষ্য যদি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করে, তবে উহা অনেক সময় পরস্পরে বিরোধী হয়। রাজা প্রজা-শাসনের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম করিলেন, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে, নিয়মগুলি মাঝে মাঝে পরস্পরে বিরোধী হয়। কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরূপ হয় না, সমুদায় নিয়মে পরস্পরে সামঞ্জস্য আছে। এমন কি, এই নিয়মগুলি একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বই দুইজন নয়, আর তিনি জ্ঞানময়। তাঁহার নিয়মের এরূপ সামঞ্জস্য যে, একটি প্রক্রিয়া দেখিলে অন্য প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়। একটি গ্রহের গতি দেখিলেই বুঝা যায় যে, অন্য গ্রহের গতি কিরূপ। একটি জীবের সন্তানোৎপত্তি পদ্ধতি দেখিলে জানা যায়, অন্য জীবের সন্তানোৎপত্তি নিয়ম কিরূপ। ফলা কথা, শ্রীভগবানের নিয়ম অকাট্য. তাহাতে জটিলতা মাত্র নাই। আর নিয়মাবলীতে পরস্পরে অসামঞ্জস্য হইতে পারে না।

এখন মনে ভাবুন, ভূতে পাওয়া প্রক্রিয়াটি সত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই পরকালে কোন মলিন জীব, এ জগতের কোন জীবের দেহে প্রবেশ করিয়া, এ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে শ্রীভগবানের নিয়মানুসারে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র দেহে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারিবেন। এমন কি, অতি পবিত্র দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্মা, এমন কি শ্রীভগবানের পার্ষদ পর্য্যন্ত, সেই দেহে আশ্রয় করিয়া জড়জগতের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারেন। অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীবেদব্যাস

প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত এইরূপ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ উপযুক্ত দেহ পাইলে, জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্তি ধরেন। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে "করিতে শক্তি ধরেন," এরূপ কথা বলা এক প্রকার অন্যায়, এক প্রকার অন্যায়ও নয়। যেহেতু যদিও তিনি সমুদায় পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার ন্যায় আপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ করেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে, অসংখ্য উপায়ে জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তবু তাহা না করিয়া, চিন্ময়দেহধারী আত্মাগণ সম্বন্ধে যে যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজেও চিন্ময় বলিয়া, সেই সেই উপায় অবলম্বনে জড়জগতের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত কার্য্য করিয়া নিজের নিয়ম নিজে কখন ভঙ্গ করেন না।

পাঠক, এখন অবতার প্রকরণ বুঝিয়া লউন। যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাঁহারা এখন দেখুন যে, অবতার ঘটনা অসম্ভব ত নয়, বরং অতি স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড়জগতের সহিত আংশিক রূপে যে সে দেহের দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইতে হইলে শ্রীমতী রাধার দেহের প্রয়োজন। ত্রিজগতে রাধারাণী ব্যতীত এরূপ আর কেহ নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের উপর আপাদ মস্তক স্থান দিতে পারেন।

যদি বল, রাধা কে? রাধা শ্রীভগবানের প্রকৃতি। এই জগৎ শ্রীভগবানের প্রকাশ। ইহাতে,—কি জড়পদার্থ, কি জীবগণ,—সমুদায় পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত। অতএব শ্রীভগবানেরও পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব আছে। তাঁহার প্রকাশ যে জগৎ, তাহা যদি পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত হইল, তবে তিনিও তাহাই। সে যাহা হউক, যদি পারি তবে রাধার তত্ত্ব উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব।

অতএব যীশু শ্রীভগবানের একজন পরকালের উচ্চ বস্তু। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাই তিনি ভগবান্‌কে দাস্যভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ তিনি এই জগতের উপযোগী একটি দেহ অধিকার করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করেন। ঐরূপ মহম্মদও একজন পূর্ব্বকালের উচ্চ বস্তু। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শ্রীভগবানকে সখ্য-ভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ জীবের নিকট সেইরূপ ভজনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটি উপযোগী দেহ আশ্রয় করেন। এখানে শ্রীগীতার এই শ্লোকটি স্মরণ করুন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্‌ ॥"

সেইরূপ নবদ্বীপে শ্রীভগবান্‌ উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া জীবের নিকট ব্রজের নিগূঢ়-রস,—যাহা পূর্ব্বে "অনর্পিত" ছিল, প্রকাশ করিলেন।

যীশু, কি মহম্মদ, কি গৌরাঙ্গ, কেহই মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। ইঁহারা স্পষ্ট করিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। যীশু আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া, এবং মহম্মদ তাঁহাকে আপন সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া, আপনাকে শ্রীপূর্ণব্রহ্মসনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার পূজা লইয়াছেন। রহস্য এই যে, যীশু এক দেশে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ অন্য দেশে শিক্ষা দিলেন। উভয়ে যে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও পরস্পরে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য; এমন কি, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মকে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের এক শাখা বলিলেও হয়। তবে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অতি মোটা, আর বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। এই যে যীশুর ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামঞ্জস্য, ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ যে, উভয়েই সত্য বস্তু।

উপরে উপবীতকালে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কাহিনী বলিলাম, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাহিনীটি যে সত্য, তাহার অকাট্য প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই, এবং এই সমুদায় বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ হইতেও পারে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যিনি অকাট্য প্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন-ভজন করুন, আপনা-আপনি অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তবু গোটা কয়েক কথা বলিব। মুরারি গুপ্তের বাড়ী প্রভুর বাড়ীর নিকট। এক দেশস্থ বলিয়া তাঁহার সহিত শচী ও জগন্নাথের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। মুরারি নিমাইকে ছোট বেলা কোলে করিয়া বেড়াইয়াছেন। মুরারি বৈদ্য, চিকিৎসা করিয়া সংসার চালাইতেন। প্রভু বরাহরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ হইলে, মুরারি তাঁহাকে শ্রীভগবান্-জ্ঞানে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেন। প্রভু পাছে তাঁহাকে ফেলিয়া গোলকে চলিয়া যান, এই ভয়ে প্রভুর অগ্রে মরিবেন বলিয়া তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ কাহিনী পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিলে, নদেবাসীরা তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। সেই সঙ্গে মুরারিও গিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে দামোদর পণ্ডিত গিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ জানেন। মুরারি নীলাচলে গেলে দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৈদ্যরাজ! হরিকথা কি জীবে জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌরহরির আদিলীলা কেবল তুমিই উত্তমরূপে অবগত আছ। জীবের উপকারের নিমিত্ত এই সময়ে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।" মুরারি ইহা স্বীকার করিলেন। কথা হইল যে, মুরারি প্রভুর লীলা-কাহিনী বলিবেন, আর দামোদর উহা সংক্ষেপে শ্লোকাবদ্ধ করিবেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন। ইহাই হইল "মুরারির কড়চা"।

প্রভুর বয়স তখন ২৮ বৎসর। তিনি গৃহের এক কোণে প্রেমানন্দে বিহ্বল, আর এক কোণে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া তাঁহার লীলাকথা লিখিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থে জ্ঞানতঃ কোন অলীক কথা থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আবার, যে কোন ধর্ম্মের যত প্রমাণই থাকুক, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার সম্বন্ধে মুরারির কড়চা যেরূপ প্রমাণ, এরূপ প্রমাণ বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট, কি আর কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে নাই।

অপর মুরারি যাহা বলিলেন, ইহা নূতন কথা নহে,—জগতের সর্ব্বস্থানে সকল সময়, এই আবেশের কথা লেখা আছে। মুরারি, মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানেন, সুতরাং প্রভুর সম্বন্ধে তাঁহার কোন মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা নাই। আর মুরারির ওরূপ কাহিনী কল্পনা করারও কোন স্বার্থ নাই, বরং স্বার্থের হানি আছে। সে কিরূপ বলিতেছি। প্রথম দেখুন, এই অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে প্রভু তখনি "গুপারি খাইলেন," এরূপ অসংলগ্ন কথা কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বলিতেছি। শ্রীজগন্নাথ বাড়ীতে নাই, নিমাই উপবীত লইয়া গুপ্তভাবে আছেন; এমন সময়ে তিনি জননীকে ডাকিলেন। জননী আসিয়া দেখেন যে, পুত্রের শরীর দিয়া লোহিত সূর্য্যের আলো বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে স্থান আলোকিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া শচী ভয় পাইলেন। নিমাই তখন শচীকে একটি আদেশ করিলেন। অমনি তিনি ভয়ে তদ্দণ্ডে তাহা স্বীকার করিলেন। পরে নিমাই সেই আবেশ অবস্থায় বলিলেন, "আমি চলিলাম। আমি চলিয়া গেলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, তুমি তাঁহাকে শুশ্রূষা করিও।" ইহাই বলিয়া নিমাই যেন প্রণাম করিতে গেলেন, এবং শচীও তাহাই ভাবিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন শ্রীভগবান্ লুকাইলেন; আর ভূতাবেশ ছাড়িলে যেমন জীব ঢলিয়া পড়ে,

নিমাইয়ের দেহ সেইরূপ ঢলিয়া পড়িল। জগন্নাথ তখন বাড়ীতে ছিলেন না, কাজেই শচী মহাব্যস্ত হইলেন; এবং মুরারিকে ডাকাইলেন। তিনি চিকিৎসক এবং তাঁহাদের আত্মীয় ও প্রতিবাসী। মুরারি আসিবার পূর্ব্বেই শচী পুত্রকে স্নান করাইয়া ও মুখে জলের ছিটা দিয়া চেতন করিলেন। মুরারি আসিয়া নিমাইয়ের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে শচী বলিলেন, "একটি গুপারি খাইয়া অচেতন হন।" মুরারি বলিলেন, "কিরূপে হইল বল দেখি?" তখন শচী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। মুরারিও দামোদরকে তাহাই বলিলেন, এবং দামোদরও সংক্ষেপে তাহা সূত্রে বদ্ধ করিলেন। তাহার পরে জগন্নাথ মিশ্র গৃহে আসিলেন, এবং সমুদায় শুনিয়া বলিলেন, "এ দেবতাগণের কাণ্ড আমি বুঝিতে পারিলাম না।" নিমাই তাঁহার ভগবান্-ভাব তাঁহার পিতাকে কখন দেখিতে দেন নাই।

"এ ঘটনা কল্পনা হইলে, কিম্বা মুরারির মনে কিছুমাত্র কল্পনার সন্দেহ থাকিলে, তিনি উহা বলিতেন না। কারণ ইহাতে প্রকারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় দোষ পড়িতেছে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান একজন মুরারি। তিনি যে কাহিনী বলিলেন, তাহাতে ভিন্ন-লোকে, এমন কি, নিজ-জনেও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ একজন সামান্য মনুষ্য, তবে শ্রীভগবান্ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে অতি স্বাভাবিক, তাহা মুরারির গ্রন্থের পরের শ্লোকেই প্রকাশ। মুরারি যেরূপ গৌরাঙ্গভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবী মানিতেন না, দামোদরও তাহাই। মুরারি উপরি-উক্ত কাহিনী বলিলে, দামোদর চমকিয়া উঠিলেন, একটু কষ্টও পাইলেন। উপরে ১ম প্রক্রম ৭ম সর্গের ২৪ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন ২৫ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন:—

ইতি শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরোদ্বিজঃ।
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণো জগদ্‌গুরু ॥২৫॥
জাতঃ কথং ব্রজামীতি পালয়স্ব সুতং শুভে।
ইতি মাত্রে কথং প্রাহ হেতস্মে সংশয়ো মহান্ ॥২৬॥
কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্তুং ত্বমিহার্হসি।
হরেশ্চরিত্রমেবাত্র হিতায় জগতাং ভবেৎ ॥২৭॥

এই দিব্য কথা শুনিয়া সন্দিহান হইয়া শ্রীদামোদর দ্বিজ শ্রীমুরারি গুপ্তকে কহিলেন, "হে ভদ্র! তুমি এ কি কহিলে? ইহাতে আমার মহা সন্দেহ হইল। জগৎ-পিতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কিরূপে মাতাকে কহিলেন, 'হে শুভে! আমি চলিলাম, তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর। হে ভদ্র মুরারি গুপ্ত! ইহা কি জগদীশ্বরের মায়া'?" অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই শ্রীভগবান্, তবে তিনি কিরূপে বলিলেন, তোমার পুত্রের দেহ সন্তর্পণ কর, আমি চলিলাম?" যথা কড়চার ১ম প্রক্রম ৮ম সর্গ :—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চিন্তয়িত্বা বিচার্য্য চ।
নত্বা হরিং পুনঃ প্রাহ শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥১॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিতের এই বচন শ্রবণ করতঃ চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীহরিকে প্রণতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "হে দামোদর পণ্ডিত। সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১।

জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি।
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ ॥২॥

শ্রীভগবদ্ধ্যান, কীর্ত্তন ও শ্রবণ হেতু সুমহাত্মা জনের হৃদয়ে শ্রীহরি প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।২।

তস্যানুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপরাক্রমম্।
দধাতি পুরুষো নিত্যমাত্মদেহাদিবিস্মৃতঃ ॥৩॥

শ্রীভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অনুকরণ করে এবং ভগবত্তেজ ও ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে এবং আত্মদেহাদি বিস্মৃত হয়।৩।

ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহ্যো ভবেত্ততঃ ॥
করোতি সহজং কর্ম্ম প্রহ্লাদস্য যথা পুরা ॥৪॥
তাদাত্ম্যোঽভূত্তোয়নিধৌ পূনর্দ্দেহস্মৃতিস্তটে।

তাহার পরে, পুনরায় বাহ্য হইয়া থাকে ও বাহ্য হইলে সহজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বে প্রহ্লাদের সমুদ্র মধ্যে তদাত্ম্য ও তটে বাহ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে প্রহ্লাদ যখন নিক্ষিপ্ত হন তখন শ্রীভগবন্ময় হইয়াছিলেন, আর তটে উঠিয়া আপনার সহজ অবস্থা পাইয়াছিলেন।

'ঈশ্বরস্তস্য সংশিক্ষাং দর্শয়ং শুচ্চকার হ।
লোকস্য কৃষ্ণভক্তস্য ভবেদেতৎস্বরূপতা ॥৬॥
যথাত্র ন বিমুহ্যন্তি জনা ইত্যভ্যশিক্ষয়ন্।

ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত-জনের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা হয়, ইহাতে লোক সকল যাহাতে ভ্রান্ত না হয়, তাহাও শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন।

ভক্তদেহ ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয় ॥৭॥

ভক্তদেহই ভগবানের আত্মা, ইহাতে সংশয় নাই।

'কৃষ্ণঃ কেশিবধং কৃত্বা নারদায়াত্মনো যশঃ।
তেজশ্চ দর্শয়ামাস ততো মুনিবরো ভুবি ॥৭॥
পপাত দণ্ডবত্তস্মিম্ স্থানে শতগুণাধিকম্।
ফলমাপ্নোতি গত্বা তু বৈষ্ণবো মথুরাং পুরীং ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ কেশিবধ করিয়া শ্রীনারদকে আপনার রূপ ও তেজ দর্শন করাইয়াছিলেন। তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়াছিলেন। মনুষ্য মথুরাপুরী গমন করিয়া সেই স্থানে (কেশি-তীর্থ) শত গুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

এবং রামো জগদ্‌যোনিবিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।
শিবায় পুনরেবাসৌ মানুষীমকরোৎ ক্রিয়ান্॥১০॥

এই প্রকার ভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীশিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া, পুনরায় মানুষী ক্রিয়া করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অনুভব করিয়া দেখুন। তিনি বলিলেন যে, ভক্তজনে কীর্ত্তনাদির দ্বারা হৃদয় এরূপ নির্ম্মল করিতে পারেন যে, স্বয়ং ভগবান্ উহাতে কখন কখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি ভক্ত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। তখন সেই ভক্ত আত্মবিস্মৃত হন, হইয়া ভগবানের ন্যায় কথা বলেন; এমন কি সেইরূপ ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। তাহার পরে শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, সেই ভক্ত আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। এই মুরারির কথা। তাহার পরে মুরারি বলিতেছেন, "শ্রীভগবান্ জীব-শিক্ষার নিমিত্ত শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কখন ভক্ত-ভাব, কখন ভগবান-ভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়া ভক্তি কি বস্তু তাহা জীবগণকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই লীলা দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন তিনি ভগবান্-ভাব প্রাপ্ত হন, তাই দেখিয়া যেন কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা না করে।"

মুরারি উপরি উক্ত ঘটনা যে-ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া কোন সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক হাস্য করিয়া বলিতে পারেন, "বৈদ্যরাজ! তাই যদি

হইল, তবে তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন ভক্ত বল না? তিনি ভক্ত-শিরোমণি ছিলেন, তাই শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া তাঁহাকে ক্ষণিক মাত্র ভগবত্ত্ব অর্পণ করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের স্থায় একজন মনুষ্য বই আর কিছু নয়।" যদি স্বীকার করা যায় যে, শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিয়া ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর ভগবত্তায় দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ সেবনই জীবনে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম।

কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, মুরারি যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উহা ভক্তগণের নিমিত্ত, বহিরঙ্গ লোকের জন্য নয়। বহিরঙ্গ লোকে ঐ প্রশ্ন করিলে মুরারি এই উত্তর দিতেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীভগবান্, তিনি তাহার শত সহস্র প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার বরাহ প্রভৃতি রূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহাপ্রকাশ এবং তাঁহার অন্যান্য প্রকাশ শত-শত বার দর্শন করিয়াছেন। আর তাঁহার নিজমুখেও বহুবার শুনিয়াছেন যে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তিনিই সকলের আদি। তিনি যে শচীনন্দন হইতে পৃথক বস্তু তাহা কখনও বলেন নাই। এবং শচীর উদরে তাঁহার যে দেহের উৎপত্তি সেই তাঁহার নিজ দেহ,—তাহা বারম্বার বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিতে চাহেন, তখন শ্রীপ্রভু তাঁহাকে বলেন, "এই গৌর-রূপই আমার প্রকৃত রূপ, আর এই রূপ অদ্বৈতেরও প্রিয়।" জগদানন্দকে তিনি নিজহস্তে আপনার গৌরগোবিন্দ বিগ্রহের পূজা করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই গৌর-মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুরারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, শ্রীভগবান

স্বয়ং প্রবেশ করিয়া প্রকাশ হয়েন, হইয়া ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়েন, এ কথা মুরারি বলিতে পারেন না। এরূপ যে কোথায় হইয়াছে তাহারও প্রমাণ নাই। প্রহ্লাদের ক্ষণিক অধিরূঢ়ভাব, অর্থাৎ তিনিই ভগবান্ এ ভাব, আর শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শ্রীপদ বাড়াইয়া গঙ্গাজল চন্দন ও তুলসী দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা গ্রহণ,—এই দুই ভাবে বহু পৃথক। অবশ্য ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপাল-আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যেন মুরলী বাদন করিতেছেন, কেহ-বা বাল-গোপাল আবেশে জানু-গতিতে চলিতেছেন,—প্রেমে ভক্তগণ এরূপ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসের ন্যায় ভক্ত ত্রিভুবনে আর হয় নাই। তাঁহারা অনেকে প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বড়। কৈ তাঁহারা কবে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আবেশিত হইয়া শ্রীভগবানের ন্যায় কথা কহিয়াছেন, কি ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন, কি পা বাড়াইয়া দিয়া শ্রীভগবানের পূজা লইয়াছেন? কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার আমূল তাহাই। শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া শ্রীনিমাই প্রফুল্ল বদনে ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গের আলোতে গৃহ বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষাও কোটি গুণ আলোকিত এবং অঙ্গ-গন্ধে দিগ আমোদিত হইয়াছে। শ্রীনিমাই কথা কহিতেছেন, আর যেন সুধা উগরাইতেছেন; আর বলিতেছেন, "আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমিই তোমাদের, তোমরা আমার।" আর কি বলিতেছেন?—না, "আমি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, ভক্তগণের আকর্ষণে জীবকে আশ্বাস দিতে ও ভক্তি-ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছি।" কৈ,—কবে কে এরূপ বলিয়াছেন বা করিয়াছেন? কোনও শাস্ত্রে বা কোনও দেশে এরূপ নাই। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক প্রভৃতি বহু অবতার জগতে প্রকাশ হইয়াছেন। কিন্তু কবে কোন্ অবতার শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া, শ্রীভগবানের

তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রীভগবান্ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, "বর মাগো" বলিয়া জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন? এরূপ ঘটনা কেহ কখন শুনেন নাই, অনুভবও করেন নাই।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়,—উহা জড়-পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট নয়। শ্রীভগবানকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করা যায় না; দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষু-গোচর দেহ ধারণ করিতে হয়। মনুষ্যের ধ্যান স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত এরূপ দেহ প্রয়োজন, তাই শ্রীভগবান্ চর্ম্মচক্ষু-গোচর দেহ ও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আকাশ-ধ্যান যে ভক্তের নিকট নিষ্ফল তাহা ভক্তমাত্রেই জানেন; আর যিনি ইহা বিশ্বাস না করেন, তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, ভক্তের ধ্যান জীবন্ত সামগ্রী।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ শ্রীভগবানের দেহ,—শুধু আধার নয়। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিঙ্গন করিলে তিনি ১০ম স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পড়িয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করিলেন। সে শ্লোকের অর্থ এই যে, "কোথা আমি দীন, আর কোথা তুমি শ্রীভগবান্; তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে!" মুরারির এই বাক্য শুনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কি বলিলেন, শ্রবণ করুন। যথা, চৈতন্য-চরিত ৭ম সর্গ,—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব ঐশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ॥ ১০১॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তৎকালীন ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ, অত্যুদ্ভট তেজের দ্বারা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া, শোভন আসনপোরি অধিষ্ঠানান্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১০১॥

ইদং শরীরং মনোজ্ঞং সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্যদ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে॥ ১০২॥

এবং কহিলেন, আমার শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্য, চিদ্‌ঘন ও আনন্দময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই ॥ ১০২ ॥

তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক বস্তু হইতেন, আর তাঁহার দেহটি শ্রীভগবানের না হইয়া একজন মনুষ্যের হইত, তবে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেন না যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," অর্থাৎ "আমাকে তোমার স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।" আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, সেই দেহের পদ, তাঁহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর মস্তকে দিতেন না। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এরূপ মূঢ়তার কার্য্য সম্ভব হয় না। শ্রীঅদ্বৈত দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথ-সুত যদি 'তিনি' হয়েন তবেই আমার মস্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মস্তকে পা দিয়া, শ্রীভগবান্ ইহাই প্রমাণ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন পৃথক বস্তু নন, আর শচীনন্দনের যে দেহ, উহা তাঁহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য সম্পর্কে শচী তাঁহার জননী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শচীর পিতা। আরো দেখাইলেন যে, যদিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পঞ্চম অধ্যায়

গৌরাঙ্গ কল্পতরু, অদ্বৈতাদি শাখা চারু, কীর্ত্তনে কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধু-লোভে অনুক্ষণ, আনন্দেতে ফিরে চারপাশ ॥

হরিনাম পত্র শোভে, স্নিগ্ধ সুমধুর ভাবে, কিবা সুশীতল তার ছায়া।
কলি-দগ্ধ জীব যত, পাপ-তাপে সান্তপিত, তার তলে আসিয়া জুড়ায়॥
অকৈতব প্রেমফল, রসভরে টলমল, খাইতে বড়ই মিঠে লাগে।
গল-লগ্নকৃত্ত বাস, হইয়ে উদ্ধব দাস, কাতরেতে সেই ফল মাগে॥

শ্রীবিশ্বরূপ নিত্যানন্দের দেহে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন; এমন কি, শচীর কখন কখন ভ্রম হইত—যেন নিত্যানন্দ তাঁহার সেই হারাণ পুত্র বিশ্বরূপ। সেই নিত্যানন্দের নিকট প্রভু বলিতেছেন যে, তিনি অনুমতি পাইলে তাঁহার দাদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন।

এখন বিশ্বরূপ যে জগতে নাই, তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? তাঁহাকে যাই ভাব, এ কথা তাঁহার না জানিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী সমেত সকলেই এ কথা জানিতেন যে, বিশ্বরূপ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুও ইহা জানিতেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন? শ্রীচরিতামৃত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা—

"বিশ্বরূপ অদর্শন জানেন সকল। দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাতেন এই ছল॥"

অর্থাৎ জীব-উদ্ধার ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার, প্রভুর একটি প্রধান কার্য্য। কিন্তু তাহা তিনি সহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না; এমন কি, বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ-দেশে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দক্ষিণদেশে গমন করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সংকল্প, তাই অনুমতি চাহিতেছেন। এ কথা বলিতে পারিতেন যে, শ্রীপাদ আমাকে অনুমতি কর, আমি দক্ষিণদেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে যাইব। কিন্তু প্রভু দৈন্যের অবতার। সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া দিবানিশি বলিতেছেন, "তোমরা ভক্ত, আমাকে কৃপা করিয়া বল,

আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।" তিনি কি মুখাগ্রে এই দম্ভের কথা আনিতে পারেন যে, "আমি দেশ উদ্ধার করিতে যাইব।" অথচ দক্ষিণদেশে উদ্ধার করিতে যাইতেই হইবে। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন; তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন, এই "ছল পাতিলেন"। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার দক্ষিণ-ভ্রমণের মধ্যে বিশ্বরূপের অনুসন্ধান বড় একটা দেখা যায় না, কেবল ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারই দেখা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "উত্তম কথা, আমরাও যাইব।" কিন্তু প্রভু বলিলেন, তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "কেন, আমাদের অপরাধ?" প্রভু বলিলেন, "তোমাদের গাঢ় অনুরাগ আমার প্রধান কণ্টক; আমি ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। আমার মনোমত কার্য্য করিতে গেলে, তোমাদের মনে দুঃখ দিতে হয়, তাহা আমি পারি না। ইহা বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাইব সংকল্প করিলাম, তুমি ভুলাইয়া আমাকে শান্তিপুরে আনিলে। দেখ, তুমি মধ্যবর্ত্তী না হইলে, আজ আমি কোথা থাকিতাম? আবার সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় দণ্ড; তুমি ইচ্ছা করিলে, আর আমার দণ্ডখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সন্ন্যাসী হইলাম। তোমরা ভালবাসিয়া এই সব কর, কিন্তু আমার কার্য্য নষ্ট হয়।"

শ্রীনিত্যানন্দ ভালমানুষ, ছোট ভাইয়ের দাস। তিনি উত্তর করিতে না পারিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "আমার অপরাধ কি?" প্রভু বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী। পদে আমি তোমা অপেক্ষা বড়, কিন্তু সন্ন্যাসের সকল নিয়ম আমি জানি না, স্মরণ রাখিতেও পারি না; আবার অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে, সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্তু তুমি সমুদায়

বিধি অবগত আছ ও পালন করিয়া থাক, সর্ব্বদা আমাকে সাবধানও রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেছ। এই বিধি সমুদায় পালন করিতে গিয়া,—আমি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে একটু রোদন করিব, তাহাও পারি না।"

তখন জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু সকলের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ শুনিয়া রাখি।" প্রভু বলিলেন, "তুমিই ত নাটের গুরু। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার দিবানিশি একমাত্র চেষ্টা কিসে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছা আমি উদর পূরিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া ভোজন করি, অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করি, উত্তম তৈল মাখিয়া স্নান করি, এবং সমুদায় বিষয়-সুখ ভোগ করি। কিন্তু আমি ত তাহা করিতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, এ সমুদায় সুখ ভোগ করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিবে না, শুনিবেও না; আমার সম্মুখে বিষয়-সুখ রাখিয়া, যাহাতে, উহা আমি ভোগ করি, তাহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা দেখাইবে। কিন্তু আমি তোমার অনুরোধ রাখিতে পারি না বলিয়া তুমি রাগ করিয়া আমার সহিত কথা বন্ধ কর। তখন তোমাকে কথা কহাইবার নিমিত্ত আমার বহু সাধ্যসাধনা করিতে হয়।" তাহার পরে প্রভু বলিলেন, "সকলের কথা যখন বলিলাম, তখন মুকুন্দের কথাও বলি। মুকুন্দ এই প্রথম সংসারের বাহিরে হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার হৃদয় এখনও অত্যন্ত কোমল আছে। তিনি কাহারও দুঃখ সহিতে পারেন না, আমার দুঃখ কিরূপে সহিবেন? আমি শীতে তিন বার স্নান করিতাম, দেখিয়া মুকুন্দ বড় কষ্ট পাইতেন। আমি মৃত্তিকায় শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা সহিতে পারে না! সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালনের জন্য আমার অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয়। এ সকল কথা সাহস করিয়া তিনি আমাকে বলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি

বুঝিতে পারি। আমি যে নিয়ম পালন করি, উহাতে আমার কিছু দুঃখ হয় না, কিন্তু আমি দুঃখ পাইতেছি ইহা অনুমান করিয়া মুকুন্দের যে দুঃখ তাই দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; এমন কি, আমি মুকুন্দের মুখপানে চাহিতে পারি না।"

প্রভু এই বলিয়া যাঁহার যে গুণ তাহা সমুদায় দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসাদি কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দের কিছুমাত্র আস্থা নাই। তাই তিনি প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন, আর প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যান। তাঁহার মতে প্রভুর এ সমুদায় কাজ ফেলিয়া দিয়া নদীয়ায় জননীর নিকট যাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দামোদরের ঠিক বিপরীত ভাব। দামোদের সর্ব্বদা ভয় পাছে প্রভুর ধর্ম্ম-পালন নিয়ম মত না হয়; আর জগদানন্দের ভয় পাছে প্রভুর পেট না ভরে, কি নিদ্রা ভাল না হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন,—প্রভুকে কীর্ত্তন শুনান, প্রভুর রূপ-দর্শন ও প্রভুর চরণ-সেবন। তিনি প্রভুর সোণার অঙ্গে কৌপীন, কি মৃত্তিকায় শয়ন, কিরূপে দেখিবেন?

ভক্তগণ তখন মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। এতদিন নদেবাসীরা নদের যথাসর্ব্বস্ব ভক্তদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং ভক্তগণও তাঁহাদের প্রাণ-মন-বুদ্ধি সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন যে তিনি দক্ষিণদেশে যাইবেন, কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না! যিনি এই কথা বলিতেছেন, তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন, পরে প্রস্তাব করেন। তারপর ত্রিভুবনও বিরোধী হইলে তাহা শুনেন না। কাজেই ভক্তগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "শতবার দেহ-ত্যাগ করা যায়, তবু তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। তোমরা

আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন করাইলে। এ দেহ সম্পূর্ণরূপে তোমাদের, তোমরা আমাকে যেথানে সেথানে বিক্রয় করিতে পার। আমি একবার দক্ষিণদেশে যাব; একাকী সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দ্রুতগতিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিব। তোমরা এথানেই থাক, আমি যে যাইব সেই আসিব।" তথন শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন "প্রভু নিতান্তই যাইবে, আমরা আর কি বলিব? তবে তুমি একাকী যাইবে, ইহা আমরা কি করিয়া সহিব প্রথমত: নামজপ করিতে তোমার হস্ত আবদ্ধ থাকিবে। তোমার কৌপীন, বহির্ব্বাস ও জলপাত্র কে বহন করিবে? যদি স্বয়ং বহন কর, তবে নাম জপিবে কিরূপে? তারপর, পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কে তোমাকে সন্তর্পণ করিবে? কে ভিক্ষা করিবে, ও প্রসাদ ভুঞ্জাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিবে? তুমি স্বেচ্ছাময়, যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহা আমাদের করিতেই হইবে। তবে এরূপ ভাবে তোমাকে বিদায় দিতে আমরা প্রাণ থাকিতে কিরূপে পারি?"

প্রভুর মন একটু নরম হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন! তথন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "এথন সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের নিকটে চলুন, এবং এ কথা শুনিয়া তাঁহারা কি বলেন শ্রবণ করুন।" শ্রীনিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, প্রভু সার্ব্বভৌমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। যদি প্রভুর মন ফিরাইতে হয়, তবে উহা সার্ব্বভৌম দ্বারা করাইতে হইবে। প্রভু বলিলেন, "ভাল কথা, তবে চল সার্ব্বভৌমের নিকট যাই।" ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম সর্ব্ব সুমঙ্গল উপস্থিত দেথিয়া, মহাহর্ষে উঠিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া প্রভুকে ও শ্রীনিতাইকে পূজা করিলেন। সার্ব্বভৌম জানেন না যে, প্রভু তাঁহার গলায় ছুরি দিতে আসিয়াছেন। দুই একবার কৃষ্ণ-কথার পরে, প্রভু তাঁহার দক্ষিণদেশে

ভ্রমণ-ইচ্ছা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীভগবদ্দত্ত মনুষ্য-হৃদয়ের যে মধুর ভাবগুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছা করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, বরং চেষ্টা করিয়া দলন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবন পোড়াইয়া ছাই করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ভস্মাবৃত স্থান প্রথমতঃ আর্দ্র করিয়া, পরে কর্ষণ করিয়া শ্রীপ্রভু যত্ন করিয়া সেখানে প্রেমের বীজ রোপণ করিলেন। এই বীজ এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রভু তাই এখন ভাঙ্গিতে চাহিলেন, তিনি তাহা সহিবেন কিরূপে? প্রভু যাইবেন শুনিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে জানিতাম না। তুমি স্বেচ্ছাময়; যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, কাহার সাধ্য তাহা হইতে তোমাকে বিরত করে। তবে তুমি গমন করিলে, তোমার বিরহে আমাদের জীবন থাকিবে না তাহা বুঝিতেছি। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—(যথা—চৈতন্য-চরিতামৃত মহা-কাব্য ১২ সর্গঃ)

কথং মমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ কথং মমাভূন্নহি দেহপাতঃ।
বিলোক্য যুষ্মৎপদপদ্মযুগ্মং সোঢ়ুং ন শক্তোঽস্মি ভবদ্বিয়োগং॥ ৯৭॥
ক্ব ত ক্ব গন্তাসি পথা নু কেন কথং পথঃ ক্লেশসহোঽথ ভাবী।

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন না হইল, আপনার পাদপদ্ম-যুগল দর্শন না করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপে সহ্য করিব? প্রভো! আপনি কোন্ পথে যাইবেন? এবং কিরূপেই বা পথের ক্লেশ সহ্য করিবেন? হা কষ্ট!

আবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—৭ম পরিচ্ছেদ

"শুনি সার্ব্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর। চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর॥ ৪৬
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ। হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায়॥"

এই প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীবৃহস্পতি-অবতার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর অপেক্ষাও বহুগুণে প্রিয় হইয়াছেন যখন শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন,—শ্রীনন্দনন্দন গোপগোপীগণের নিকট এত প্রিয় হইলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে আপন পুত্র হইতেও অধিক প্রীতি করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতাবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে? এ যে একেবারে অস্বাভাবিক। তাহাতে শুকদেব বলিলেন, এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; যেহেতু যিনি যত নিকট-সম্পর্কীয় হউন, শ্রীভগবানের মত নিকট-সম্পর্কীয় কেহই নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ। সুতরাং সার্ব্বভৌম যে বলিলেন, পুত্র মরিয়া যায় ইহাও সহ্য করা যায়, তবু প্রভুর বিরহ সহ্য করা যায় না, তাহার বিচিত্র কি? শ্রীগৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? আমি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইব, যেই যাইব সেই আসিব, আর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সত্বরই ফিরিয়া আসিব।"

এই যে শ্রীপ্রভু বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তাঁহারা জানেন প্রভুর বাক্য অব্যর্থ। সার্ব্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রভুকে তাঁহার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিবার যত্ন করিলেন না। ভাবিলেন, পরে সুবিধামত উহা করিবেন। তবে বলিলেন, "প্রভু! তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমাকে আমরা রোধ করিতে পারিব না। তবে যদি যাইবে, আর কিছু দিন থাক, প্রাণ ভরিয়া শ্রীচরণ দর্শন করি।" প্রভু এ কথা শুনিয়া তখনি স্বীকার করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিয়া মনের সাধে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী (যাঁহাকে ষাঠীর মাতা

বলিতেন, যেহেতু তাঁহার কন্যার নাম ষাঠী) রন্ধন করেন, আর সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করেন। সার্ব্বভৌম ও ভক্তগণ প্রভুকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। প্রভু যাইবেন সাব্যস্ত হইল, তবে একজন ভৃত্য সঙ্গে লইবেন, সকলের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন ; আর সার্ব্বভৌমের অনুরোধে প্রভু পঞ্চ দিবস রহিলেন।

ষষ্ঠ দিবস প্রভাতে প্রভু বলিলেন, "তবে আমি চলিলাম।" এই কথা শুনিয়া সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোদুঃখে ও নীরবে সকলে প্রভুর সহিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিলেন। প্রভু করজোড়ে, সর্ব্ব-সমক্ষে, শ্রীজগন্নাথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা মাগিলেন। পূজারি তখনই আজ্ঞা-মালা ও চন্দন আনিয়া দিলেন। প্রভুও মহা-আনন্দিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন ; তৎপরে সমুদ্র-পথ ধরিলেন। সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন এবং গোপীনাথ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রসাদান্ন, আর প্রভুর ভৃত্য দ্বারা চারিখানি কৌপীন ও বহির্ব্বাস সেই সঙ্গে লইলেন।

একটু গমন করিয়া প্রভু দাঁড়াইলেন ; দাঁড়াইয়া সার্ব্বভৌমকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, আমার একটি নিবেদন আছে। গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরের অধিকারী শ্রীরামানন্দ রায় আছেন। সে দেশ গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধিকারভুক্ত। সেই রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ও বিষয়ীর কার্য্য করেন। আমার ইচ্ছা যে, আপনি তাঁহাকে তাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার ন্যায় ভক্ত ও রসজ্ঞ পৃথিবীতে আর নাই। তাঁহার কথা কিছু না বুঝিতে পারিয়া, বৃথা বিদ্যা মদে আমি চিরদিন তাঁহাকে উপহাস করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনার কৃপাবলে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি ! অতএব তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না।" প্রভু বলিলেন, "তাই হইবে।"

প্রভু সার্ব্বভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিলেন না বলিলেন, "তুমি গৃহে যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিও ; আমি তোমার আশীর্ব্বাদে ফিরিয়া আসিব।" ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌমকে হৃদয়ে ধরিয়া অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন ; তারপর প্রভু চলিলেন। ভট্টাচার্য্য একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, ক্রমে কাঁপিতে লাগিলেন, শেষে "প্রভু"! বলিয়া মৃত্তিকায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন—তবে একটু আস্তে আস্তে। প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়া চাহিবেন ? কি দেখিবেন ? আর, দেখিয়া সহিবেনই বা কিরূপে কিন্তু ভক্তগণ অমনি সার্ব্বভৌমকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সার্ব্বভৌম চেতন পাইলেন। তখন ভক্তগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া লোক দ্বারা বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম বাণাহত মৃগের ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহে যাইতে লাগিলেন। এদিকে ভক্তগণ প্রভুসহ মিলিত হইয়া সমুদ্রের ধারে ধারে আলালনাথে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভু আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য্য, হাবভাব, নৃত্য, বসন ও বয়স দেখিয়া চারিদিক হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং তাহারাও উন্মত্ত হইয়া গৃহ ভুলিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই মহা কলরবের মধ্যে প্রভুর ভিক্ষা সমাধান হওয়া দুর্ঘট হইল। তখন ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন ; এবং গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন তাহা প্রথমে নিতাই ও গৌরকে ভুঞ্জাইলেন, এবং অবশিষ্ট প্রসাদ আপনারা বাঁটিয়া খাইলেন। এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং সকলেই "প্রভু, একবার দর্শন দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। লোকের ভিড় এত হইল যে, ভক্তেরা দ্বার খুলিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু প্রভু লোকের আর্ত্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে

পারিলেন না। তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে দর্শন করিল, আর "জয় কৃষ্ণচৈতন্য", "জয় সচল জগন্নাথ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

এ রহস্য যেন স্মরণ থাকে যে, প্রভু একজন সন্ন্যাসী মাত্র, অথচ দর্শনমাত্রে লোকে তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। সারানিশি এইরূপ নৃত্যে ও হরিনামের কোলাহলে কাটিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা এখন প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিলে ত? এইরূপ গ্রামে গ্রামে হইবে।"

প্রভাত হইল, সকলে প্রাতঃস্নান করিলেন। তখন প্রভু সঙ্গীদিগের নিকট বিদায় মাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। প্রভু সকলকে ধরিয়া ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর একে একে সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পড়িয়াই থাকিলেন। তাঁহারা যেরূপ সার্ব্বভৌমকে ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন, সেরূপ করিয়া তাঁহাদের আর কে উঠাইবে? তখন প্রভু কি করিলেন? যথা চরিতামৃতে—(মধ্যঃ ৭মঃ ৯৩) "বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।" আর তাঁহার পশ্চাতে ভৃত্য জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহন করিয়া চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আমায় ধর নিতাই॥ ধ্রু॥
আমার মন যেন আজ করেরে কেমন।
জীবকে হরিনাম বিলাতে, লাগল রে ঢেউ প্রেম-নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই॥
যে দুঃখ আমার অন্তরে, ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়॥"—শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়ে ভৃত্যের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে সারা দিবস ও রজনী কাটিল। পর দিবস প্রভাতে তাঁহারা উঠিয়া রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে নীলাচল অভিমুখে চলিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন। ভক্তগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রভু একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুই বাহু তুলিয়া, অতি মধুর নৃত্য ও অতি গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যথা, প্রভুর শ্রীমুখের কীর্ত্তন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

সেই সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া যেন ত্রিভুবন সুশীতল ও আশ্বাসিত হইতে লাগিল। প্রভুর বয়স তখন সবে পঞ্চবিংশতি, সর্ব্বাঙ্গ মনোহর ও দেহ অতি দীর্ঘ। তাঁহার পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস। দুই বাহু উর্দ্ধদিকে, তাহাতে জপের মালা; সেই মালা ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকোপরি ধরিয়াছেন, আর সুমধুর স্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্" বলিয়া গাহিতেছেন, ও পদ্ম-চক্ষু দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। প্রভু যাইতেছেন কেন, না পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে! আমার বোধহয় দেবগণ তখন অন্তরীক্ষে থাকিয়া প্রভুর অপরূপ শোভা দর্শন ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই কাহার সহিত কথাও নাই। ভৃত্যও নীরবে

তাঁহার পশ্চাৎ যাইতেছেন। প্রভুর গতি-ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন। হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে বসিলেন। কেন বসিলেন, তাহা একটু পরে বুঝা গেল। যেমন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবামাত্র মধুকর আসিয়া উপস্থিত হয়; সেইরূপ প্রভু বসিলে, দুই এক করিয়া ক্রমে বহু লোক আসিল এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া "হরি" "হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। একটু পরে প্রভু উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। প্রভু তখন দুই-একজনকে আলিঙ্গন করিয়া আবার চলিলেন। কখন বা পথের লোক প্রভুর পশ্চাৎ চলিতেছে। প্রভু বলিলেন, "বল হরিবোল।" আর তাহারাও "হরি হরি" বলিতে বলিতে চলিল। এইরূপে কতক দূর যাইতে যাইতে তাদের মধ্যে কাহারও মন নির্ম্মল, হৃদয়ক্ষেত্র আর্দ্র ও কর্ষিত হইল, এবং সে প্রেমরূপ বীজ অঙ্কুরিত করিতে শক্তি পাইল। অমনি প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, আর প্রভু চলিয়া গেলেন। এই যে প্রভুকে লোকে একবার দর্শন করিল, কি দুই একজন তাঁহারা আলিঙ্গন পাইল, তাহাতেই সে দেশ কিরূপে উদ্ধার হইল তাহা বলিতেছি। প্রভু দক্ষিণ-দেশে যে শক্তিতে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা অননুভবনীয়। সেইরূপ শক্তির কথা কোথাও শুনা যায় না।*

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোক শুধু যে "হরি" "কৃষ্ণ" বলিতে শিখিল ও বলিতে লাগিল, কিম্বা উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা নহে;—প্রভুর ধর্ম্মের যে নিগূঢ়-তত্ত্ব, তাহা যাহার যতদূর

---

* শ্রীচরিতামৃত এই অচিন্তনীয় শক্তির এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে—বল হরি হরি ॥৯৭
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ। প্রভুর পাছে পাছে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন। কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥

অধিকার, তাহার মনে সেই মুহূর্ত্তেই ততটা স্ফূর্ত্তি হইল ;—'স্ফূর্ত্তি হইল' বলা ঠিক হইল না, "সেই সমুদায় তত্ত্বের বীজ রোপিত হইল।"

প্রভুর পার্ষদ ও লীলা-লেখক মহাজনগণের এই শক্তি-সঞ্চার-প্রক্রিয়া বর্ণনায় একটি বড় রহস্য অবগত হওয়া যায়। সেটি এই যে প্রভু যেন প্রক্রিয়াটি বেশ বুঝিতেন ও জানিতেন। যেমন 'কর্দ্দম' কুম্ভকারের নিকট, সেইরূপ 'কোন জীব' (যাঁহাকে প্রভু কৃপা করিবেন) তাঁহার নিকট। প্রভু কাহাকে স্পর্শ করিলেন, কাহাকে বা করিলেন না,—কেবল বলিলেন "হরি বল"। ফল কিন্তু একই হইল, উভয়েই "হরি বলিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেন একজনকে শ্রীমুখের বাক্য দ্বারা, এবং অপরকে স্পর্শ করিয়া, শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। যদি বল, প্রভু বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন না, যখন যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, ফল একই হইত। কিন্তু প্রভুর লীলা চিন্তা করিয়া আমাদের তাহা বোধ হয় না। ইহার যে একটি শাস্ত্র আছে তাহার সন্দেহ নাই ; সাধুগণ উহার নিয়ম কিছু কিছু জানেন, কিন্তু প্রভু ছিলেন ইহার অধ্যাপক।

এইরূপে প্রভু প্রথমে একজনকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, কিন্তু তখন তাহাতে কোন তত্ত্ব স্ফুরিত হইল না। কেবল যন্ত্রের ন্যায় বিবশ হইয়া

"যারে দেখে তার বলে,—কহ কৃষ্ণ নাম। এই মত বৈষ্ণব করিল সব গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখতে আইসে যত জন। তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁহারি মতন॥
সেই যাই নিজ গ্রামে বৈষ্ণব করয়। অন্য গ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ। এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ-দেশ॥
এই মত পথে যাইতে শত শত জন। বৈষ্ণব করেন সবে করি আলিঙ্গন॥
যে গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। সেই গ্রামে লোক তথা আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগৎ॥
এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥"

সে মুখে হরি বলিতে ও নৃত্য করিতে লাগিল! ক্রমে তাহার দেহে নানাবিধ ভাব প্রকাশ পাইল,—নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লালা পড়িতে ও তাহার ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। এ পরিশ্রমের ঘর্ম্ম নয়,—এ ঘর্ম্ম অন্যরূপ। তারপর মুহুর্মুহ মূর্চ্ছা হইয়া তাহার হৃদয় নূতন আকার ধারণ করিল। প্রায় জীবমাত্রেরই হৃদয়—সুবর্ণখনির এক খণ্ড মৃত্তিকার ন্যায়। মৃত্তিকা হইতে সুবর্ণ উদ্ধার করিতে হইলে নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রভু যাহাকে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহার হৃদয়ে সেই সমুদায় প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। ক্রমে হৃদয় দ্রব হইল, আর তাহার মধ্যস্থিত সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথক হইতে লাগিল। যেমন সুবর্ণ দ্রবীভূত হইলে, উহা ছাঁচে ঢালা হয়; সেইরূপ যখন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তখন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে একজন সামান্য জীব ছিল, এখন প্রভুর আলিঙ্গন-রূপ ছাঁচে পড়িয়া ব্রজের একজন পরিকর হইল। এখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উপরে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই চরণটি বিচার করুন, যথা—"কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গয়ে।" এখানে "কতক্ষণ রহি" এই কয়েকটি কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রভু অপেক্ষা করেন। স্বর্ণকার স্বর্ণ উত্তাপে দিয়া "কতক্ষণ" বসিয়া থাকে; কেননা সুবর্ণ দ্রবীভূত হইতে সময় লাগে। ইহাও সেইরূপ।

একটু পূর্ব্বে বাললাম যে, প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া কৃপা-পাত্র শুধু যে ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল তাহা নহে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সমুদায় নিগূঢ়-তত্ত্ব তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইল; অর্থাৎ প্রভু আলিঙ্গন দিয়া তাহার হৃদয়ে এই নিগূঢ় তত্ত্বের বীজ রোপণ করিলেন। প্রভু চলিয়া গেলে, সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তবে

সকলের হৃদয়ে সমান স্ফুরিত হয় না, যেহেতু ক্ষেত্র অর্থাৎ অধিকার সকলের সমান নহে। মনে ভাবুন, কোন নিবিড় জঙ্গলে, (যেখানে আম্র-বৃক্ষ নাই), এক ব্যক্তি একটু স্থান পরিষ্কার, কর্ষণ ও জল সেচন করিয়া সেখানে একটি আম্র-বীজ রোপণ করিল ও ঘিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ত্রিশ বৎসর পরে সেই ব্যক্তি আবার সেখানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে অনেকগুলি বৃক্ষ হইয়াছে, সেগুলি ঠিক আম্রবৃক্ষের মত, আর তাহাতে যে ফল হইতেছে তাহাও ঠিক আম্রের মত,—সেই আস্বাদ, সেই গন্ধ ও সেই আকার। এই শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো বিচার করিতে হইবে। তখন বুঝা যাইবে যে, শ্রীভগবান মনুষ্য সৃষ্টি করিতে কত কারিগরিই করিয়াছেন ও তাহাদিগকে কত প্রকার শক্তিই দিয়াছেন।

প্রভু কখন ধীরে, কখন বিদ্যুদ্‌বেগে চলিয়াছেন। যখন দ্রুত যাইতেন, তখন ভৃত্য সমভাবে যাইতে পারিতেছেন না, তবু কোন গতিকে প্রভুকে নয়নের অন্তরাল হইতে দিতেছেন না। যখন প্রভু কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে উপহার আসিতেছে, ভৃত্য প্রয়োজন মত লইতেছেন, অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিতেছেন। যখন জনপদ দিয়া যাইতেছেন, তখন আহারীয় দ্রব্য কোন না কোন প্রকারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিবিড় অরণ্য,—১০।১৫ দিনের মধ্যে কিছুই পাওয়া যাইবে না। ভৃত্য এই সংবাদ জানিয়া কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, কিছুদিন পরে আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গেল, কাজেই ভৃত্য প্রভুকে ভিক্ষা দিতে পারিলেন না। সারাদিন উপবাসে গেল, রজনী আসিল। নিবিড় জঙ্গল, আর অগ্রসর হইবার যো নাই। প্রভু সেই অন্ধকারে বৃক্ষতলে বসিলেন। ভৃত্যও প্রভুর পদতলে বসিলেন। প্রভু তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে—কখন নীরবে, কখন উচ্চৈঃস্বরে—রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য নিজে উপবাসী তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু প্রভু উপবাসী থাকায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। একে এই দুঃখ, তারপর প্রভুর করুণস্বরে রোদন। ভৃত্য প্রভুর পদতলে, দুই জানুর মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভুর নিদ্রা বা ক্ষুধা-বোধ, কি অন্য কোনও দুঃখ নাই, একমাত্র দুঃখ—শ্রীকৃষ্ণ বিরহ! এমন সময় হিংস্র পশুগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রভু উহা শুনিলেন কিনা ভৃত্য জানিতেও পারিলেন না, তবে ভৃত্য ভয় পাইয়া প্রভুর পদতলের আরো নিকটে আসিলেন। এমন সময় এক ব্যাঘ্র সম্মুখে আসিল। ভৃত্য বড় ভয় পাইলেন। ব্যাঘ্র তাহাদিগকে খানিক দেখিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ হিংস্র জন্তুর সহিত মুহুর্মুহু দেখা হইতে লাগিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন মাত্র তাহারা পশুভাব হারাইয়া অতি নম্র হইয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, কখন বা সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিল।

শচীর দুলাল নিমাই এখন উপবাসী রহিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করিয়া দুঃখ ও সুখ আস্বাদ করিতে লাগিলেন। ভক্তের সময় সময় উপবাসী থাকিতে হয়, তাঁহারও থাকিতে হইল। তাঁহার নিজের বেলা উপাদেয় সেবা, আর ভক্তের বেলা উপবাস,—এরূপ বিচার তিনি কখনও করিতে পারেন না। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভু কাঙ্গাল বেশ ধরিলেন, বৃক্ষতলবাসী হইলেন, সুতরাং উপবাস করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু সেই শচীর স্তন-দুগ্ধে প্রতিপালিত এবং নবদ্বীপবাসীর আদরে বর্দ্ধিত, ভুবনমোহন "বরতনু" ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। প্রভুর সুন্দর, সুবলিত, প্রকাণ্ড ও রোগশূন্য দেহ হঠাৎ দুর্ব্বল হইবার কথা নয়। যতদিবস তাঁহার শরীরের দৌর্ব্বল্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই, ততদিন তাঁহার কাঙ্গাল বেশ অন্যের নিকট তত ক্লেশকর বোধ হয় নাই। কিন্তু প্রভু স্বইচ্ছায় স্বভাবের নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন।

সেই ভীষণ রৌদ্রের সময়, সেই উষ্ণ-প্রধান দেশে, অনবরত পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহ-রূপ "মহাজ্বর" তাঁহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, আর উদরাগ্নি ও উপবাস তাঁহার সর্ব্বতনু ক্ষয় করিতেছে,—সেখানে যে তিনি ক্রমে দুর্ব্বল হইবেন, তাহার বিচিত্র কি ?

প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত ; তবে নয়ন-জলের স্রোত শরীরের যে অংশ বহিয়া পড়িতেছে, সে স্থান ধৌত হওয়াতে, দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য জলজল করিতেছে। প্রভুর পরিধান কৌপিন ও বহির্ব্বাস, তাহা আবার অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কটিদেশে কেবল অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র এই মাত্র। প্রভুর মুখে শ্মশ্রুর আবির্ভাব হইয়াছে। কাটোয়ায় কেশ মুণ্ডন করেন, আবার কেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কটিদেশে একগাছি দড়ি দ্বারা বেষ্টিত, উহাতে কৌপীন আবদ্ধ। দুই হস্ত উচ্চ করিয়া প্রভু মালা জপিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেছেন।

প্রভুর সেই বিশাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্রমে অস্থি দর্শন দিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন ভক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া বেড়াইতেছেন। আর ইহাও বোধ হইতে লাগিল যে, ইহা দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে ভাল।

প্রভুর গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া নবদ্বীপের ষণ্ডাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে চাহিয়াছিল। এখন যদি তাহারা তাঁহাকে দেখিত, তবে কান্দিয়া আকুল হইত ; আর বলিত, "হে সুন্দর ! আমরা ভাল হইব, শ্রীহরিকে ভজনা করিব, আর তাঁহাকে ভুলিব না, তুমি যাহা বল তাহাই করিব। তুমি এ বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমরা আর সহিতে পারিতেছি না।" এইরূপে প্রভুর অননুভবনীয় ক্লেশ জীব-উদ্ধারের কারণ হইল।

প্রভুকে দর্শন করিয়া বালকগণ তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এক

রাখাল অন্যকে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওরে পাগল দেখে যা। এ হরিনামের পাগল, হরিনাম বলিলেই খেপিয়া উঠে।" এ কথা শুনিয়া রাখালগণ জুটিয়া গেল। তখন সেই রাখাল বলিতেছে, "দেখ, এমনি বেশ যাইতেছে, কিন্তু হরিনাম শুনিলেই খেপিয়া উঠিবে। আয় আমরা পাগল খেপাই।" ইহাই বলিয়া সকলে হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে লাগিল। প্রভু দ্রুত যাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মুখ ফিরাইলেন। সেই রাখাল তখন বলিতেছে, "দেখ্লি ত? ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আরো হরি বল। এই খ্যাপে আর কি?" রাখালগণ আরো উৎসাহের সহিত হরি বলিতে লাগিল। তখন প্রভু বসিয়া পড়িলেন; বসিয়া গাত্রে ধূলা মাখিলেন। রাখালগণ যতই হরি বলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া, আহ্লাদে হাসিয়া গাত্রে ততই ধূলা মাখিলেন। সেই রাখাল বলিতেছে, "ঐ দেখ খেপিয়াছে।" কিন্তু রহস্য এই যে, প্রভু খেপুন আর নাই খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই খেপিল, তাহাদের মুখে চিরদিনের জন্য হরিনাম লাগিয়া গেল।

প্রভু চলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মহিমা অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। সে মহিমা এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া জীবগণকে হরিনাম বিলাইতে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়; প্রভু যে শ্রীভগবান্, তাহা সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কিছুদিন পরে প্রভু কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়া বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"কূর্ম্ম দেখি কৈল তারে স্তবন প্রণামে ॥১১৩

প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল। দেখি সর্ব্বলোক-চিত্তে চমৎকার হৈল ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবার। প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার ॥

দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি। প্রেমাবেশে নাচে সবে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥
কৃষ্ণনাম লোক-মুখে শুনি অবিরাম। সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥

"এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈলা। কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইলা।
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা। কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা।।"

পর দিবস প্রাতে প্রভু সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লোক সকল তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন ও বলিলেন, "ঘরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" প্রভু এক ক্রোশ পথ গমন করিলে, সেই কূর্ম্ম-স্থানে বাসুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, কারণ শ্রীভগবানে তাঁহার গাঢ়-ভক্তি। বাসুদেবের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া তাহাতে কীড়া হইয়াছেন। সকলে ভাবে ঐ কীড়া তাঁহাকে বড় দুঃখ দিতেছে। কিন্তু বাসুদেব ভাবেন যে, তাঁহার দেহ একেবারে জগতের ত্যজ্য-সামগ্রী নহে, যেহেতু উহা সেই কীড়া গুলিকে আহার দিতেছে। কাজেই যদি অঙ্গের ক্ষতস্থান হইতে কোন কীড়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়, তবে সে দুঃখ পাইবে বলিয়া উহা আবার সেই স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। যেমন মাতা পুত্রগণকে স্তন পান করাইয়া থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ কীড়াগণকে আপন অঙ্গ দিয়া পালন করেন। তাহার আর এক বিশেষ কারণ এই যে, কীড়াগুলি ব্যতীত তাঁহার নিজ-জন আর কেহ ছিল না। তাঁহার অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে পারিত না। সুতরাং ঐ কীটগুলি তাঁহার একমাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ-জন ভাবিয়া যত্ন করিয়া পালন করিতেন। বাসুদেব রজনীতে শুনিলেন যে, শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি তখন সন্ন্যাসীরূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু চলৎশক্তি নাই, তাই আস্তে আস্তে, কখন বসিয়া, কখন উঠিয়া, কখন জানু গতিতে, অর্থাৎ যেরূপে পারেন, কূর্ম্মস্থানে যাইতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, সুতরাং অঙ্গে একটু বলও হইয়াছে, আর সেই বলে প্রকৃতই কুর্ম্ম-স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন। যাইয়াই শুনিলেন যে, প্রভু একটু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। বাসুদেব বড় আশা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আশা ভঙ্গ হওয়ায় সামলাইতে পারিলেন না,—"হা,—ভগবান্! তোমাকে দেখিতে পাইলাম না" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, "হা হরি! শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দাও" বলিয়া রোদন করিতে থাকিলে প্রভুর "গতি-ভঙ্গ'' হয়, এখনও তাহাই হইল। "হা ভগবান্! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না" বলিয়া যেইমাত্র বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের "গতি-ভঙ্গ" হইল, প্রভু আর চলিতে পারিলেন না,—দাঁড়াইলেন; আর যেন কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিলেন। তখন "এই যে আইলাম" অর্দ্ধস্ফুট-বাক্যে ইহাই বলিয়া কুর্ম্মস্থানের দিকে ফিরিয়া দৌড়িলেন। প্রভু তখন বাসুদেব হইতে এক ক্রোশ দূরে। এই এক ক্রোশ মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য তাঁহার পশ্চাৎ আসিতে পারিলেন না। তাহার পরে—

"কুষ্ঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র। চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু ॥
দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিয়া দামোদরে। গাঢ়তর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে ॥
রক্ত রসা কৃমি দেখি ঘৃণা না করিল ॥"

প্রভু বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বাসুদেবকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে কি হইল? যথা, চৈতন্যচরিতের ১২শ সর্গে—

আগত্য দোর্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্ঠৈঃ সমং মোহমপাচকার।
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রাপ্যানমত্তং ধৃতহর্ষশোকঃ ॥১১॥

গৌরাঙ্গদেব আসিয়াই বিপ্রকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কুষ্ঠরোগের সহিত তাঁহার মোহকে বিনষ্ট করিলেন! শ্রীপ্রভুর আলিঙ্গন

পাইয়া বাসুদেব চেতন প্রাপ্ত হইলেন ও দেখেন যে, তাঁহার অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠরোগের চিহ্নমাত্র নাই! তখন তিনি প্রভুকে প্রণাম করিয়া আবেগভরে কহিলেন, "হে দয়াময়! এ কি করিলে? জগতের জীবমাত্রই ঘৃণা করিয়া আমার নিকট আইসে না। আর তুমি,—সেই লক্ষ্মীর আবাস স্থান,—আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে! এ কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়; কারণ উত্তম ও অধম সকলেই তোমার সমান প্রিয়।" আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার সুখ হইতেছে না। অস্পৃশ্য ছিলাম বলিয়া আমার মনে অভিমান আসিতে পারিত না, তাই তোমাকে পাইলাম। এই দেহ তুমি কৃপা করিয়া সুন্দর করিলে। এখন আমার ভয় হইতেছে, আর সে দীনতা থাকিবে না। অভিমান সৃষ্টি হইলে, পাছে আমি তোমাকে হারাই।" যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া। এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥"

এই কথা শুনিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইল, নয়ন ও চন্দ্রবদন জলে ভাসিয়া গেল! প্রভু ভাবিতে লাগিলেন যে, বাসুদেব তাঁহাকে পরাজয় করিল। তখন প্রভু বলিলেন, "তোমার ন্যায় ভক্তের যদি অহঙ্কার হয়, তাহা হইলে জীবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে কেন? আমি বলিতেছি তোমার অভিমান হইবে না; তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর জীবগণকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া উদ্ধার কর।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, যথা, বাসুদেব বলিতেছেন—

"কোথা আমি দরিদ্র পরম পাপী জন। কোথা কৃষ্ণ ভগবান লক্ষ্মী-নিকেতন॥
নিন্দিত ব্রাহ্মণ মোরে ঘৃণা না করিলা। বাহু পসারিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥
এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পড়িল। সেইক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল॥

রক্ত রসা কৃমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল। প্রকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হৈল॥
দেখি ইহা বাসুদেব কহিল প্রভুরে। এমন সুন্দর কেন করিলে আমারে॥
তুমিত ঈশ্বর পার সকল করিতে। কিন্তু আমি ব্যাধি হঞা ছিনু সুস্থ চিতে॥
নিরুদ্বেগে সুখে ছিনু স্থির ছিল মন। নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্দ-চরণ॥
সংপ্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব। বিষয়ে আসক্ত মন নানা দিকে যাব॥
কৃষ্ণ-সুখ ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ দিলে। ব্যাধি ঘুচাইয়া কেন এমন করিলে॥"

তখন প্রভু গদগদ চিত্তে উত্তর করিলেন :—

তা শুনিয়া সদ্রব হৈল প্রভুর মন। কহিতে লাগিলা—"তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ॥
পুনর্ব্বার তোমার গোবিন্দ স্মৃতি বিনা। না হবে ব্যাপার বাহে মনে দুর্ব্বাসনা॥
অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর। ভক্তি সুখ আস্বাদন কর নিরন্তর॥

প্রভুর কথা শুনিয়া বাসুদেব উত্তর করিবার অবসর পাইলেন না; কারণ কথাগুলি বলিয়াই প্রভু অন্তর্দ্ধান করিলেন। বাসুদেবের তাহাতে বিশেষ দুঃখ হইল না। কারণ প্রভু যেমন তাঁহার জড়চক্ষু হইতে অন্তর হইলেন, অমনি অভ্যন্তরের চির-নয়নে উদয় হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দিতে লাগিলেন।

এখানে কথা উঠিতে পারে যে, প্রভু যখন বাসুদেবকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন তাঁহাকে ফেলিয়া না গিয়া, একটু অপেক্ষা করিলেই পারিতেন; কারণ তাহা হইলে তাঁহার দুই ক্রোশ পথ চলিবার শ্রম লইতে হইত না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানে ও জীবমাত্রে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন। যখন সেই আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় হয়, তখনি জীব ও ভগবানে মিলন হয়। বাসুদেবের একটু বাকী ছিল, কুর্ম্মস্থানে আসিয়া প্রভুকে না পাইয়া সেইটুকু পূরণ হইল, আর অমনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন। মহারাসের রজনীতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া বহু রোদন করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বিরহ অসহনীয় হইল, তখনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন।

প্রভুর কি নাম, কোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি কূর্ম্ম-স্থানের লোকেরা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা ঠিক জানি না। তবে, দক্ষিণদেশে অনেক স্থানে তাঁহার পরিচয় যে পান নাই, তাহা জানি। কূর্ম্মস্থানের লোকেরা, যাহা হউক, প্রভুকে একটি নাম দিয়াছিল, সে নামটি "বাসুদেবামৃত পদ!"

তাহার পরে প্রভু জিয়ড়-নৃসিংহের স্থানে আসিলেন। এই ঠাকুর প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। সেই কথা মনে করিয়া প্রভু অকথ্য-প্রেম প্রকাশ করিলেন। প্রভু সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া প্রভাতে আবার চলিলেন। ক্রমে গোদাবরী তীরে আসিলেন। এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ। সেই বন দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল, ক্রমে গোদাবরীকে যমুনা ভ্রম হইতে লাগিল, প্রভু আনন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন। কবি-কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিতের ১২শ সর্গে গোদাবরী দর্শনে প্রভুর মনোভাব সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"গোদাবরীতুঙ্গতরঙ্গশীতৈর্মরুদ্ভিরাশ্লিষ্টলতাসমূহৈঃ।
ইতস্ততো ভূরি সমেতমন্তর্বনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথঃ॥ ১২২॥
কদম্ববীথীষু নদন্মদঙ্গৈঃ সমুল্লসত্তাণ্ডবসংকলাপৈঃ।
বিস্রব্ধমুগ্ধেত্রযুগৈঃ কৃপালুর্নন্দ ভূয়োহরিণৈঃ সকান্তৈঃ॥ ১২৩।
নিকুঞ্জশান্তাঃ কচ চণ্ডশব্দপ্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ কচাপি।
কচ প্রসুপ্তোরুকরালসত্ত্বশ্বাসাগ্নিদীপ্তা বনভূমিভাগাঃ॥ ১২৪॥
গোদাবরীবেগমহানিনাদা ভীমা গিরিপ্রস্রবণা রবেণ।
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেনুরুচ্চৈঃ সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্য্যং॥ ১২৫।
ক্ষণাৎ স্খলৎপাদবিকম্প্রপক্ষৈশ্চঞ্চৎপতদ্বীজচয়ৈ প্রপূর্ণৈঃ।
শুকৈর্দলদ্দাড়িমচুম্ববদ্ভির্গোদাবরীতীরবনে স রেমে॥ ১২৬॥
তাম্বূলমল্লীদলবৃন্দমুচ্চৈর্ভিন্দদ্ভিরুগ্রৈ ক্রকচৈরসক্তৈঃ।
অজস্রদীর্ঘেণ বিমুক্তঝিল্লীঝঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে॥ ১২৭॥

জ্যোতির্গণাচুম্বিভিরম্বুদাভৈস্তমালমালার্জ্জুনকোবিদারৈঃ।
নানাবিধৈঃ পত্ররথৈরসম্ভিশ্চমূরবৃন্দৈশ্চমরৈশ্চ যুষ্টৈঃ ॥ ১২৮ ॥
অর্কপ্রভাপর্কবিহীনসান্দ্রস্নিগ্ধাতিসচ্ছীতলচারুভূমৌ।
অকৃত্রিমালেপনিপীতমূলে বাপীতড়াগাচিনিরন্তরালে ॥ ১২৯ ॥

অর্থাৎ, "তৎপরে গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বায়ু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত লতাসমূহ দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন।।১২২।।"

"তৎপরে কদম্ববীথিতে শব্দিত মৃদঙ্গ এবং তৎশ্রবণে মেঘ আশঙ্কায় সমুল্লাসযুক্ত, ময়ূরনৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ, তথা বিশ্বস্তভাবে উর্দ্ধনয়ন হরিণীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার অতিশয় আনন্দিত হইলেন।।১২৩।।"

"যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ শূন্য হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক সকল গ্রস্তপ্রায় এবং কোথাও বা প্রসুপ্ত অতি ভয়ানক জন্তুসকলের নিশ্বাসরূপ অগ্নি দ্বারা বনভূভাগ সুদীপ্ত, তথা গোদাবরীর জলবেগের মহানিনাদ ও ভয়ানক গিরিপ্রস্রবণ শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্য্যশূন্য করিতে লাগিল ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥"

"যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদস্খলন হয়, অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাদৃশ মনোহর পক্ষিগণের পক্ষ ও চঞ্চু-পতিত বীজসমূহ দ্বারা, তথা বিদারিত দাড়িমফলে চুম্বনকারী ও তাম্বুল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে সশব্দে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শব্দায়মান তীক্ষ্ণকরপত্র অর্থাৎ করাত-সদৃশ প্রশস্ত চঞ্চুশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ ঝিল্লী (ঝিঁঝিপোকা) সমূহের নিয়ত সুদীর্ঘ ঝঙ্কার রবে যাহা অতিশয় রমণীয় তথা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ স্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অম্বুদসদৃশ তমালশ্রেণী, অর্জ্জুনবৃক্ষ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), তথা নানাবিধ

শব্দায়মান পক্ষিগণ, চমুর (মৃগ) ও চমর-নামক পশুগণে যাহা সেবিত এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন, সুতরাং নিবিড় ও সুস্নিগ্ধ যাহার সুচারু ভূভাগ সুশীতল তথা নৈসর্গিক লেপন-ক্রিয়ার যাহার মূলদেশ পরিষ্কৃত ও দীর্ঘিকা তড়াগাদি দ্বারা যাহা নিয়ত ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাদৃশ গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ করিল ॥ ১২৬—১২৯ ॥"

প্রভু গোদাবরী পার হইয়া ওপারের ঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে ঘাটের একটু দূরে বসিয়া মালাজপ করিতে করিতে রামানন্দরায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই রামানন্দরায়ের কথা সার্ব্বভৌম বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে "প্রভু, বিষয়ী বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।" তাই প্রভু সেখানে গিয়াছেন, এবং ঘাটে বসিয়া রামানন্দরায়কে অপেক্ষা করিতেছেন। রামানন্দরায় কায়স্থ, উৎকল নিবাসী, বিস্থানগরের অধিপতি। বিস্থানগর প্রতাপরুদ্রের গজপতির সাম্রাজ্যের অধীন; রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের নামে সেই দেশ শাসন করেন। সুতরাং তাঁহার সমুদায় বিষয়কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু তবু তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত। যাঁহারা বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া শ্রীভগবান্-ভজনের নিমিত্ত বনে গমন করেন, তাঁহারা অবশ্য মহাপুরুষ এবং মহা-শক্তিধর। কিন্তু যাঁহারা বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ের সহিত খেলা করেন ও উহা হইতে অন্তরে থাকিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারা আরো শক্তিধর। রামানন্দরায় সেই প্রকৃতির লোক। তিনি ভৃত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তম শয্যায় শয়ন করেন, আর যথাযোগ্য সমুদায় বিষয় ভোগ করেন, তবুও হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে দিবানিশি টলমল করিতেছে। রামানন্দরায় ইহার পূর্ব্বে

"জগন্নাথবল্লভ নাটক" লিখিয়াছিলেন এবং গজপতি মহারাজকে উৎসর্গ করেন। এই নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীমতী রাধা। নাটকখানি মধু হইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ইহা এখন অনুবাদ সহিত ছাপা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত রামানন্দ একাকী ছিলেন। তিনি যে রস-ভোগ করিতেন, তাহা ভোগ করিবার আর সঙ্গী ছিল না। কাজেই সার্ব্বভৌম তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন।

প্রভু ঘাটের একটু দূরে বসিয়া রামানন্দরায়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তাঁহার হঠাৎ গোদাবরীতে স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তাই আসিলেন। তিনি স্নান করিতে যাইবেন, কাজেই সে এক বৃহৎ ব্যাপার হইল,—সঙ্গে বহুতর বৈদিক-ব্রাহ্মণ, বহুতর ভৃত্য, সৈন্য, হস্তি, ঘোড়া চলিল; আর নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই সাজ-সজ্জায় রামানন্দ, প্রভু যে ঘাটের একটু দূরে নদীতীরে বসিয়া আছেন, সেই স্থানে স্নান করিতে আসিলেন, এবং যে প্রভু বিষয়কে তৃণ হইতেও লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সজ্জায় তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সে স্থান নানা সজ্জায় সুসজ্জীভূত এবং অদ্যাপিও লোকে উহা দর্শন করিতে যাইয়া থাকে।

রামানন্দ স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পূজা করিলেন। এই সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, নদীর তীরে একটু দূরে এক জন সন্ন্যাসী বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। সন্ন্যাসী তিনি অনেক দেখিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও বড় ছিল না; কিন্তু ইঁহাকে দেখিবা-মাত্র তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। রামরায় দেখিতেছেন, সন্ন্যাসী যেন বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার গাত্র দিয়া

অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি যে শুধু বিস্মিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত আকৃষ্টও হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সন্ন্যাসী যেন তাঁহার মন-প্রাণ ধরিয়া টানিতেছেন। কাজেই রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুত-গমনে সন্ন্যাসীর দিকে যাইতে লাগিলেন। রামানন্দ তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া প্রভুর ইচ্ছা হইতে লাগিল যে দ্রুত-গতিতে যাইয়া তাঁহাকে হৃদয়-মাঝে চাপিয়া ধরেন। যে প্রভু বিষয়ী হইতে বহু দূরে থাকেন, যে প্রভু গভীর অটল, তিনি আজ একটি অপরিচিত বিষয়-সংসৃষ্ট শূদ্রকে হৃদয়ে ধরিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য হারাইলেন! যে প্রভু কোন এক জন ভক্তকে এক খণ্ড হরিতকী সঞ্চয় করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার অদ্যাপি সঞ্চয়-বাসনা যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত থাকিতে পারিবে না," সেই প্রভু আজ একজন ভোগী রাজাকে বাজনা বাজাইয়া স্নান করিতে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন বলিয়া চঞ্চল হইয়াছিলেন, কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিলেন। রামানন্দ প্রভুর নিকট যাইয়া শির লোটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "উঠ, কৃষ্ণ বল।" তারপর বলিলেন, "তুমি না রামানন্দ?" রামানন্দ তখন করজোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে আমিই সেই পাপাত্মা শূদ্রাধম বটে।" প্রভু আর কিছু না বলিয়া, যেন চিরদিনের হারাণ বন্ধু পাইলেন, এইভাবে বিভাবিত হইয়া আনন্দে হুঙ্কার করিলেন, এবং সুদীর্ঘ ভুজদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে হৃদয় মাঝে চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে প্রণামাদি অভ্যর্থনা প্রশস্ত নহে। গৌরদাস জীবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রণাম জীবকে পৃথকীকৃত ও ছোট-বড় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবে-জীবে গাঢ় সম্বন্ধ, তাহাদের মধ্যে ছোট-বড় নাই। সকলেরই উৎপত্তি-স্থান ও গতি এক। যাঁহারা এই

ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের জীবমাত্রের প্রতি গাঢ় আকর্ষণ হয়, তখন আর প্রণামরূপ অভ্যর্থনায় তৃপ্তি হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের এখন হীন-দশা বলিয়া, প্রণামের এবং সেই সঙ্গে কপট-দৈন্যের ঘটা অধিক হইয়াছে।

প্রভু যেন চিরসুহৃদ পাইয়া রামরায়কে হৃদয়ে ধরিলেন ও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামানন্দও যেন চির-আশ্রয়-স্থান পাইয়া আর ইহাতে এত সুখের উদয় হইল যে, ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া,—তিনিও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন, সতী-স্ত্রী ও মৃত-পতি যেরূপ ভাবে চিতায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রভু ও রামরায় পরস্পরে বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অচেতন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিলেন।

রামানন্দ যখন সন্ন্যাসীর দিকে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীদিগের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলে প্রভুকে দেখিলেন, এবং তাঁহার ও তাহাদের রাজার কাণ্ড দেখিলেন, ইহা দেখিয়া সকলে ভক্তিতে গদগদ হইয়া, আপনাপন রুচি অনুসারে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোক মূহূর্ত্ত মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন।

প্রভু ও রামানন্দ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন; এবং তাঁহাদের উভয়ের অঙ্গ পুলকে আপ্লুত হইয়া প্রেমানন্দ ধারায় বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে উভয়ে উঠিলেন ও সুস্থ হইয়া বসিলেন। একটু চাওয়া চাহির পর, প্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণে আসি, তখন তথাকার বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে বলেন যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোত্তম রামানন্দ রায়কে দর্শন করিও। সেই নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। আমি বড় ভাগ্যবান্, তাহাই অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম।" ইহাতে (যথা চরিতামৃত মধ্য: ৮ম পঃ)

রায় কহে, সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য জ্ঞান। পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥৩২॥
তাঁহার কৃপায় পানু তব চরণ দর্শন। আজি সফল হইল মোর মনুষ্যজনম ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন। অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ। কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ-ভয়। মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন। পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তাড়িতে পামর। নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর ॥

তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোক—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥৩২॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন। তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥
"কৃষ্ণ" "হরি" নাম শুনি সবার বদনে। সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥
আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ। জীবে না সম্ভবে এই অপ্রকৃত গুণ ॥

প্রভু বলিলেন, "আমাকে ওরূপ কথা কেন বলিতেছ? তুমি পরম ভক্ত, তোমার সঙ্গীদিগের মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম,—ইহা আর বিচিত্র কি? তোমার দর্শনে ইহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহার সাক্ষী দেখ। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানি না। কিন্তু তোমার স্পর্শে আমারও কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে! আমি এখন বুঝিলাম, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্তই সার্ব্বভৌম তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

উভয় উভয়ের দর্শনে আনন্দে ভাসিয়া, উভয় উভয়ের স্তুতি করিতেছেন, এই সময় একজন ব্রাহ্মণ করজোড়ে প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রভুও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামানন্দ রায়ের প্রতি মধুর হাসিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে। সেইজন্য তোমার আবার দর্শন কামনা করি।" এরূপ কথা, যাহা প্রভু সেই বিষয়-জড়ীভূত শূদ্রকে বলিলেন,

তাহা তিনি কস্মিন্‌কালে কাহাকেও বলেন নাই। রামানন্দ বলিলেন, "স্বামিন। যখন কৃপা করিয়া এই পামরকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন দিন কয়েক এখানে থাকিয়া আমার কঠিন ও মলিন হৃদয় বিশেষ করিয়া মার্জ্জিত না করিলে, উহা শোধিত হইবে না।" রামানন্দ রায় ইহা বলিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। দর্শন মাত্রেই পরস্পরে প্রেমডোরে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন যে, এই ক্ষণিক বিদায়ের নিমিত্ত উভয়েই বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন। পরস্পরের দর্শন লালসা ক্রমেই বাড়ীতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত গেলে, রামানন্দ সামান্য বেশে একটি মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, গোপনে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন; এবং রামরায় প্রভুকে প্রণাম ও প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে বসিলেন।

প্রভু বলিলেন, "বল রামরায়, জীবগণ কিরূপ সাধন-ভজন করিলে উদ্ধার হইবে?"

এখন রামরায় প্রভুকে জানেন না;—প্রভু কে, তাঁহার কি মত, তাহাও জানেন না! প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে স্তুতিবাক্য। সন্ন্যাসী মাত্রই "নারায়ণ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রামরায় কেবল এই মাত্র জানিয়াছেন যে প্রভু একটি শ্রীশক্তিসম্পন্ন অতি বৃহৎ বস্তু ও কৃষ্ণভক্ত; এবং তাঁহার চিত্ত একেবারে হরণ করিয়া সেই স্থলে উপবেশন করিয়াছেন; প্রভুর এই প্রশ্নের হঠাৎ কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আবার প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিয়া, যে কথা কাটাকাটি করিবেন ও বলিবেন "আগে আপনি বলুন" ইহা পারিলেন না,—বলিতে সাধ্যও হইল না। কাজেই আপনার মত গোপন করিয়া, সর্ব্বসাধারণোপযোগী যে

মত, প্রথমেই তাহাই বলিলেন ; অর্থাৎ বলিলেন, "স্বামিন্! আমি সাধন-ভজনের কথা কিছু জানি না। তবে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, ঐ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আছে,—"যাহার যে স্বধর্ম্ম, তিনি তাহা পালন করিলে, পরিণামে তাহার শ্রীভগবানে ভক্তি হয়।"

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে আর নাই। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলে নরকে যাইবে। মুসলমানেরাও তাহাই বলেন। কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে, শুধু স্বধর্ম্ম-পালন দ্বারা ক্রমে সকলে উদ্ধার হইবেন। কারণ স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ক্রমে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় ; আর তখন জীব উদ্ধার হইয়া যায়। তবে কি, ধর্ম্মের ভাল মন্দ নাই ? অবশ্য আছে। জীবের পরিবর্দ্ধনই গতি। যে ধর্ম্মে তোমার এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবর্দ্ধিত হইলে উহা অপেক্ষা সারবান আহার তোমার প্রয়োজন হইবে। রামরায় ও প্রভুতে যে অদ্ভুত কথোপকথন হয়, ইহা দ্বারা, জীব কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়াছে, তাহাই বিকসিত হইতেছে। এরূপ কথোপকথন জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। রামরায় যে উত্তর করিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা তিনি মানিয়া লইলেন,—যথা শ্রীভগবান আছেন ও ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে তিনি যে উত্তর করিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃত মত কি, তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

প্রভু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রামরায়, এত তুমি মোটা কথা বলিলে। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যদি কিছু থাকে তবে বল।" রামরায় তখন গীতার একটি শ্লোক পড়িয়া বলিলেন যে, "গীতায় দেখিতে পাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, জীব যে কোন কর্ম্ম করে, উহা আমাকে সমর্পণ করিয়া করিলেই তাহার সাধনা সিদ্ধ হয়।" প্রভু বলিলেন, "এ সমুদায় কথা বাহ্য। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যাহা জান তাহাই বল।"

হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে যে, রামরায় গীতার যে কথা বলিলেন, উহা অতি বড় কথা। এমন কি, খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে এ কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রার্থনার মধ্যে—"প্রভু তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক"—এই নিবেদন প্রধান। কিন্তু প্রভু এ কথা মানিলেন না; যেহেতু জীবে ও ভগবানে যে কোন ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা ইহাতে বুঝা যায় না। রামরায় তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "এ কথা যদি বাহ্য হয়, তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই প্রকৃত সাধক।" এ কথার প্রমাণও রামরায় দিলেন। কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়া দিলেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে এত অনুরাগ যে, তাঁহাকে পাইবার লোভে আপনার কুলধর্ম্মও ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্য শ্রীভগবানের প্রিয়। কিন্তু রামরায়ের কথায় ঠিক তাহা বুঝাইল না। মনে ভাবুন সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বলিয়া যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান হয়, তবে কি সে বড় সাধক হইল?

রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয় যোগে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক।" প্রভু এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার বিরোধী। মনে ভাবুন, যদি কোন স্ত্রী ভাবেন যে, এইজন্য স্বামী স্ত্রীলোকের পরম-গুরু, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি না করিলে মহাপাপ হয়, কি সংসার বিশৃঙ্খল হয়, কি দুঃখের উৎপত্তি হয়; তবে তাহার সে ভক্তি এক প্রকার স্বার্থপরতা। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি বলিতে মোটামুটি এই বুঝায় যে, শ্রীভগবান্ জীবন-মরণের কর্ত্তা, সুতরাং তাঁহাকে ভক্তি না করিলে ক্ষতি, করিলে লাভ। এরূপ হিসাব করিয়া যিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন, তিনি শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন না, আপনার স্বার্থের পোষণ করেন।

রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।" ইহা বলিয়া শ্রীভাগবত হইতে একটি শ্লোক পড়িলেন। যখন রামরায় এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তির কথা উঠাইলেন, তখন প্রভু একটু সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এ ভাল কথা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আবও কিছু ভাল কথা যদি থাকে তবে বল।"

জ্ঞানশূন্য ভক্তি কাহাকে বলি, না উদ্দেশ্যশূন্য ভক্তি। সম্রাটকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম, আর বলিলাম, "রাজন্! আমি তোমার দাসানুদাস।" কিন্তু মনে রহিল যে, রাজা আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, হইয়া আমার ভাল করিবেন। ইহাকে রাজভক্তি বলে না, ইহাকে বলে তোষামোদ। অতএব জ্ঞানশূন্য যে ভক্তি, ইহা দ্বারাই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম পাওয়া যায়। প্রভু ইহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি আরো গুহ্য-কথা শুনিতে চাহিলেন। তখন রামরায় প্রেমের কথা উঠাইলেন।

এতক্ষণ রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকারে আসিলেন। ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই রাজ্যে বিভক্ত,—শ্রীগীতার রাজ্য ও শ্রীভাগবতের রাজ্য জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি গীতার শেষ সীমা। জ্ঞান-শূন্য ভক্তি শ্রীভাগবতরাজ্যের আরম্ভ। যে পর্য্যন্ত রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত প্রভু "ইহা বাহ্য" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। যে মাত্র রামরায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগবত-রাজ্যের সীমায় আসিলেন, সেই প্রভু বলিলেন, "ইহা ভাল বটে, কিন্তু ইহার পরে আরও বল।"

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য শ্রীভগবানের এই দুই ভাব। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান,—এই গেল তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব; আর তিনি তাঁহার রূপ ও গুণে আকর্ষণ করেন,—এই গেল তাহার মাধুর্য্যভাব। গীতায় শ্রীভগবানকে ঐশ্বর্য্যভাবে

ভজনার কথা লেখা, আর শ্রীভাগবতে মাধুর্য্যভাবের ভজনা বিরচিত। গীতার রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান প্রাচীন-হিন্দুধর্ম্ম। এই কয়েক ধর্ম্মের সার-কথা গীতায় উদ্ধৃত আছে। এই সমস্ত ধর্ম্মে যে যে কথা ছড়ান আছে, উহা গীতায় একত্রিত করা হইয়াছে ও পর পর সাজান হইয়াছে। মিঠাইকার তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের খাদ্যদ্রব্য সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখে, গীতায় সেইরূপ জগতের যত ধর্ম্ম ও সে সমুদায় যত রস আছে, তাহা সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তাই গীতা জগতে আদরিত।

শ্রীভাগবত জ্ঞানশূন্য-ভক্তি হইতে আরম্ভ। শ্রীভগবান যে নিজজন জ্ঞান থাকিলে, ইহা হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু বোধ অর্থাৎ আস্বাদ করা যায় না। শ্রীভাগবত-গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান্ নিজ-জন, আর নিজ-জন রূপে তাঁহার যে ভজনা তাহা দ্বারাই "তাঁহাকে" পাওয়া যায়। নিজ-জন কাহাকে বলে? না,—পিতা কি প্রভু, সখা কি ভাই, সন্তান কি পতি ইহারাই নিজজন। আর প্রভু কে? না,—যিনি ক্রীত-দাসের মরণ-বাচনের কর্ত্তা। ক্রীত-দাসের নিজ-জন প্রভু ব্যতীত আর কেহ নাই,—যেমন পুত্রের নিজ-জন পিতা বই আর নাই। আর নিজ-জন কে? না,—বন্ধু বা ভাই-ভগ্নী। আর কে? না,—পতি বা পত্নী। এই সমুদায় নিজ-জন লইয়া সংসার।

সেকালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও কোন কোন দেশে আছে। এই দাস শব্দ হইতে দাস্য-ভক্তি কথাটি লওয়া হইয়াছেন। তুমি একজন সংসারী। এখন দেখ, তোমার সংসার পাতাইতে কি কি লাগে। তুমি, তোমার সন্তান, তোমার জনক-জননী, তোমার অতি আত্মীয় ও তোমার ঘরণী। এই যে কয়েকটি বস্তু লইয়া সংসার, ইহাদের পরস্পরে যে আকর্ষণ তাহাকে—'প্রেম', কি 'রস', কি 'ভাব' বলে।

সন্তানের পিতার প্রতি যে ভাব, তাহাকে দাস্য-প্রেম বলে। যদি বল ক্রীত-দাসের আবার প্রভুর উপর প্রেম কি? কিন্তু ক্রীতদাসের জগতে আর কেহ নাই; প্রভুর সহিত থাকিয়া-থাকিয়া, প্রভুর নিজের ও তাহার গণের প্রতি সে আকর্ষিত হয়। এমন কি, শুনা যায় যে, ক্রীত-দাস প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও দিয়াছে। পুত্রের পিতার উপর যে প্রেম, ইহাকে শাস্ত্রকারেরা দাস্য-প্রেম বলেন। ফল কথা, শ্রীভগবানকে পিতা-বলিয়া বোধ, ও প্রভু-বলিয়া বোধ,—এই দুই ভাবে বড় বিভিন্নতা নাই। দাসের প্রভুর প্রতি খানিক স্নেহ, খানিক ভক্তি ও খানিক ভয় আছে। সন্তানেরও পিতার প্রতি তাহাই আছে।

তাহার পর, জীবমাত্রের অন্ততঃ একজন অতি আত্মীয় আছেন। তিনি যদিও সকল অবস্থায় এক সংসার-ভুক্ত থাকেন না, কিন্তু সংসার পূর্ণমাত্রায় পাতাইতে একটি সখার প্রয়োজন। এইরূপ আত্মীয়ের উপর এক প্রকার স্নেহ আছে, তাহাকে বলে সখ্য-ভাব। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি সুখদুঃখের সাথী, তাঁহাকে মনের বেদনা বলিতে কোন বাধা নাই। তিনি আর তুমি এক শ্রেণীর লোক,—তুমিও বড় না, তিনি বড় না। তিনি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তোমার ন্যায় অতি পরিমিত। এইরূপ যে ভাব, সে গেল সখ্য-প্রেম। বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

আমরা এইরূপে সংসার পাতাইয়া বাস করি। আমরা এই সংসার পাতাইয়া বাস করিব বলিয়া, শ্রীভগবান্ তাহার উপযোগী সমুদায়, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র পিতামাতা আত্মীয়স্বজন দিয়াছেন; অতএব এই সংসার-পাতানই আমাদের স্বাভাবিক গতি। এই সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমরা শ্রীভগবান্‌রূপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে আকর্ষণের প্রয়োজন। এই আকর্ষণ যদি না থাকে, তবে চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। যদি আকর্ষণের সহায়তা লইতে পার, তবে কেন্দ্র দিকে যাইতে পারিবে। এই আকর্ষণ হইতেছে—প্রেম। এই প্রেমে পরিবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই প্রেমে সর্ব্ব-পরিবার শ্রীভগবানে আবদ্ধ। উপরে বলিয়াছি, এই প্রেম চারি প্রকার—দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর; আর, সংসার পাতাইয়া বাস করা জীবের স্বভাব। অতএব এই সংসার যে প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবান্‌কে এই সংসারভুক্ত করিতে হইলে সেই প্রণালী ব্যতীত আর গতি নাই। আর যে গতি নাই, তাহার অপর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না,—ইহা স্বীকার করিলেই হইবে যে, সংসার পাতাইয়া বাস করা আমাদের স্বভাব। অতএব এই সংসারের যে চারিটি বস্তু—পুত্র, সখা, পতি ও পিতা, ইহার মধ্যে শ্রীভগবান্‌কে একজন কর। হয় তাঁহাকে পিতারূপে, না হয় সখারূপে, না হয় পুত্ররূপে, না হয় পতিরূপে ভজনা কর। তাহা না করিলে তাঁহাকে সংসারে স্থান দিতে পারিবে না,—তিনি বাহিরের লোক হইবেন।

এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতের সার সংগ্রহ। এখন মনে ভাব, তুমি যেন শ্রীভগবান্‌কে পিতারূপে ভজনা করিবে। তাহা হইলে সে ভজনা-প্রণালী কিরূপ তাহা শিখিতে তোমার আর কোথাও যাইতে হইবে না। যেরূপ সুবোধ শিশু-পুত্র সর্ব্বগুণনিধি পিতাকে ভজনা করে, সেইরূপ করিলেই হইবে। শিশু-পুত্র বলি কেন?—না, তাঁহার নিকট সকলেই শিশু। এখন বিচার কর, এরূপ পিতাকে পুত্র কিরূপে ভজনা করে।

এই প্রভুকে,—সখা, কি সন্তান, কি পতি ভাবে, দুইরূপে ভজনা করা যাইতে পারে,—হয় সাক্ষাৎ ভাবে, অথবা গোপীর অনুগত হইয়া। সাক্ষাৎ ভাবে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, তাহাই এখন বলিতেছি। প্রথমে

ধ্যানে তোমার পিতাকে ভজনা করিতে থাক। যদি বল তিনি জীবিত আছেন, তবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা কর। যদি তোমার কোন গুরু থাকেন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপ সেবা করিলে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে প্রভুকে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, তাহা জানিতে পারিবে। তখন সেই পিতার স্থানে শ্রীভগবান্‌কে বসাইবে। এই যে তোমার মধুর প্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক ;—এত স্বাভাবিক যে, সে ভাবের বস্তু না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে ; যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাকে অপূর্ণ ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারি-ভাব স্বাভাবিক, আর এই চারি-ভাবের বস্তুর নিমিত্ত লালসাও স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা জীবের দ্বারা কতক পরিপূরিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। যেহেতু এই ভাবের বস্তুগুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিপ্রাণা সতী আপনার পতির নিমিত্ত প্রাণ দিবেন ; কিন্তু তবু দেখিবে যে, তাঁহার পতি নির্ম্মল কি পূর্ণ নহেন। অতএব তাঁহার মধুর-ভাবের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি-সাধন হইতেছে না। এই ভাবের পিপাসা তখনই শান্তি হইবে, যখন ইহার বস্তু নির্ম্মল ও পূর্ণ হইবে। এমন বস্তু শ্রীভগবান্ বই আর নাই। অতএব এই ভাবগুলির দ্বারা যখন শ্রীভগবান্‌কে ভজন করা হয়, তখনি জীবের প্রকৃত প্রয়োজন সাধন হয়,—তখনি জীব প্রেমানন্দ-তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতে থাকে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতেছি, অর্থাৎ শ্রীপ্রভুতে ও রামরায়ে যে বিচার তাহা এখন বর্ণনা করিব।

প্রভু স্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনা হয়। তারপর তিনি বলিলেন, "রামরায়! আরো গূঢ় কথা বল।" তখন রামরায় বলিলেন, "সর্ব্বোত্তম সাধনা, শ্রীভগবান্‌কে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা ভজন করা।" এ কথা শুনিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন ; তবে বলিলেন,

"এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু যদি আরো কিছু নিগূঢ় থাকে, তবে কৃপা করিয়া তাহা বল।" তখন রামরায় দেখিলেন যে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—এই তাঁহার নিজ দেশ। তখন তিনি ভক্তির কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "দাস্য-প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে সেবা করাই সর্ব্বোত্তম ভজন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সাধু রামরায়! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে; "কিন্তু তারপরেই বলিতেছেন, "ইহা অপেক্ষা আরও কি কিছু উত্তম আছে?"

তখন রামরায় বলিলেন, "আছে, সে সখ্য-প্রেম। শ্রীভগবান্‌কে প্রভু বলিয়া ভজন করায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা সুহৃদ্ বলিয়া ভজন করায় অধিক আনন্দ।" প্রভু বলিলেন, "আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আরও যদি কিছু নিগূঢ় থাকে, তাহা বল; আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

রামরায় তখন এক প্রকার গ্রহগ্রস্ত হইয়াছেন তখন যেন তিনি আর স্ববশে নাই; তিনি যেন প্রভুর জিহ্বা-যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছেন। প্রভু যেন সাধন-তত্ত্ব তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রামরায় প্রভুর কথার উত্তরে বলিলেন যে, "সখ্য-প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য-প্রেম আরো গাঢ়। অতএব শ্রীভগবান্‌কে আপনার পুত্র ভাবিয়া যদি ভজন করা হয়, তবে উহা সাধনার এক প্রকার শেষ-সীমা হয়।"

ইহাতে প্রভু বলিলেন, "রামরায়, তুমি আমাকে একেবারে বিনামূল্যে ক্রয় করিলে, তবে আরও যদি গুহ্য কিছু থাকে তবে বল। তখন রামরায় বলিলেন, "আছে; শ্রীভগবান্‌কে কান্তভাবে ভজনা করা।" এখানে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে—এহো হয়, কিছু আগে আর। রায় কহে—সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। রায় কহে—বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে—এহোত্তম, কহ আগে আর। রায় কহে—কান্ত-ভাব প্রেমসাধ্যসার॥"

রামরায় এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-রাজ্যের শেষ-সীমায় আসিয়া ভাবিলেন, এখানে বিশ্রাম করিবেন। এই উদ্দেশ্যে কান্তভাব কি, তাহাই বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "স্বামিন্! সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্তি। তবে প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে—আংশিক ও পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু সাধক ইহাদের প্রভেদ বড় বুঝিতে পারেন না। যদি সমুদায় ব্যঞ্জন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেটি অগ্রে বদনে দেন সেইটি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভাবিয়া থাকেন। শ্রীভগবানে এত মধু আছে যে, জীব যখন যে অংশ পায়, তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এমন কি, শ্রীভগবান্‌কে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন, তাঁহার কাছে সেই ভাবই সর্ব্বোত্তম বলিয়া বোধ হয়। রামরায়ের কথার তাৎপর্য্য এখন পরিগ্রহ করুন।

যাঁহারা দাস্যভাবে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাঁহারা বলেন, দাস্যভাব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে এমন সব ভক্তও আছেন যাঁহারা বলেন যে, দাস্যভাবই সর্ব্বোত্তম, এবং কান্ত প্রভৃতি অন্যান্য ভাবে ভজনা করা জীবের অধিকার নাই।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলেন, তখন পশ্চিমদেশে বল্লভাচার্য্য ও ঐরূপ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার মত এই যে, বাৎসল্য প্রেমই সর্ব্বোত্তম। এই মত প্রচার করিতে করিতে, ক্রমে তিনি নীলাচলে প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। শ্রীধরস্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, উপরে রামরায় যাহা বলিলেন, ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন;—অর্থাৎ কান্তভাবই সর্ব্বোত্তম। কিন্তু বল্লভ ভট্ট, শ্রীধরস্বামীর টীকা উড়াইয়া দিয়া, আপনি শ্রীভাগবতের টীকা করিলেন এবং বাৎসল্য-প্রেমই যে সর্ব্বোত্তম, তাহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি বৃহৎ গ্রন্থও লিখিলেন,

এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দেশে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। ইঁহার শিষ্যগণ অদ্যাপিও সেই সমস্ত দেশে বড় প্রবল। ইঁহার উপাচার্য্যগণকে "গোকুলে গোঁসাই" বলে। ইঁহাদের শিষ্যগণ প্রায়ই বণিক, কাজেই আচার্য্যগণের অনেকের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের গণ "করঙ্ককাস্থাধারী", কিন্তু গোকুলে-গোস্বামীর মধ্যে অনেকেই রাজরাজেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ী আচার্য্যগণের মধ্যেও ঐশ্বর্য্য-লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বাস-প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পার্ষদগণ কাঙ্গাল হইতেও কাঙ্গাল-রূপে অবস্থিতি করিয়া জীব উদ্ধার করিতেন। তাঁহাদের দীন-বেশ দেখিলে জীবের হৃদয় দ্রব হইত। এখানকার আচার্য্যদের মধ্যে কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জীবের হৃদয় দ্রব হয় না, বরং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্য নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, শেষে আপনি তাঁহার শরণাগত হইলেন। এমন কি, শেষে তিনি শ্রীগদাধর গোস্বামীর নিকট যুগল-মন্ত্র লইয়া কান্তভাবে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা দেশে রহিলেন, তাঁহারা বল্লভাচার্য্যের পূর্ব্বকার মত পালন করিতে লাগিলেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে "বল্লভাচারী" বলে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ সন্তান-ভাবে উপাসনা করেন।

রামরায় প্রভুকে বলিতেছেন, "যাহার যে ভাব, তাহার কাছে সেই উত্তম সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সব যে সমান তাহা নয়,—ভাল মন্দ অবশ্য আছে। দাস্যভাব যে অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দাস্য অপেক্ষা সখ্য আরও ভাল, যেহেতু সখ্যভাবে দাস্য ও সখ্য উভয়ই আছে। সেইরূপ মধুর-ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর-ভাবে

দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও কান্ত,—এই চারি ভাবই জড়িত আছে। অতএব যিনি মধুর-ভাবে ভজনা করেন, তিনি কর্ত্তব্যে—চারি ভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই সর্ব্বোত্তম অধিকারী।”

রামরায় বলিলেন যে, মধুর-ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত এই চারি ভাব আছে, ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে স্ত্রীলোকের স্বামী। স্ত্রী কখন স্বামীর দাসী হয়েন, কখন সখী হয়েন, কখন মাতা হয়েন, কখন বা বক্ষবিলাসিনী হয়েন। রামরায় বলিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্তভাবেই হয়। এইরূপে রামরায়, শ্রীভাগবত-রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইয়া বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন, “রামরায়, তুমি যে বলিলে, ‘সাধনার এই শেষ-সীমা’ ইহা ঠিক, তবে আরও কিছু বাকি থাকে ত বল।” এই কথা শুনিয়া রামরায় অবাক হইলেন। যথা :—

রায় কহে—“ইহার আগে পুছে কোন্ জনে। এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥”

রামরায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে আবার কি? ইহা ভাবিবার কারণও রামরায়ের আছে। পাঠক মহাশয় যদি এ পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন যে, ইহার পরে আবার কি হইতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ রামরায়ের মনে স্ফূর্ত্তি হইল; তিনি বলিলেন, “ইহার অগ্রে—রাধার প্রেম?”

ইহা শুনিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “রাধার প্রেম যদি কান্তভাব অপেক্ষাও গাঢ় হয়, তবে তাহার কারণ কি বল। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা যেন অমৃতের ধার। ইহা শুনিয়া অঙ্গ শীতল হইতেছে। বল বল রামরায়! রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন?”

রামরায় তখন বলিতেছেন, “ত্রিজগতে রাধার প্রেমের তুলনা নাই। শত কোটি গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বসবাস করিলেন, কিন্তু রাধা ব্যতীত

অপর কাহারও দ্বারা তাঁহার প্রেম-পিপাসা শান্তি হইল না।" তখন প্রভু বলিলেন, "ইহাই সাধনের সীমা সন্দেহ নাই। তবে আরও কিছু নিগূঢ় যদি থাকে, তাহা বলিয়া আমার কর্ণ শীতল কর।"

প্রভু ওহে—এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে—ইহা বহি বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥

রামরায় যে এরূপ বলিলেন, ইহাতে তাঁহার দোষ কি? সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সৃষ্টির নানা দ্রব্য আছে। কিন্তু জীবের দৃষ্টি সীমা-বিশিষ্ট, সেই সীমা জীব অতিক্রম করিতে পারে না। তাই রামরায় কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিতেছেন, "স্বামিন! আর শক্তি নাই। যাহা দিয়াছিলে সব নিঃশেষ হইয়াছে। যদি আর কিছু শক্তি দাও তাহা হইলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারি! তবে আমার নিজকৃত একটি গীত আছে। সেটি গাইতেছি। উহাতে আপনাকে সুখ দিবে কি না জানি না।" ইহা বলিয়া রামরায় এই গীতটি গাইতে লাগিলেন। যথা :—

পহিলেহি রাগ নয়ন-ভঙ্গে ভেল। অনুদিত বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী। দুহু-মন মনোভাব পেষল জানি ॥
এ সখি, সো সব প্রেম-কাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোঁজলুঁ "দোতী·না খোঁজলুঁ আন। দুহুঁ কো মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ ॥
অব্ সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী ॥ সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন·রুদ্র নরাধিপ-মান্। রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্যের পরে আর একটি "পাত্রের" সহিত প্রভু এই মিলিত হইলেন। রামানন্দ রায় অনুরাগী ভক্ত, কাব্য ও সঙ্গীত তাঁহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক-শিরোমণি। রামানন্দ রায় গাহিতে আরম্ভ করিলে, প্রভু প্রেমে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। ক্রমে এরূপ অধীর হইলেন যে, আর শ্রবণ করিতে না পারিয়া—"চুপ্" "চুপ" এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য নিজ হস্ত দ্বারা

রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। মনের ভাব এই,—"চুপ! এ অতি পবিত্র বস্তু; বহিরঙ্গ লোকে শুনিবে,—চুপ্!"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীমা। গীতার আরম্ভ মায়াবাদ হইতে। শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ—জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির অপর পার—জ্ঞান-শূন্য ভক্তি হইতে; সেখান হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেমের কাণ্ড রাধা-ভাবে সমাপ্ত। এখন রামরায় যাহা বলিলেন, ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণই সম্ভোগ করিতে পারেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বাক্য—

ভ্রান্তং যত্র মুনিশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিত শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥১৮॥

অর্থাৎ—"যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের নিকটেও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন" ॥১৮॥

রামরায়ের উপ-উক্ত গীতে প্রেমের চরমসীমা বিরচিত হইতেছে। অতএব প্রেমের রাজ্যটি একবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে, জড়জগতে পরস্পরের মিলন করিবার শক্তিকে বলে আকর্ষণ, আর জীব-মণ্ডলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম। সূর্য্যকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, তাহার চতুষ্পার্শে গ্রহগণ উপগ্রহ সঙ্গে করিয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়। এ সমুদায় আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা হয়। আকর্ষণে উপগ্রহও সংযোগ সিদ্ধ হয়, আর আকর্ষণে ইহারা সূর্য্যের চতুষ্পার্শে ঘুরিয়া

বেড়ায়। এইরূপ জীবগণ এই প্রীতি-বন্ধন দ্বারা সংসারাবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড়-জগত ও জীব-জগত নানা নিয়মের অধীন; কিন্তু ইহাদের যত প্রভু আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রভু—আকর্ষণ কি প্রেম। ইহা অতিক্রম করিতে তাহারা পারে না; তাহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই প্রেমের শক্তি এখন বিবেচনা কর। স্বামী দেহ ত্যাগ করিলে তাহার স্ত্রী ঐ দেহের সহিত স্ব ইচ্ছায় এমন কি জিদ করিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছেন। কোন ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে? মনুষ্যের উপর কেবল প্রীতিরই এইরূপ আধিপত্য আছে। রেলের গাড়ী হইতে সন্তান পড়িয়া গেলে, তাহার পিতা তদ্দণ্ডে সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হইতে লম্ফ দিতে পারেন। প্রেমের শক্তির আরও উদাহরণ দিতেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, জগতের এক প্রান্তে বাস করিবে, তবে তুমি একটিও সঙ্গী পাইবে না; যদিও কেহ যায়, তবে বিশেষ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যাইবে। কিন্তু যদি তুমি যাইবার সময় তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে তিনি রোদন করিবেন, সমুদায় ভুবন অন্ধকার দেখিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে সাধ্যসাধনা করিবেন। যে শক্তি স্ত্রী ও স্বামীকে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে তাহার তেজ এখন অনুভব করুন।

শাস্ত্রে বলে, কোন বংশে একজন সাধু হইলে তাঁহার বহু পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়; প্রকৃতপক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও উদ্ধার হইতে পারেন। বেলুন-যন্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠে; আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে, সেই বেলুন অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে। দুটি জীব প্রীতি আবদ্ধ,—একজন পবিত্র, আর এক জন অপবিত্র। যে পবিত্র, সে তাহার অপবিত্র সঙ্গীকে

ঊর্দ্ধদিকে ও যে অপবিত্র, সে তাহার পবিত্র সঙ্গীকে অধোদিকে আকর্ষণ করে। এই টানাটানিতে,—কখন পবিত্র, কখন-বা অপবিত্র জীবের জয় হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর চিন্তামণি বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন, তাহাতে চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া গেল। আবার মুনি ঋষি মহাতপ করিয়াও কুসঙ্গের শক্তিতে অধঃপাতে গিয়াছেন।

যেমন ধূমকেতু সূর্য্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ লইয়া সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাঁহাদের নিজ-জন লইয়া শ্রীভগবানের দিকে গমন করেন। সর্ব্বজীবে সমান দয়া, কি সমান স্নেহ জীবে সম্ভবে না,—ইহা কেবল স্বয়ং শ্রীভগবান্ই পারেন। সেই নিমিত্ত প্রেম পরিবর্দ্ধনের জন্য শ্রীভগবান্ মনুষ্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া বাস করিবার বলবৎ বাসনা দিয়াছেন। তাই, জীব সংসার পাতাইয়া বাস করে। এই সংসার তাহার উদ্ধার কি পতনের কারণ। যদি সে ব্যক্তি স্বয়ং, কি তাহার যে প্রিয় সে সাধু হয়, তবে সে ব্যক্তিও উদ্ধার হইয়া যায়। আর যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে সে সংসারে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এই নিমিত্ত প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত সংসারে বাস করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যখন কোন জীব দেখেন যে, সংসার তাহাকে অধোদিকে লইয়া যাইতেছে, তিনি উহা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে যাইতে পারিতেছেন না, তবে শেষকালে তাঁহার সংসার হইতে দূরে বাস করাই কর্ত্তব্য। আর এই নিমিত্ত, আমাদের দেশের ভাল লোকেরা প্রৌঢ় বয়সে, হয় বনে, না হয় তীর্থস্থানে জীবন যাপন করিতেন। ইহাতে তাঁহারা স্বয়ং উদ্ধার হইতেন ও তাঁহাদের নিজজনকেও উদ্ধার করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী রহিলেন, দেখিয়া অনেক ভক্ত সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন।

তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তাঁহার সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি স্বয়ং এইরূপ সংসারে প্রবেশ না করিলে, ভক্তগণ উহা করিবেন না। অতএব সংসার ত্যাগ করা ধর্ম্ম নয়, সংসারে বাস করাই ধর্ম্ম। তবে সংসারে বাস, যতদুর সম্ভব নির্লিপ্ত হইয়া করিতে হইবে। কাহাকেও অতিরিক্ত ভালবাসিও না, আর যদি তাহা কর, তবে ভজন সাধন দ্বারা আপনাকে এরূপ শক্তিসম্পন্ন করিবে যে, তাহার প্রেমে তোমার অধোগতি না হয়।

জড়জগতের আকর্ষণ সমভাবে থাকে, কিন্তু প্রেম পরিবর্দ্ধনশীল। সংসারে বাস করিয়াও পরিবর্দ্ধন হয়, আর ভজনসাধন দ্বারা ভগবৎ-প্রেম পরিবর্দ্ধন করিতে হয়। প্রেম দুই রূপ,—অহেতুক ও হেতুক, বা পরকীয় ও স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, আর যাহার হেতু নাই সে পরকীয়। এখন বিবেচনা করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয়-প্রেম প্রেমই নয়। "সোনার পাথরের বাটি" যেরূপ অসংলগ্ন, "স্বকীয় প্রেমও" সেইরূপ দুটি অসংলগ্ন বস্তু। কিন্তু স্ত্রী-স্বামীতে যে প্রেম, উহা "স্বকীয়"। এ প্রেমের হেতু এই যে, স্ত্রীর প্রেমের বস্তু স্বামী ;—যে কেহ তাঁহার স্বামী হউন তাঁহাকেই তিনি ঐরূপ ভালবাসিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসেন উহা প্রকৃত প্রেম নয় উহার মূল "স্বার্থপরতা"। সেইরূপ জননী যে সন্তানকে ভালবাসেন, তাহাও প্রকৃত প্রেম নয়। কারণ তাঁহার সন্তানমাত্রই তাঁহার ভালবাসার পাত্র। অতএব "বিশুদ্ধ-প্রেম" বা "অকৈতব-প্রেম", অর্থাৎ যাহাতে স্বার্থগন্ধ নাই, তাহা পরকীয় ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে না। এই পরকীয়, অর্থাৎ অহেতুক বা নিস্বার্থ বিমল-প্রেম হইতে অখণ্ড-আনন্দময় যে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বকীয়-প্রেমে অর্থাৎ কান্ত-ভাবে, স্বার্থ-গন্ধ আছে বলিয়া ইহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না।

আকর্ষণ জড়জগতের প্রাণ। আকর্ষণ যেরূপ নানা প্রকার আছে, প্রীতিও সেইরূপ,—দাস্য-সখ্যাদি নানা প্রকার আছে। আকর্ষণ যেরূপ জড়-জগৎকে পৃথকীকৃত করিয়া প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত ও পৃথক-পৃথক প্রকৃতি-সম্পন্ন করে, প্রীতিও জীবগণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া থাকে। জীবগণ এই আকর্ষণ-তত্ত্ব বিচার করিয়া, উহার উপর যেরূপ আধিপত্য স্থাপন এবং জড়জগতকে আপন করায়ত্বে আনয়ন করে, সেইরূপ প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়াও উহার উৎকর্ষ সাধন ও উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। গন্ধক ও পারদে পরস্পরে আকর্ষণ আছে, জীবগণ অনুসন্ধান দ্বারা ইহা জানিয়া, পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া যেরূপ কজ্জলি প্রস্তুত করে ; সেইরূপ প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া এবং ক্রমে উহার উৎকর্ষ করিয়া, উহার দ্বারা শ্রীভগবানের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করে। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—"এ তিন ভুবনে সারই পিরীতি।" এই প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরামরায়ের উল্লিখিত পদটিতে সেই প্রীতি-তত্ত্বের শেষ-সীমা প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের রাসলীলা বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "মধুর মুরলী" রব শুনিয়া গোপীগণ আসিলেন, এবং প্রত্যেকে একজন করিয়া কৃষ্ণ পাইয়া তাঁহার সহিত নৃত্যগীতাদি ও বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধার আভাসমাত্র আছে। উহা পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশ করিলে, দুই-একজন মাত্র উহা বুঝিতে পারিত।

এই রাধাতত্ত্ব জীবকে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া উহা নানারূপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়া রাধার প্রেম কি তাহা দেখাইলেন ; আর শ্রীরামানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, পরকীয়-রসের প্রকাশ-স্বরূপ যে শ্রীমতী, তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

এখন রামরায়ের গীতের অর্থ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! শ্যামের সহিত আমার কিরূপে প্রীতি হইল তাহা বলিতেছি। প্রথমে, তাঁহার সহিত নয়নে নয়নে মিলন হইল,—আমি তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। তদ্দণ্ডে প্রীতির সৃষ্টি হইল, এবং ক্রমে উহা বাড়িয়া চলিল, তাহার শেষ পাইলাম না।"

এখন শ্রীমতীর কথা লইয়া একটু বিচার করিব। শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা শ্রীমতী জানেন না। তাঁহাতে কোন গুণ আছে কি না,—তিনি স্নেহশীল কি নিষ্ঠুর, দেব কি দৈত্য, তাহাও জানেন না। তবে দেখা-মাত্র প্রীতি হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে,—এরূপ হয়। কোন সুন্দরী রমণীতে ও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখা-দেখি হইবামাত্র পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি হয়। এরূপ হইবার কারণ,—একজন পুরুষ, আর একজন রমণী বলিয়া। কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও ছিল না। শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"না সো রমণ, না হাম রমণী"—অর্থাৎ, "সখি! এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ বলিয়া নহে। কারণ তিনি যে পুরুষ, আর আমি যে নারী, তাহা আমি তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।" সুতরাং সামান্য সুন্দরী ও সুন্দরে যে প্রীতি, তাঁহার সহিত রাধার প্রীতি অনেক বিভিন্ন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ও স্ত্রীলোক যে পুরুষের সুখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এই যে প্রীতি হইল ইহার কোন হেতু পাওয়া যায় না, তাই ইহাকে বলে "অহেতুক প্রেম।"

শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! দুই জনের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার করিবার জন্য মধ্যস্থ একজন দূতী থাকে। সে পরস্পরে পরিচয় করিয়া দেয়, আর পরস্পরে প্রীতিবর্দ্ধনের সহায়তা করে।" অর্থাৎ "অমুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে মৃতবৎ আছেন,—এইরূপ

বলিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীমতী বলিতেছেন, আমরা পরস্পরে দর্শনাবধি অধীর হইলাম, এবং আমাদের প্রীতি আপনাপনি বাড়িতে লাগিল,—দূতীর প্রয়োজন হইল না। আমাদের দৌত্য করিল কেবল 'পাঁচ বাণ।' এই 'পাঁচ বাণ' অর্থ—পরস্পরের লোভ। এ "পাঁচ বাণ" কাম নয় যেহেতু শ্রীমতী জানেন না যে, তিনি স্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ প্রীতি মনুষ্যে সম্ভবে না, যেহেতু আমরা অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধনশীল। এরূপ প্রীতি কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধার। তিনি কে? না,—শ্রীভগবান্ পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত, আর রাধা তাঁহার প্রকৃতি-অংশ। অতএব শ্রীভগবান্‌কে দুই ভাগ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-রূপে সম্মুখে রাখিলেন; রাখিয়া এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন।

"কান্তভাবে" গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ-বিহার করেন, কিন্তু "পরকীয়ভাবে" তাঁহারা পরোক্ষ-বিহার করেন,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রীতির যে খেলা, তাই যোজকতা করিবার একজন হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা আপনারা বিহার করেন না,—রাধাকৃষ্ণের বিহার করাইয়া আনন্দ ভোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যে প্রীতি, উহা জীবে সম্ভবে না। সে এত গাঢ় এত পবিত্র, এত সূক্ষ্ম, এত মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস আস্বাদ করিয়া জীব ক্রমে প্রীতিরূপ পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়, এবং ইহা পাইয়া ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে।

হে তত্ত্বকথা! তুমি সূর্য্যের ন্যায় অতি বৃহৎ ও তেজস্কর বস্তু, তোমাকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ সহিতে

পারি না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলারূপ সুধা-সাগরে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি।*

আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি, তত্ত্বকথা সমুদায় বুঝি না। যাহা একটু বুঝি, তাহাও সমুদায় এখানে বলিতে পারিলাম না, যেহেতু সকল কথা ভাষায় কুলায় না। যাঁহারা এ বিষয়ে রসিক, তাঁহারা শ্রীগোস্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন।

সে দিনকার কথা, তখন আমি দিগম্বর শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ যে হইয়াছি, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারি না। লোকে বলে তাই শুনি, কি দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝি, কি আপনার শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া কতক জানিতে পাই। শিশুকাল হইতে মনে যে সকল সাধের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সাধগুলি সব আছে, একটিও যায় নাই। এখনও ইচ্ছা করে বালকের ন্যায় খেলা করি। তবে দেহে শক্তি নাই বলিয়া পারি না, কি লোকে হাসিবে তাই করি না। লোকে যাহাই বলুক, তবে দেখিতেছি যে, আমি ক্রমেই যেন শিশু হইতেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই যে, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অন্তরেন্দ্রিয় সকল জড়বৎ হয়; কিন্তু আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে বিলাস-রূপ যে সুখ, তাহা ভোগ করিবার শক্তি এখন নাই।

একদিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, যথা—"হে ঐশ্বর্য্য! হে ইন্দ্রিয়সুখ! আমি তোমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, সুখ তোমাদের নিকট নাই। ধন জন যাহা যাহা বিষয়-জগতে প্রয়োজন, সমস্তই পাইয়াছি। দরিদ্র ছিলাম, ধনশালি হইয়াছি; নগণ্য ছিলাম, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি; প্রণয়ের বস্তু পাইয়াছি,

---

* এই অধ্যায়ের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা আমি আমার নিজজনের নিমিত্ত লিখিলাম। বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছা করিলে এই কয়েক পাতা না পড়িয়া উল্টাইয়া যাইবেন।

ও সাধ্যমত ভাল বাসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাসাও পাইয়াছি ;— তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অর্থ করায়ত্ত করিয়া, সন্তানকে ক্রোড়ে ও প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া, ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দভোগ কি শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সাধ মিটে নাই, ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এ সাধটা কি? আর এই যে দিবানিশি প্রাণ কান্দিতেছে,— এ কেন, কাহার জন্য?

এখন বুঝিতেছি, যদি জগতের,—এমন কি ইন্দ্রলোকে বা ব্রহ্মলোকের কর্ত্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃপ্তি হইবে না —তবু প্রাণ হা হুতাশ করিবে। কোথা যাব? কার কাছে যাব? কি করিব? কিসে প্রাণ জুড়াবে? এই হা হুতাশ কিছুতেই যাইতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। আবার এই তাপ কেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। কতদিন চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, কেন আমার এইরূপ দশা।

এই মাত্র বলিলাম, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। শুধু তাই নয়, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়াই আগুন যেন শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল ;—কেন? কাহার জন্য? প্রণয়িনী অপেক্ষাও অধিক প্রণয়িনী আর কে? অতি-বড় অনেকগুলি শোক পাইয়াছি। এক একটি শোকে হৃদয়ে এক একটি গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়াছে। আমার দাদা ও মেজদাদা এবং অন্যান্য পরলোকগত নিজজনের জন্য প্রাণ কান্দে ; ইচ্ছা করে তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করি। এমনও বোধ হয় যে, তাঁহাদের যদি পাই, তবে এই দুঃখ যাইবে, আমি শীতল হইব। কিন্তু ক্রমে বুঝিয়াছি, সে আমার ভ্রম। তাঁহাদের এখন পাইলে আহ্লাদে মূর্চ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে অল্পকালের জন্য ; ক্রমে উহা ক্ষয় হইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, আবার হা হুতাশ আরম্ভ হইবে।

মহাজনগণ রাসমণ্ডল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"রাস-হাট পরে ছত্র শশধর ধরে রে। পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে রে ॥
চৌদিকে ফিরত দীপ—তারকার মালা। বটন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবালা।
কোকিল কোটাল হয়ে কামারে জাগায়। ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে শ্যাম-গুণ গায়।
ভ্রমর-হাটের বাস্ত, প্রসার যৌবন। গ্রাহক রসিকবর—মদনমোহন ॥"

এখন ফাল্গুন মাস। মন্দ-মন্দ, বলপ্রদ, স্নিগ্ধকারী, সুগন্ধ বায়ু বহিতেছে। এ বায়ু আমার সঙ্গে বরাবর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাগে। শিমুলফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতে ভানু উদয় হইতেছে। উহা দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ ডগমগ করিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, পরক্ষণেই প্রাণ আবার অস্থির হইয়া পড়ে। তখন ভাবি যে, এ সুখ কাহার সহিত ভোগ করিব, আমার এ সুখের সাথী কে?

ফাল্গুন মাস আমার নিকট চিরদিন বিষমকাল। এই ফাল্গুন মাসে আমার পক্ষে সমুদায় যন্ত্রণাদায়ক। ফাল্গুন মাস আসিতেছে মনে করিলে আনন্দ হয়, কিন্তু আসিলে আনন্দ পাই না, আবার গত হইলে উহার কথা মনে করিয়া আনন্দ পাই! তাই বুঝিলাম সম্ভোগে সুখ নাই; যদি কিছু থাকে, তবে সে পূর্ব্বের সম্ভোগ স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্ভোগের আশায়।

ফাল্গুন মাসে শিমুলফুল ফুটে। উহা দেখিলে মনে হয়, প্রভাতের ভানু যেন বৃক্ষের আড়াল দিয়ে উঠিতেছে। তখন আবার আম্র ও সজনা বৃক্ষ মুকুলিত হয়। কেন, কি জানি, পুষ্পে সুশোভিত সজনার গাছ দেখিলে আমার বোধ হয়, যেন একজন অতি প্রাচীন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। আবার মুকুলিত আম্রবৃক্ষ দেখিলেই মনে হয়, যেন স্বয়ং ভগবতী জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মাঠের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে দ্রোণপুষ্প ও জল-কলমীফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কলমীফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। এ সমুদায় দেখি,

আর প্রাণ আনচান করে, মনে হয় আমি প্রাণধনকে হারাইয়াছি। আবার জল-কল্‌মী অপেক্ষা স্থল-কল্‌মী আরো হৃদয়ভেদী। উহা আমি দেখিতে পারি না। শ্রীবৈষ্ণবগণ, কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া আখর দেন;—"ইহাতে কি অবলা বাঁচে?" প্রকৃতই স্থল-কল্‌মী দেখিলে জীব বাঁচে না। একটি যাত্রার গীত এই বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে,—

"বসন্তকাল সুখের কাল, সুখের কপাল নয়। মনসুখে সারী শুকে, সুখেরী মিলন হয়॥"

এই গীতটি মনে করিলে আমার হৃদয় দ্রব হয়। বসন্তকাল সুখের কাল বটে, কিন্তু একাকিনী বিরহিণী ও বিয়োগিনীদের পক্ষে ইহা বিষমকাল। দেখ, ভাটীর ফুল ফুটিয়া দিক্ আলোকিত ও আমোদিত করিয়াছে, আর মধুমক্ষিকারা মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পের সহিত বিহার করিতেছে। আবার "ফটিক-জল" পক্ষী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তা'র স্বরে অবলার প্রাণ বাঁচে না। সেই সঙ্গে হরিদ্রা-পাখী ও কোকিল ডাকিতেছে। উহারা বসন্তরাজার সেনা, সকলে, একই সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সহায় হইল আম্রমুকুল এবং নেবু ও ভাটী প্রভৃতি বন-ফুলের গন্ধ। ইহারা সকলেই "কাম জাগাইবার কোটাল।" ইহারা বিরহিণীর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেয়, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারে। একটি শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে, কোকিলের ডাক শুনিয়া বিরহিণী "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মেঘগর্জ্জন করিলে বজ্র-ভয় নিবারণের জন্য লোকে "জৈমিনী ভারতী" নাম লইয়া থাকে! বিরহিণীর কর্ণে কোকিলের ডাক বজ্রঘাতের ন্যায় লাগে, তাই ঐ নাম ধরিয়া ডাকেন। পূর্ব্বে আমি এই শ্লোকটি একটি কবিতা মাত্র ভাবিতাম, কিন্তু এখন আর সেরূপ বোধ হয় না। কোকিলের ডাক শুনিলে আমি "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া উঠি না বটে, কিন্তু ঐ স্বর

বাণের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমার শরীর শিহরিয়া উঠে; আর আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি।

চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটির ন্যায় গীত আমি আর কখনও শুনি নাই। এটি গোলক-চ্যুত সতেজ সুধা-চক্র। ইহা গান করিয়া আমি কত দিন নয়ন-জল ফেলিয়াছি। গীতটি এখন শ্রবণ করুন—

"নিকুঞ্জ মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি সুখ লাগিয়া রুনু।
মধু খাই খাই, ভোমরা মাতিল, বিরহ জ্বালাতে মনু॥
জাতি রুইনু, জুতি রুইনু, রুইনু গন্ধ-মালতী।
ফুলের সুবাসে, নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা ফেলি দিয়া শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়, কাঁটা বিন্ধে গায়, কালিয়া-নাগর বিনে॥
রতন মন্দিরে, সখীর সহিত, তা সঙ্গে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম॥"

চণ্ডীদাস বলিতেছেন, কৃষ্ণবিরহিণীর অবস্থা। কিন্তু আমি ত কৃষ্ণকে চিনি না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই, তাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে খুঁজি নাই, তবে তাঁহার জন্য কেন বিরহিণী হইব? তাঁহার জন্য কেন প্রাণ কান্দিবে?—তবে তিনি কেন আমার সেই হারাধন,—সেই হা হুতাশের কারণ হইবেন? বিশেষতঃ আমার যে অবস্থা, প্রায় জীবমাত্রেরই এইরূপ,—কাহার অধিক, কাহার বা অল্প। কেহ সংসারের কার্য্যে বিব্রত থাকায় এই মহা-আগুনের তত্ত্ব লইতে পারেন না, কেহ বা নানা উপায়ে এই অগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্তু অবস্থা সকলেরই এক, সকলেই ধনহারা হইয়া আমারি মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বুঝিলাম, এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি "কোটাল হইয়া কামকে জাগাইতে" থাকে, আর এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহা নির্ব্বাণ করিতে পারে।

শিশুকাল হইতে শত সহস্র বাসনা সৃষ্টি হইতেছে, ক্রমে উহা পরিবর্ত্তিত ও মার্জ্জিত হইয়া মনাগুণ বাড়িতেছে, আর উহা শত-সহস্র পৃথক-পৃথক শিখাকারে হৃদয়ে জ্বলিতেছে। যত শুভ ও সুন্দর দর্শনে এই মনাগুণকে উদ্রেক করে। এই কাম আর কোথাও নির্ব্বাপিত হইবে না। এই ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সেই চরমগতি,—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ পরিণামে জীবকে শীতল করিবেন, তাই তাহাদের হৃদয়ে শত সহস্র শিখা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইরূপে রাজা রামানন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া প্রভুর সহিত সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, এবং প্রত্যূষে বাড়ী ফিরিয়া যান। রামানন্দ ক্রমেই প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন, আর প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনে ক্রমেই ধান্দা লাগিতেছে। রামরায় একদিন বলিলেন, "স্বামিন্! আমার বলিতে ভয় করে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন। যখন আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছেন, তখন কিছু দিন না থাকিলে আমার দুষ্ট মন শোধিত হইবে না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বল কি? দশ দিন কেন, আমি যতদিন বাঁচিব, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। তোমার মহিমা শুনিয়া আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম। তাহা যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনিই দেখিলাম। কৃষ্ণ-কথা শুনাইয়া তুমি আমার মন শুদ্ধ করিলে। এখন নীলাচলে চল, সেখানে তোমায় আমায় কৃষ্ণ-কথায় সুখে কাটাইব।" আবার সন্ধ্যার সময় রামরায় আসিলেন। এইরূপে ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল বাড়িতেছে, ক্রমেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তত্ত্বের বিচার হইতেছে, ক্রমেই রামরায় আর একরূপ হইয়া যাইতেছেন,—ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইতেছেন। নিশাভাগে প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, আর দিবাভাগে চিরদিনের নিয়মানুসারে পূজা করেন। পূজা আর কিছু নয়,—ধ্যান

করেন, আর ধ্যানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাঁহার প্রতি কৃপাও সেইরূপ। রামরায় ধান করিতে বসিলেন, অমনি শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন;—শুধু বৃন্দাবন নয়, বৃন্দাবনের পরিকর স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ আসিলেন। রামরায় এইরূপ একদিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দের ধারা পড়িতেছে, এমন সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে রামরায় বড় ব্যাকুলিত হইলেন। যাহারা ধ্যান-সুখের মাঝে এইরূপ বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। রামরায় ব্যাকুলিত হইয়া হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিতে লাগিলেন;—করিতে করিতে আবার রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে অতি আশ্চর্য্য একটি কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে রাধার অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে লুকাইলেন। রহিলেন কে, না—একজন অতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী! দেখিলেন যে, সন্ন্যাসীটি আর কেহ নন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধার অঙ্গ দ্বারা আবৃত! তাহার পরে দেখিলেন যে, যে সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ও যাঁহার সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্ন্যাসী।

রামরায়ের এ সমুদায় কিছু ভাল লাগিতেছে না। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ খুঁজিতেছিলেন, তাই খুঁজিতে লাগিলেন। আর সন্ন্যাসীকে উহার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর রূপ ক্রমেই ফুটিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। তখন রামরায় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, যথা, চৈতন্যমঙ্গল গীতে—

"আজ এ কি হলো আমার হৃদয় মাঝার। জাগে গোরা-রূপ খানি অতি মনোহর॥
ধ্যান করি চিরদিন কালিমা বরণ। কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন॥
গোপ-বেশ বেণুকর নবীন-কিশোর। কোথা লুকাইল আজ শ্যাম নটবর॥"

কিন্তু গৌররূপ গেলেন না, তাঁহার প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

"ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজা দেখে গৌরচন্দ্র। পুনরপি ধ্যান করে, জপে মহামন্ত্র ॥
পুনরপি গৌররূপ দেখয়ে নয়নে। কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে ॥
পুনরপি ধ্যান করে সুস্থির হিয়ায়। পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার মাঝার ॥"

রামরায় তখন বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে ও তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, যথা, (চৈতন্য-চরিতামৃতে)—

"অন্তর্য্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হিয়ায়॥"

তখন তিনি বুঝিলেন, নবীন-সন্ন্যাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। রামরায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং সন্ধ্যা হইলে দ্রুতগমনে যাইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, যথা,—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার। রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
এই তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইলা নারায়ণ ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥

রামরায় বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, ইহার কিছুই আমি জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম যে,—তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এ সমুদায় নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলে। ইহাতে আমার বোধ হয় তুমি সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরও গুহ্য কথা বলিতেছি। আমি প্রথমে যখন দেখি তখন তোমাকে একজন সন্ন্যাসী মাত্র ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তুমি আমার শ্যামসুন্দর। আবার ভাবি তবে তোমার বর্ণ কাঁচা সোনার মত কেন? তখন মনে হয়, তুমি শ্রীমতী রাধা। কিন্তু শেষে স্থির করিয়াছি,—তুমি শ্যামসুন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বারা আপনার রূপ ঢাকিয়া জগতে বিচরণ করিতেছ।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি যে এরূপ বলিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ধর্ম্মই এই। যাঁহাদের এই কৃষ্ণ-প্রেম আছে, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধাকৃষ্ণ ভাবিবে এ বিচিত্র কি? স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হইবে।"

রামরায় তখন গদ্‌গদ্‌ভাবে বলিতেছেন, "প্রভু! এই জঙ্গলময় দেশে, বিষয়কার্য্য লইয়া বিব্রত ছিলাম। কৃপা করিবার জন্য তুমি তল্লাস করিয়া আমাকে বাহির করিলে; এখন আমাকে বঞ্চনা করিতেছ! প্রভু, এ কি তোমার উচিত?" শ্রীভক্তগণ শ্রীভগবানকে এইরূপ ধমকাইয়া কথা বলেন, আর শ্রীভগবানের নিকট অন্তের স্তুতি ও চাটুবাক্য অপেক্ষা ভক্তের তিরস্কার অনন্ত গুণ মধুর লাগে। এই ধমক খাইয়া, (যথা চরিতামৃতে)—

"তবে প্রভু হাসি তারে দেখাল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈল আনন্দে মূর্চ্ছিত॥"

প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে চেতন করাইলেন। বিদ্যানগরে প্রভুর কার্য্য শেষ হইল। তখন তিনি বিদায় মাগিলেন এবং রামরায়কে বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন। কিন্তু ওরূপ আজ্ঞার আর প্রয়োজন হইল না। রামরায় তখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, বিষয়-কার্য্য করিবার আর তাঁহার ক্ষমতা রহিল না। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া না আসি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও।" রামরায়, প্রভু প্রত্যাগমন করিবেন সেই আশায় বিদ্যানগরে প্রভুর পথ চাহিয়া রহিলেন। প্রভু দক্ষিণ-দেশে চলিয়া গেলে রামরায় মূর্চ্ছিত হইলেন; আর বিদ্যানগরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রভু সেই নগরে দশ দিবস বাস করায় সমস্ত নগরবাসী প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিল, আর মহাপ্রভুকে একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারাও রাজার সহিত শোকে অভিভূত হইল। এইরূপ প্রভু একেবারে গৌড়ীয় ভক্তগণের নয়নের অদর্শন হইলেন।

ওদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কথা পাঠক স্মরণ করুন। প্রভু আলালনাথে ভক্তদিগকে ফেলিয়া গমন করিলে, তাঁহারা অচেতন হইয়া সারাদিন-রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। পরদিবস প্রভাতে প্রভুর আজ্ঞা-ক্রমে ধীরে-ধীরে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন; যে প্রভুর নিমিত্ত তাঁহারা সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। আর তাঁহাদের গরব নাই, সুখ নাই, তেজ নাই, এমনকি চেতন যে আছে তাহাও সব সময় বোধ হয় না। তাঁহারা জীবনধারণের নিমিত্ত আহার করেন, কয়েক জন বসিয়া একচিত্ত হইয়া প্রভুর কথা বলেন, গলাগলি হইয়া রোদন করেন, রাত্রে প্রভুকে স্বপন দেখেন। এইরূপে দক্ষিণ-মুখে চাহিয়া সকলে নিশি-দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম রোদন করিয়া তখন অন্তরূপ ধারণ করিয়াছেন। যখন বড় দুঃখ বোধ হয়, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রভুর কথা আলোচনা করিয়া মনকে সান্ত্বনা করেন। সৌভাগ্য অন্তর্দ্ধান না হইলে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না। প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলেই, তাঁহার মহিমা সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সমুদায় কথার সৃষ্টি হইতে লাগিল,—যথা, শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া এখন আবার অদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবাসী ভক্ত ও অভক্ত সকলেই সার্ব্বভৌমকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের আবেদন এই যে, প্রভুকে তাঁহারা দেখিবেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলেন যে, প্রভু দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন, সত্বর আসিবেন আসিলেই তাঁহাদের সহিত মিলাইয়া দিবেন। ক্রমে এই কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করিয়া

কটক হইতে পুরীতে দূত পাঠাইলেন। সার্ব্বভৌম রাজার আজ্ঞা শুনিয়া একটু বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তিত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে, অসময়ে রাজা তাঁহাকে কেন ডাকিলেন? মহারাজ প্রতাপরুদ্র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই কেবল মুসলমানগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছেন। স্বয়ং রাজপুত; আবার রাজপুতদিগের শ্রী, পদ ও মর্য্যাদা তখন তিনিই কেবল রক্ষা করিতেছেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই আত্ম রক্ষার নিমিত্ত তিনি দিবানিশি সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কার্য্যে ব্যস্ত। তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্ব্বভৌমের ভয়ও হইল।

সার্ব্বভৌম উৎকণ্ঠিত চিত্তে দ্রুতগতিতে কটক গমন করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সার্ব্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। তখন রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! আমি শুনিলাম, এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, আর তিনি নাকি বড় প্রতাপান্বিত; এমন কি, অনেকে তাঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি নাকি তোমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাই তোমাকে ডাকাইলাম। তুমি তাঁহার সমুদায় কথা বল, আমি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে সমুদায় ঠিক। তিনি অতি মহাশয়, তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া আমার দুষ্টমন শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বটে! তবে তুমি একবার তাঁহাকে আমাকে দেখাও।" সার্ব্বভৌম দেখিলেন, রাজার যেরূপ ভাব তাহাতে যেন তিনি আজ্ঞা দিয়া প্রভুকে কটকে লইয়া আসিবেন। তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "মহারাজ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন সমুদায় সত্য। কিন্তু

তিনি সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে ভজন করেন; রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি প্রাণ গেলেও যে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন তাহা বোধ হয় না।” ইহাতে রাজা বলিলেন, “সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়া যাইবে, কেবল আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইতে পারিব না?”

সার্ব্বভৌম। তিনি কৃপাময়, মহারাজকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন; আমি সে চেষ্টাও করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন।

রাজা। শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্রে আসিয়া আবার তাঁহার তীর্থদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

সার্ব্বভৌম। তাঁহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জীবের কুকর্ম্মের নিমিত্ত সমুদায় তীর্থস্থান কলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই মহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহা পবিত্র করিয়া থাকেন।

রাজা। তুমি তাঁহাকে যাইতে দিলে কেন? বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিলে না কেন? তাহা হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম।

সার্ব্বভৌম। তার ত্রুটী করি নাই। তবে তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারিলাম না।

রাজা। তুমি কেন খুব জিদ করিয়া ধরিলে না?

সার্ব্বভৌম। আমি কোনও অংশে ত্রুটী করি নাই। তাঁহার পা ধরিয়া রোদন করিয়াছি, তাঁহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও তিনি বাধ্য নহেন।

রাজা। (বিস্ময়ের সহিত) স্বতন্ত্র ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি, তুমিও কি তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বল না কি?

সার্ব্বভৌম। আমি মন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারি

নাই। এখন তিনি, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া, আমাকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা। তিনি শ্রীভগবান্, আর আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না? তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিতেছ, সেখানে আর আমার সন্দেহ হয় না। তবে আমি শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া দেখিতে পাইলাম না?

সার্ব্বভৌম। তিনি আবার আসিবেন, এমন কি, শ্রীক্ষেত্রে বাসও করিবেন। অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন না। যখন আপনার স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে দর্শন দিবেন।

কথা এই যে, শ্রীভগবান্ আসিয়া তাঁহাকে দেখা না দিয়ে গিয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে পারে, প্রতাপরুদ্রের ত হইবারই কথা। যেহেতু তিনি রাজা, সকল বিষয়ে অগ্রভাগ তাঁহার। তাঁহার মনোদুঃখ দেখিয়া সার্ব্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি আসিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। রাজাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত আর একটি কথা উঠাইলেন। বলিতেছেন, "মহারাজ! শ্রীভগবান ত সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, কবে আসিবেন নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার থাকিবার একটি বাসস্থান চাই। এমন বাসা চাই যে, সেখানে অনেক স্থান থাকে, এবং উহা নির্জ্জন ও মন্দিরের অতি নিকট হয়।"

রাজা ইহাতে প্রভুর একটু উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া, সহর্ষে বলিতেছেন, "তাহার ভাবনা কি? ভাল বাসাই দেওয়া যাইবে। আমার বোধ হয় কাশী মিশ্রের বাটী দিলে হইতে পারে।" সার্ব্বভৌম এই বাসার কথা শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন। অতএব প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশীমিশ্রের বাড়ী থাকবেন সাব্যস্ত হইল। কাশীমিশ্র রাজার গুরু।

তারপর রাজা সার্ব্বভৌমের নিকট প্রভুর গুণ-চরিত্র শুনিতে লাগিলেন। রাজা, শ্রীমতী রাধার ন্যায়, সার্ব্বভৌম-রূপ যে ভাট, তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়াই, চিত্ত ও মনের অধিকাংশ তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

এ দিকে প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং" বলিয়া দক্ষিণদেশের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহ বৌদ্ধাচার্য্য, জৈনাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, শৈব্যাচার্য্য প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মিলন হইল। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা দাক্ষিণাত্য দর্শনে জানা যাইত। মুসলমানগণ সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং দক্ষিণদেশে মারামারি কাটাকাটি নাই; সেখানে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা, আর এই ভদ্রলোকের কেবল একমাত্র কার্য্য। প্রভুর এইরূপ ভ্রমণ করিতে প্রায় দুই বৎসর গেল। দ্বারকা যাইবার পথে, কুলিন গ্রাম নিবাসী রামানন্দ বসুর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রভুকে পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। এখন তীর্থভ্রমণের ফলস্বরূপ প্রভুকে পাইবামাত্র, তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত রহিয়া গেলেন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসু রামানন্দের একটি গীতের ভণিতা শ্রবণ করুন।

"বসু রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি,
গৌর আমায় পাগল কৈলে।"

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণকাহিনী পরে লেখা হইবে। সুদ্ধ সেই লীলাই এক বৃহৎ গ্রন্থের ব্যাপার।

প্রভু যেখানে গমন করেন, সেখানে আপনিই এই কথা প্রচার হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মাদগ্রস্ত হয়; আর প্রভু সেখানে দুই একটি আচার্য্য সৃষ্টি করিয়া অন্য স্থানে গমন

করেন। এই আচার্য্য-সৃষ্টির মধ্যে একটি রহস্য আছে। তিনি দক্ষিণ-দেশে, যখন যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই কোন বিশেষ ধর্ম্মের সর্ব্ব-প্রধান আচার্য্যকে ধরিতেছেন ও তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকেই শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। আর এক অদ্ভুত-কথা স্মরণ করুন। প্রভু যেখানে যাইতেছেন, সেই স্থানে এক একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপিত হইতেছে। সৌরাষ্ট্রে প্রভু যে বটবৃক্ষ তলে বসিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও লোকেরা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটি প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম,—"শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। এই স্থান অতি দুর্গম বোম্বাই হইতে কয়েক দিবস দূরে। রামযাদববাবু কষ্টেসৃষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। এখানে আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি দেখিতেছেন যে সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোলকরতাল লইয়া কয়েক জন ঐ দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমাদের সংকীর্ত্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে সংকীর্ত্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার আকৃতি ঠিক আমাদের সংকীর্ত্তনের মত। রামযাদববাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদূরে, আমাদের সংকীর্ত্তন আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কুমারটির নাম কিরূপে আসিল?—ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামযাদববাবু বিভোর হইলেন।

"কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রামযাদববাবুর এই সঙ্কল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে রহিয়া গেলেন, ও দুই দিবসের অনুসন্ধানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণবের দর্শন পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেই বঙ্গদেশ হইতে এই খোল করতাল ও এই কীর্ত্তন আসিয়াছে!" কিরূপে আসিল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন।"

পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা ও সে তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে। একবার এই বিষয়টি অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু। "এখানে তোমাদের চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন," বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাতেই সেখানে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বীজ বপন করা হইল!

প্রভুর মস্তকে জটা, মুখে শ্মশ্রু, পরিধান জীর্ণ কৌপিন। সেই অতি দীর্ঘ দেহ এখন ক্ষীণ হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, নয়ন প্রেমে ঢলঢল ও ঈষৎ লোহিত বর্ণ। প্রভুকে দর্শন মাত্র লোকের হৃদয় দ্রব হয় প্রভু এই যে প্রায় দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র এক দিবস শ্রীনবদ্বীপ স্মরণ করিয়াছিলেন। পুনা নগরের নিকট প্রভু বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, যেন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন ও কাঙ্গাল। তাঁহার ভৃত্য একটু দূরে বসিয়া। হঠাৎ প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর অস্ফুটস্বরে বলিতে

লাগিলেন, "কোথা আমার প্রাণ-প্রতিম মুরারি! কোথা নরহরি! তোমাদের না দেখিয়া বাঁচি না! কবে তোমাদিগকে আবার দেখিব!"

এদিকে স্বপ্নাভিলাসের কাহিনী মনে করুন্। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর প্রেমঋণ শোধিতে পারিলেন না; বলিলেন,—"তোমরা অহেতুক এত প্রীতি করিয়া আমাকে চিরঋণের দায়ে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে তোমাদের ঋণ শোধ হইতে পারে।" তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন,—"সে ঋণ শোধ করা অধিক কথা নয়; তুমি তাহা অনায়াসে শোধিতে পার। তুমি জীবকে যদি হরিনাম দাও, তবে আমি তোমাকে ঋণ হইতে খালাস দিব।"

শ্রীমতী যদিও কতক রহস্য-ভাবে এ কথা বলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অমনি বলিলেন,—"তথাস্তু"; তাই শ্রীকৃষ্ণ তখন একখানি "দাস-খত" লিখিয়া দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি কলিযুগে সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন। শ্রীভগবান এই কার্য্য করিয়া শ্রীমতীর ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাই গৌর অবতার হইলেন। এই গেল স্বপ্নবিলাসের কথা। বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণযাত্রা হইয়া থাকে, তাহাতে সেই 'দাস-খত' খানি গীত হইয়া থাকে। সে দাস-খত এইরূপে লিখিত—

"ইয়াদি কৃত্য, গুণ সমুদ্র, সৎ সাধু শ্রীরাধা।
সচ্চরিত্র চরিত্রেষু, পুরাহ মনের সাধা॥
তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরি।
অস্য কর্জ্জং পত্রমিদং, লিখিত সুকুমারী॥
তারিখস্য দ্বাপরস্য, পরিশোধ কলিযুগে।
এই কথায়ে, খত লিখিনু, ইসাদি মঞ্জরী ভাগে॥"

এখন উপরি-উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাজনগণ যে পদ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

"কেন্দে আকুল হলো গৌরহরি ! বলে কোথা রাই-কিশোরী ॥ধ্রু॥
প্রেম-নয়নে দীনের পানে, চাও বারেক কৃপা করি ॥
ছেঁড়া কাঁথা, করোয়া হাতে কেন্দে বেড়াই পথে পথে,"
তোমার নাম নিতে নিতে এসেছি আশাকরি ॥ (খালাস হব বলে)

প্রভু এই ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন হইয়া দক্ষিণে ভ্রমণ করিতেছেন। এদিকে এ কথা শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ হইল যে, নিমাই নীলাচল ত্যাগ করিয়া, একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছেন ; তখন সমস্ত গৌড়দেশবাসী ঘোর বিয়োগে অভিভূত হইলেন। শ্রীনিমাই নীলাচল বাস করিবেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন,—যত দিবস এরূপ সাব্যস্ত ছিল, তত দিবস লোকে এক প্রকার মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন এ কি কথা ? নিমাই কোথায় গেলেন ? তিনি একা গেলেন, তাঁহাকে রক্ষা কে করিবে। নিমাই কি আর ফিরিয়া আসিবেন !

যে নিমাই সর্ব্বদা প্রেমে বিভোর, আহার না করাইয়া দিলে যিনি আহার করেন না। যাঁহাকে সাধ্যসাধনা না করিলে কৃষ্ণভজন রাখিয়া শয়ন করেন না, তিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী হাঁটিতেছেন। কে ভিক্ষা দিতেছে, কে রন্ধন করিতেছে, কোথা রাত্রি বাস করিতেছেন, এই ভীষণ-রৌদ্র কিরূপে সহিতেছেন ! যে নিমাইকে নয়নের উপর রাখিয়াও ভয় হয় যে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদে পদে ব্যথা লাগিবে, তাঁহার এখন এই দশা ! কাজেই নবদ্বীপে হাহাকার পড়িয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জীবের পুরুষার্থের সীমা। এই কৃষ্ণ-বিরহ, প্রভু আপনি রাধা-ভাব ধারণ করিয়া, জীবকে দেখাইলেন। আর এই

কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ, তাহা তিনি নবদ্বীপে নিজ পরিকরগণ দ্বারা জীবকে দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজবাসীদের দশা যেরূপ হইয়াছিল, শ্রীনবদ্বীপবাসীদের দশা প্রকৃত তাহাই হইল। গৌরপরিকরগণ গোপগোপীদের যে দশা তাহাই পাইলেন। কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহ-বা মধুর-ভাবে অভিভূত হইয়া গৌরবিরহসাগরে ডুবিলেন।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোর-বিয়োগে চেতনা হারা হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হইলেন। তাঁহার মনে এই ভাব বসিয়া গেল যে, তিনি শ্রীমতী যশোদা, আর নিমাই তাঁহার কৃষ্ণ, এখন মথুরায় গিয়াছেন ;—শচী সেই ভাবে বিভোর। যখন একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবদ্বীপে অভ্যাগত সাধুগণকে অন্বেষণ করেন ;—কাহার নিকট লোক পাঠাইয়া দেন, কাহাকেও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। এই সমুদায় লোকের নিকট তাঁহার একমাত্র প্রশ্ন, "নিমাই কি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছে ? নিমাইকে দেখিতে বড় সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন, মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল, আর প্রেমে পাগলের মত ঢুলে ঢুলে চলে।" যথা, একটি প্রাচীন পদ হইতে উদ্ধৃত—

"নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, সন্ন্যাসী বৈরাগী যারা।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া শুধায়, শচী পাগলিনী-পারা॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখেছ ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, তাঁরে কি ভেটেছ ?
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন— জিনি, তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা॥"
তাঁহারা বলে, "না দেখি নাই।"

শচী যখন অচেতন থাকেন, তখন নানা রঙ্গ করেন। কখন শ্রীবাসের

বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে যান। কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা মথুরার সংবাদ বলিতে পার?" কখন নিমাইয়ের নিমিত্ত রন্ধন করেন। কখন নিমাইকে বসিয়া খাওয়ান। লোকে দেখে যে, তিনি নিমাইকে খাওয়াইতেছেন, তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু নিমাইকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না! কখন শচী রজ্জু লইয়া যশোদাভাবে রাগ করিয়া নিমাইকে বান্ধিতে যান, তখন সকলে যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনরূপ-লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। আবার রাত্রিতে কখন শচী স্বপ্ন দেখিয়া 'নিমাই নিমাই' বলিয়া কান্দিয়া উঠেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘোর-বিয়োগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন। লোচন সেই বর্ণনা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন কি, কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীমতী উহার দুই একস্থান পরিবর্ত্তনও করেন। লোচনদাসের সেই শ্রীমতীর বার-মাসের দুঃখ-বর্ণনা অর্থাৎ বারমাসিয়া শ্রবণ করুন, করিলে মন নির্ম্মল হইবে। যথা—

১। ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদে পূর্ণিমা-দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ-দীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ। তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ যুবা॥

২। চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ-কান্দে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।

তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥
৩। বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য-ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! বিষম বৈশাখের রৌদ্র :
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥
৪। জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা ॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন।
ছটফট করে যেন জল বিনু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
৫। আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
শুনিয়া মেঘের নাদ, ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥
৬। শ্রাবণে গলিত-ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু, কারে কব কথা ॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।

যে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥

৭। ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! ভাদ্রের বিষম খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীবন্তে সে মরা ॥

৮। আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা-মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরৎ সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥

৯। কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা
কেমনে কৌপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা ॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপ রাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! তুমি অন্তর-যামিনী।
তোমার চরণে আমি বলিতে জানি ॥

১০। অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে, প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাটনে ত ভোটে, প্রভু, শয়ন কম্বলে।

সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! তোমার সর্ব্বজীবে দয়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা-চরণের ছায়া ॥

১১। পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে ! পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে ॥

১২। মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব।
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! মোরে লহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥

শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা এখানে আর অধিক বলিব না! তাঁহাদের বিরহ-বর্ণনের স্থান আছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভু দুই বৎসর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এই দুই বৎসরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল।

প্রভু বিদ্যানগর হইতে ত্রিমল্ল নগরে উপনীত হইলেন। এখানে বহু বৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপণ্ডিত রামগিরির সহিত প্রভুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। তৎপরে ঢুণ্ডিরাম নামক মহা-পাণ্ডিত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর বিচার হইল, এবং ঢুণ্ডিরাম প্রভুর কৃপা পাইয়া "হরিদাস" নামে খ্যাত হইলেন। প্রভু ক্রমে "অক্ষয়বট" নামক স্থানে আসিয়া তথাকার "বটেশ্বর" শিবকে দর্শন করিলেন। সেখানে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনী বণিক, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক দুটি বেশ্যাসহ উপস্থিত হইয়া প্রভুকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর প্রেমের বেগ দেখিয়া ইহারা তিন জনই তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি দূরীভূত করিল। তীর্থরামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইলেন। বটেশ্বরে সাত দিন থাকিয়া দশক্রোশব্যাপী এক বিশাল জঙ্গলে প্রভু প্রবেশ করিলেন। তৎপরে মুন্নানগরে আসিয়া প্রভু অদ্ভুত নৃত্য করিলেন, এবং উহা দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পবিত্র হইল। মুন্নানগর হইতে প্রভু বেঙ্কট নগরে পৌছিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। তৎপরে প্রভু পন্থভীল নামক দস্যুকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বগুলা নামক বনে পন্থভীলের বাস। পন্থভীল প্রভুর দুই চারিটি কথা শুনিয়া অমনি দল সমেত অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন ধারণ করিল ও হরিনামে মত্ত হইল। এখান হইতে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু উন্মত্তের

স্থায় তিন দিবস অনাহারে গমন করিয়া চতুর্থ দিবসে দুগ্ধ ও আটা সেবা করিলেন।

তদন্তর গিরীশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকার শিবকে অঞ্জলি করিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। এখানে এক মৌনী সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসী নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, কিন্তু প্রভু তাঁহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিলেন। এখান হইতে ত্রিপদী নগরে উপস্থিত হইয়া প্রভু শ্রীরাম-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখানে মথুরা নামক এক তার্কিক রামাইত-পণ্ডিত প্রভুর সহিত তর্ক করিতে আসিলেন, এবং প্রভুর ভাব দেখিয়া তখনই তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎপরে পানা-নরসিংহ দর্শন করিয়া প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চী-ধামে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে ৪ ক্রোশ দূরে ত্রিকোণেশ্বর শিব আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভদ্রা নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আসিলেন। তৎপর কাল-তীর্থে বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি-তীর্থে আসিলেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করিয়া চাঁইপল্লী তীর্থে যাত্রা করিলেন।

চাঁইপল্লী হইতে নাগর নগর ও সেখান হইতে তাঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন। তৎপরে চণ্ডালু নামক গিরি,—যেখানে বহু সন্ন্যাসীর বাস—সেখানে গমন করিলেন। তথাকার ভর্গ নামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীবরকে কৃপা করিয়া প্রভু পদ্ম-কোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতীকে দর্শন করিলেন। এই স্থানে প্রভু যখন অষ্টভুজা দেবীকে বেড়িয়া বালক-বালিকাদিগের সহিত হরি-কীর্ত্তন করেন, তখন হঠাৎ পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে প্রভু এক অন্ধ-ব্রাহ্মণকে চক্ষুদান করেন। কিন্তু এই অন্ধ-ব্রাহ্মণ প্রভুর রূপ দর্শন করিবামাত্র প্রাণত্যাগ

করিল, এবং প্রভু মহা-সমারোহে তাহার সমাধি দিলেন। পদ্মকোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে চণ্ডেশ্বর শিব ও তথাকার প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভগদেবকে কৃপা করেন। ত্রিপাত্র নগরে প্রভু সাত দিন ছিলেন।

প্রভু আবার গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। এক পক্ষ পরে এই বন পার হইয়া রঙ্গাধামে নরসিংহ দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে বাসভ পর্ব্বতে গমন করিয়া পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে রামনাথ নগরে আসিয়া রামের চরণ ও তদন্তর রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী মহাতাপসকে দেখিতে গিয়া তাঁকে কৃপা করিলেন। মাঘি পূর্ণিমার দিন প্রভু তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্যাকুমারী চলিলেন।

কন্যাকুমারীতে সমুদ্রস্নান করিয়া প্রভু ফিরিলেন। সাঁতন দিয়া ত্রিবাঙ্কুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার ত্রিবাঙ্কুরের রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল, ভক্ত ও পুণ্যবান। প্রভু এক বৃক্ষতলে হেলান দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে হরিনাম জপ করিতেছিলেন, আর শত শত নগরবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। ক্রমে রাজা রুদ্রপতি প্রভুর মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে রাজধানী আনিবার নিমিত্ত এক দূত পাঠাইলেন। প্রভু অবশ্য অস্বীকার করিলেন। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা অর্জ্জন করিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের নিকট রামগিরি নামক পর্ব্বতে অনেকগুলি শঙ্করের শিষ্য বাস করেন। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মৎস্যতীর্থ, নাগপঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। সেখান হইতে চণ্ডপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক কোন জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে প্রেমদান করিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিলেন।

তারপর চণ্ডপুর ত্যাগ করিয়া দুই দিবস ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ দিয়া চলিলেন। অনেক ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সহিত প্রভুর দেখা হইল। তাহারা প্রভুকে দেখিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রভু পর্ব্বত বেষ্টিত একটি অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিলেন।

ক্রমে প্রভু নীলগিরি পর্ব্বতের নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে আসিয়া অনেক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া, প্রভু গুর্জ্জরী নগরে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করিলেন। গুর্জ্জরী নগরে প্রভু প্রেমের হিল্লোল তুলিয়া সহস্র সহস্র লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন। গুর্জ্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্ব্বত দিয়া সহ্য-কুলাচল ও মহেন্দ্র-মলয় দর্শন করিয়া পুনা নগরে উপস্থিত হইলেন। পুনা নগর তখন কতকটা নদীয়ার মত চতুষ্পাঠীতে ও পণ্ডিতদলে পরিপূর্ণ। প্রভু তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে বিভোর। সহস্র লোক দ্বারা অমনি তিনি বেষ্টিত হইলেন। একজন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ জলাশয়ের মধ্যে। অমনি প্রভু সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়া জলমগ্ন হইলেন। উপস্থিত লোক সকল হাহাকার করিয়া তাঁহাকে কোন ক্রমে উঠাইলেন।

পুনা হইতে প্রভু ভোলেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর, পটস্‌ গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে। সেখান হইতে দেবলেশ্বরে ও তথা হইতে খাণ্ডবায় খাণ্ডবাদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। যে নারীর বিবাহ না হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে খাণ্ডবা দেবকে সেবা করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে "কুমারী" বলিয়া ডাকে। এই কুমারী অর্থাৎ দেবদাসীগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচারিণী। ইহাদের প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে চোরানন্দী বনে

প্রবেশ করিয়া নারোজী নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও তাহাকে সঙ্গে করিয়া খণ্ডলা তীর্থে গমন করিলেন। সেখান হইতে নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক ধরিয়া ১৫ দিন পরে সুরাট নগরে আসিলেন। এখানে তিন দিন বাস করিয়া তথাকার অষ্টভুজা ভগবতীর নিকট পশু বলিদান প্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্তি নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। তারপর নর্ম্মদায় স্নান করিয়া বরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করিয়া বরোদায় আসিলেন। এখানে নারোজী —যিনি প্রভুর কৃপা পাইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন,—দেহত্যাগ করিলেন; মৃত্যুর সময় প্রভু তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। বরদার রাজা প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মহানদী পার হইয়া প্রভু আহামেদাবাদে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে শুভ্রামতী নদীর তীরে পৌছিয়া প্রভু কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণের দেখা পাইলেন। এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকায় চলিলেন। শুভ্রামতী নদী পার হইয়া যোগ্য নামক স্থানে আশ্চর্য্যরূপে 'বারমুখী' বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া, সোমনাথ অভিমুখে ছুটিলেন, এবং যাফেরাবাদ দিয়া ছয় দিন পরে সেখানে পৌছিলেন; এবং যবনেরা ইহার দুর্দ্দশার এক শেষ করিয়াছে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শেষে সোমনাথকে পুনঃ পুন এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্যসহ পুনরায় তাঁহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় হউন। "এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার। হৃদয়ের মধ্যে হেরি মূরতি তোমার॥" প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

সোমনাথ হইতে জুনাগড় দিয়া গির্ণার পাহাড়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন এবং গয়ায় চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া

প্রভুর হৃদয়ে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেইরূপ ভাব-তরঙ্গে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক এক 'প্রতাপশালী সন্ন্যাসীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁহাকে প্রেমদান করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তৎপরে ঝারিখণ্ড অর্থাৎ নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে ষোল জন ভক্ত। এই ঝারিখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয়া সুস্বরে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" গীত গাইতেছেন। সঙ্গীগণ আনন্দে বিভোর হইয়া বনের শোভা দর্শন ও অতি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছেন। সাতদিন পরে এই নিবিড় বন উত্তীর্ণ হইয়া অমরাপুরী গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাকেই "প্রভাস-তীর্থ" বলে। এই তীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন,—কখন কান্দিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, যেন চির পরিচিতস্থানে আসিয়া পূর্ব্বকার সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিতেছেন। এখানে

"অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া। আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া॥
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি চায়। আবেশে উন্মত্ত হয়ে চারিদিকে ধায়॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞানহারা। মিশিয়া গিয়াছে ঊর্দ্ধে নয়নের তারা॥"

১লা আশ্বিন প্রভাসতীর্থ ছাড়িয়া প্রভু দ্বারকায় চলিলেন। সাগরের তীরে তীরে চলিয়া, এবং চারিদিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের খাড়ি পার হইয়া, দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকায় আসিয়াও প্রভু এই তীর্থস্থান প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষকাল দ্বারকায় থাকিয়া, নানাবিধ রসরঙ্গ করিয়া, নীলাচল অভিমুখে ফিরিলেন। সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, বিদ্যানগর হইতে রায় রামানন্দকে সঙ্গে করিয়া তিনি জগন্নাথ যাইবেন।

আশ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় বরদা নগরে আসিলেন। ইহার ষোল দিন পরে নর্ম্মদা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। এখানে

ভর্গদেবের সহিত প্রভুর ছাড়াছাড়ি হইল। বিদায়কালে প্রভুর চরণধূলি লইয়া ভর্গদেব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি দক্ষিণদিকে ও প্রভু নীলাচলের দিকে চলিলেন।

নর্ম্মদার ধারে ধারে প্রভু চলিয়াছেন। সঙ্গে রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। দোহদ-নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষি-নগরে অনেকগুলি বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখানে দুটি ভক্তকে বিশেষরূপে কৃপা করিয়া ক্রমে বিন্ধ্যাচলে উঠিয়া মন্দুরা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিন দিনে দেবঘর আসিয়া আদিনারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন। দেবঘর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী-নগর। দুই দিনে সেখানে পৌঁছিয়া তাহার পূর্ব্বভাগস্থ মহলপর্ব্বত দিয়া চণ্ডীনগরে আসিয়া চণ্ডীদেবী দর্শন করিলেন।

অবশেষে রায়পুর দিয়া বিদ্যানগরে আসিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দ যাইয়া চরণে পড়িলে, প্রভু তাঁহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া নগরে মহা কলরব হইল ; লোকে নানারূপ উৎসব করিতে লাগিল। প্রভু তখন বলিলেন, "রাম রায় এখন নীলাচলে চল।" রাম রায় বলিলেন, "প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাইয়া আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমা হইতে আর বিষয়-কর্ম্ম হইবে না। শেষে অনেক চেষ্টা করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি। এখানে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম ; আমার মহা-সমারোহের সহিত যাইতে হইবে। আমার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, সৈন্য যাইবে, অতএব আপনি অগ্রে গমন করুন। আমি দিন দশেকের মধ্যে সমুদায় গোছাইয়া আপনার পশ্চাৎ আসিতেছি।"

তখন প্রভু নীলাচল অভিমুখে চলিলেন। মহানদীর তীরস্থ রত্নপুরে আসিলেন, এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিক দিয়া স্বর্ণগড়ে উপনীত হইলেন।

রত্নপুরের রাজা শান্তিশ্বর পরম-ধার্ম্মিক। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রভুকে ভূমি লোটাইয়া প্রণাম করিলেন, এবং প্রভু তাঁহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সম্বলপুর দিয়া ভ্রমরানগর, প্রতাপনগর, দাসপালনগর উদ্ধার করিয়া রসালকুণ্ডেতে আসিলেন। এখানে কোন মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে স্পর্শ করিয়া প্রভু পরমভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া সে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হয়। পুত্রের আকিঞ্চনে প্রভু পরে সেই মাড়ুয়া ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন। শেষে ঋষিকুল্যা নামক স্থান পবিত্র করিয়া প্রভু আলালনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন।

নীলাচলের এক দিবসের পথ থাকিতে প্রভু ভৃত্যদ্বারা অগ্রে আপন আগমন-বার্ত্তা পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, সকলেই গৌরগত-প্রাণ, কিন্তু গৌর নাই। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রভু আসিতেছেন, আস্থন।" ভৃত্য তাঁহাদিগকে এই সংবাদ দিয়া সার্ব্বভৌমকে সংবাদ দিতে চলিলেন। অমনি সকলে আনন্দে ডগমগ হইলেন ও নাচিতে নাচিতে চলিলেন ; কিন্তু এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা সহজ কথা নয়,—তাঁহারা নৃত্য করিবেন, না গমন করিবেন ?—যথা চরিতামৃতে—

প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ, দমোদরপণ্ডিত, মুকুন্দ। নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ॥

প্রভুকে আনিতে অন্যান্য গৌড়ীয়-ভক্তগণও চলিলেন। যখন তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিলেন, তখন পঞ্চজন ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও সঙ্গে আসিতে দিলেন না। কিন্তু প্রভু দেশ ছাড়িলে, কোনও কোনও ভক্ত গৌরশূন্য দেশে আর থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীমুরারি, শ্রীভগবান্ (ইনি খঞ্জ), শ্রীরাম ভট্ট প্রভৃতি নীলাচলে দৌড়িলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই নবীন-ব্রহ্মচারী। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিয়াছেন। তখন

আশা ভঙ্গ হইয়া তাঁহারা মৃত্যুবৎ অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত প্রভুর প্রতীক্ষায় রহিয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌম শুনিলেন প্রভু আসিতেছেন, আরও শুনিলেন ভক্তগণ তাঁহাকে আনিতে ছুটিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, শ্রীভগবান্ নীলাচলে আসিতেছেন, তাঁহাকে একটু আদর করিয়া আনা উচিত। আর এখন ভয় কি? রাজা এখন এক প্রকার নবীন সন্ন্যাসীর নিজ-জন হইয়াছেন। তখন সার্ব্বভৌম নিশান, পতাকা, খোল, করতাল জোগাড় করিতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে পুরীময় রাষ্ট্র হইল 'সার্ব্বভৌমের সন্ন্যাসী' আসিতেছেন। সকলে শুনিয়াছেন স্বয়ং মহারাজা সেই সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে আনিবার নিমিত্ত খোল করতাল ডঙ্কা ইত্যাদির সহিত বহুতর লোক চলিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে প্রভুকে কখন দেখেন নাই। বহুদিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ পাইয়া প্রভুর বদন অতিশয় প্রফুল্ল হইল! তৎপরে সার্ব্বভৌম যাইয়া সমুদ্রধারে প্রভুকে পাইলেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি সঙ্গীগণসহ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া রোদন করিতে করিতে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। যথা চরিতামৃতে—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা। সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে। প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে। সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে॥

প্রভুকে দেখিয়াই শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রণাম করিলেন। তাঁহারা জগন্নাথের সেবক শুনিয়া, প্রভু জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীজগন্নাথের সেবক সকলেরই প্রণামের পাত্র। ইঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করেন ইহাতে তাঁহার ভয় হয়। প্রভু তখন সকলকে লইয়া শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনের

নিমিত্ত গেলেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন স্নান করিতেছেন, কাজেই তখন তাঁহার দর্শন নাই। ইহাতে সেবকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সার্ব্বভৌমকে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। একদিনকাল প্রভু বিনা অনুমতিতে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডাগণের বিষম ক্রোধের ভাজন হইয়াছিলেন। এখন সেই পাণ্ডাগণ, যদিও তাহারা প্রভুর মহিমা প্রত্যক্ষ কিছু দেখেন নাই, তবু তাঁহাকে জগন্নাথের স্নানের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে দর্শন করাইতে পারিবেন না বলিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভু এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল নিমিত্ত দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন; কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন যে, স্নান না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন।

গোপীনাথ এই সময় সার্ব্বভৌমকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দর্শনের পরে প্রভুকে কোথায় লইয়া যাওয়া যাইবে। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "অদ্য আমার ওখানে, আর কল্য হইতে তাঁহার বাসায়—কাশী মিশ্রের আলয়ে।" তাহার পর প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, মহারাজা আপনার বাসা স্বয়ং ঠিক করিয়া দিয়াছেন। সে কাশীমিশ্রের বাড়ী। সেখানে স্থান বিস্তর আছে। আবার উহা শ্রীমন্দির ও সমুদ্রের নিকট, পরম নির্জ্জন ও কুসুম-কাননে সুশোভিত।"

সার্ব্বভৌম এইরূপে রাজার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই দৌত্যকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কপাট উদ্ঘাটিত হইলে প্রভু দর্শন-সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখ কিরূপ তাহা এখানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না। বহু জনতা দেখিয়া প্রভু হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। পাণ্ডাগণ প্রসাদী-মালা ও চন্দন আনিয়া প্রভুকে দিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে প্রভুর সহিত পরিচিত হন, আর সেই আবেদন সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কল্য প্রাতে আমি প্রভুকে কাশীমিশ্রের আলয়ে লইয়া যাইব।

তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিও; প্রভুর সহিত একে একে তোমাদের সকলের মিলন করাইয়া দিব।" তৎপরে সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। প্রভুর অভ্যর্থনার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বেই আপনার বাড়ী ধুইয়া পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু তাহার বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র সার্ব্বভৌমের ঘরণী ও কন্যা ষাটী হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে অন্যান্য মঙ্গলসূচক আনন্দধ্বনি ও কলরব হইতে লাগিল। তৎপরে প্রভু ভক্তগণ লইয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন। এ দিকে সার্ব্বভৌম চর্ব্ব্যচোষ্য প্রভৃতি অতি উপাদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। প্রভু ফিরিয়া আসিয়া হাস্যকৌতুকে ভক্তগণের সহিত নানারূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম আপনি পরিবেশন করিলেন, ও সাধ মিটাইয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন; এবং ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে সিক্ত করিয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। এইরূপে প্রভু দুই বৎসর পরে উত্তম বস্তু সেবন এবং উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিজ-জনের মনে ব্যথা লাগিবে বলিয়া, প্রভু সন্ন্যাসের নিয়মগুলি তাঁহারা নিকটে থাকিলে পালন করিতেন না।

সার্ব্বভৌম ভাবিলেন যে, প্রভু দুই বৎসর হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার শ্রীপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে। আজ তিনি স্বহস্তে তাঁহার পদ-সেবা করিয়া আপনার মনের ও প্রভুর শ্রীচরণের দুঃখ দূর করিবেন; এবং এইজন্য, প্রভু শয়ন করিলে, তাঁহার পদতলে বসিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অতি-কাতর বদনে তাঁহাকে উহা করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ ভট্টাচার্য্য শুনিলেন কিনা জানি না। তবে প্রভুর পদতলে বসিয়া সার্ব্বভৌম দেখিলেন যে, পদতল দুটিতে ব্রণের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং উহা পদ্মফুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে!

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু মলিন-কৌপীন ধারণ করিলে, কি ধূলায় ধূসরিত হইলেও, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দিয়া অনুক্ষণ পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। এমন কি, সেই গন্ধের লোভে, কেবল মনুষ্য নহে, পশু-পক্ষী-কীট পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইত। প্রভু জীবের দুঃখনাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাঁটিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সাধনবলে তাঁহার পদতল চিরদিনই সমান মনোহর ছিল; সে এত মনোহর যে পদতল দেখিলেই বুঝা যাইত যে, ইহা সামান্য মানুষের পদতল নহে। সার্ব্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাঁহার মনের দুঃখ ও ভ্রম দূর হইল; ভাবিলেন, পৃথিবী যাঁহার বিচরণে ধন্যা, তিনি তাঁহার শ্রীপদে আঘাত কেন করিবেন? প্রভুর আজ্ঞাক্রমে সার্ব্বভৌম প্রসাদ পাইতে গেলে, প্রভু একটু ঘুমাইলেন। তৎপরে সারা-নিশি প্রভু নির্জ্জনে ভক্তগণ লইয়া তীর্থযাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন; বলিতেছে "দক্ষিণদেশে নানারূপ বিগ্রহ এবং মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈব প্রভৃতি বহুবিধ সাধু দেখিলাম। বৈষ্ণব বড় দেখিলাম না। যাহাও দেখিলাম তাহার মধ্যে তোমাদের মত একজনকেও দেখিলাম না। তবে এক মাত্র রামানন্দ রায় আমাকে সুখ দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় রসিক-ভক্ত আর দেখি নাই। সার্ব্বভৌম অমনি বলিলেন, "সেইজন্য ত তোমাকে তাঁহার সহিত মিলিতে বলিয়াছিলাম। অগ্রে যখন তিনি আমাকে কৃষ্ণকথা রসতত্ত্ব শুনাইতেন, তখন না বুঝিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতাম। কিন্তু তুমি যখন আমার বৃথা-জ্ঞানরূপ-অজ্ঞানতা দূর করিলে, তখনি তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম।" প্রভু বলিলেন, "সাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, রামানন্দের মতই সর্ব্বোত্তম। তাই আমি তাঁহার মত অবলম্বন করিয়াছি।" এইকথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিয়া উঠিলেন; আর

বলিলেন, "রামানন্দ আর মত-কর্ত্তা হইতে পারেন না। তুমি তাঁহার কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এ কথা সকলকেই বলিয়া থাক। ইহাতে বুঝিলাম যে, রামানন্দ রায়ের দ্বারা জগতে তুমি রসতত্ত্ব প্রচার করিবে।"

প্রভু, বলিতেছেন, "দক্ষিণদেশে আরও দুটি উপাদেয় বস্তু পাইয়াছি। সে দুইখানি গ্রন্থ,— ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। রামানন্দের কাছে যে মত শুনিলাম, এই দুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম। রামানন্দ এই দুই গ্রন্থ লিখাইয়া লইয়াছেন। আমিও লিখাইয়া লইব বলিয়া আনিয়াছি।" এইরূপে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থকার বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে দুর্লভ প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে যে কয়েকখানি গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান, সেই কয়েকখানি মহাগ্রন্থের নাম করিতেছি : যথা—জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীভাগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শকুন্তলা, আর রামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক। শকুন্তলার নাম ইহার মধ্যে করিলেন, তাহার কারণ যাঁহারা রসিক ভক্ত, তাঁহারা এই মহা-নাটকে কেবল কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিয়া থাকেন।

পর দিবস প্রাতে সার্ব্বভৌম প্রভুকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশীমিশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে কাশীমিশ্র গললগ্নবাস হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সে বাড়ীটি সর্ব্বপ্রকারে মনোমত। এই বাড়ীর কয়েকখানি ঘর, মিশ্র মহাশয় সংস্কার ও ধৌত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু আগমন করিবামাত্র কাশীমিশ্র চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু আমার এই গৃহ গ্রহণ করুন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।"

কাশীমিশ্র মহারাজের গুরু; যখন মহারাজা পুরীতে আগমন করেন, তখন কাশীমিশ্রকে ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিয়া ও তাঁহাকে নিদ্রিত করাইয়া, আপনি ভোজন ও আরাম করেন।

কাশীমিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলেন। তখন সার্ব্বভৌম তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "তোমার থাকিবার নিমিত্ত মহারাজা এই বাসা সাব্যস্ত করিয়াছেন; তোমার যোগ্য বাসা সন্দেহ নাই। এখন ইহা আপনি গ্রহণ করেন, ইহা কাশীমিশ্রের ও আমাদের সকলের নিতান্ত বাসনা।"

প্রভু কাশীমিশ্রকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; করিয়া বলিলেন, "এ দেহ তোমাদের, তোমরা যাহা বল সেই আমার কর্ত্তব্য।"

প্রভুর আলিঙ্গন পাইবামাত্র কাশীমিশ্র বিহ্বল হইলেন। তিনি দেখিলেন প্রভু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কাজেই কাশীমিশ্র চিরদিনের নিমিত্ত প্রভুর হইলেন। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"কাশীমিশ্র আসি পড়ে প্রভুর চরণে। গৃহ সহিত আত্ম তারে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইলা। আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈলা।"

প্রভু আপনার বাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কাশীমিশ্র বহির্বাটির পীড়ায় দিব্যাসনে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে সার্ব্বভৌম বসিলেন। তখন শ্রীনীলাচলবাসী ভক্তগণ এবং জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আসিলেন। তাঁহারা জনে জনে প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভু হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসী সকলেরই প্রণম্য; সন্ন্যাসীর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কাজেই প্রভু উঠিয়া প্রত্যেককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। যিনি যখন প্রণাম করিতেছেন, সার্ব্বভৌম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছেন; বলিতেছেন, "ইনি পরীক্ষা মহাপাত্র, এই শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা। ইনি জনার্দ্দন মহাপাত্র, শ্রীজগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবা করেন। ইনি কৃষ্ণদাস স্বুবর্ণ-বেত্র ধরিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রহরীর কার্য্য করেন। ইনি শিখি-মাহাতি, কায়স্থ ও লিখনাধিকারী, আর ইহার দুই ভ্রাতা মুরারী ও মাধবী। ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরম বৈষ্ণব। ইনি প্রহরিরাজ মহাপাত্র, ভাগবতোত্তম।" সার্ব্বভৌম এইরূপে শ্রীজগন্নাথের

প্রধান প্রধান সেবকগণকে প্রভুর সহিত মিলন করিয়া দিতেছেন। এমন সময় মহারাজার ব্রাহ্মণমন্ত্রী চন্দনেশ্বর, মুরারি ও হংশেশ্বর আসিলেন। যদিও ইহারা রাজপাত্র, তথাপি মহাভক্ত। ইঁহারা আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্ব্বভৌম ইঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

এমন সময় চারি পুত্রের সহিত ভবানন্দ রায় আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ইনি ভবানন্দ রায়; রামানন্দ রায় ইহার প্রথম পুত্র, আর এই চারিজন রামানন্দের ভ্রাতা।" এই কথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধ ভবানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; বলিতেছেন, "তুমি রামানন্দের পিতা? তোমার মত ভাগ্যবান ত্রিজগতে আর নাই। রামানন্দ যাঁহার পুত্র তাঁহার আর অভাব কি?" ভবানন্দ রায় তখন করজোড়ে বলিলেন, "আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম। আমাকে যে তুমি স্পর্শ কর, ইহা কেবল তুমি শ্রীভগবান্ বলিয়া। তোমার কাছে ছোট বড় সবই সমান।" যথা চরিতামৃতে—

"নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্ম সঁপিলাম আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে। যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে॥"

এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে প্রভুর কাছে রাখিলেন। তাঁহার কার্য্য হইল, ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রভুর সেবা করা।

প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইবার জন্ত ভক্তগণ বড় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু প্রভুর বিনা অনুমতিতে তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ তাহাই প্রভুকে জানাইলেন যে, শচী-মা ও ভক্তগণ বড় ব্যস্ত আছেন। প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ পাইলে নবদ্বীপবাসীরা সজীব হইবেন। অতএব, "প্রভু আজ্ঞা করুন, নবদ্বীপে তোমার আগমন সংবাদ পাঠাই।" প্রভু "পাঠাও" এ কথা বলিলেন না; তবে বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি তাহাই কর।"

প্রভু দুই বৎসর পূর্ব্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন, এবং একাদশ মাস পরে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ;—এই সংবাদ শ্রীনবদ্বীপের লোকে চৈত্র মাসে পাইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু ইচ্ছা করিয়া অলৌকিক কোন কার্য্য করিতেন না। কিন্তু তবু এইরূপ অলৌকিক কার্য্য-সকল অনবরত যেন আপনি-আপনি তাঁহার সহিত বিচরণ করিত। প্রভু যে-মাত্র নীলাচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মুহূর্ত্তে ভারত-বর্ষের নানাস্থান হইতে তাঁহার এই লীলার সহকারীগণ বিনা-সংবাদে নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। প্রভু শীতের শেষ মাসে নীলাচলে আসিলেন, আর দুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চিরসঙ্গীগণ, আপনি-আপনি তাঁহার চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর-অবতারে "পাত্র" মোটে সাড়ে-তিনজন। অর্থাৎ—স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। শিখি মাহাতি ও মাধবীর কথা এইমাত্র বলিলাম রামানন্দের কথা শুনিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের কথাও বারম্বার বলিয়াছি। এই স্বরূপ দামোদর এখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন, প্রভু প্রকাশ পাইলেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু সে গোপনে। তিনি যে প্রভুর একজন,—কি বিশেষ একজন ভক্ত, তাহা আর কেহ জানিতে পারিলেন না; সে কেবল তিনি আর প্রভু জানিতেন। শ্রীপ্রভুর লীলাঘটিত যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট-বড় শত-শত ভক্তের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের পরে মহাজনের লক্ষ লক্ষ পদ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল একটিতে পুরুষোত্তমের নাম

পাইয়াছি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে। নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারানসী গিয়া॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে। রাত্রি দিনে কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কার সনে। নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ-প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, আর রসাভাস। শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করেন পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

পুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে গোপনে বাস করেন, অতরঙ্গ সেবা করেন, রস লইয়া থাকেন, হৈ-চৈ হইতে দূরে পলায়ন করেন; সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য প্রভু ব্যতীত

পুরুষোত্তম প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ।" প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভুর উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রভুর নামগন্ধও নাই,—যেখানে সাধুগণ ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী, সেই বারাণসীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'স্বরূপ দামোদর' এই স্বরূপ প্রভুকে কেবল যে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন তাহা নহে— প্রভুর তত্ত্ব তিনিই প্রথম তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রেমের শক্তি দেখুন,—অকৈতব-প্রেমের সূক্ষ্মগতি অনুভব করুন। পুরুষোত্তম প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন; অথচ তাঁহার উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপর রাধার প্রেমজনিত মান যে অসম্ভব নয়, তাহা স্বরূপ কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন।

স্বরূপ শেষ-জীবন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন;

শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে, সুখে-দুঃখে প্রভুর সহিত থাকিতেন। তিনি দাসরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, সখা রূপে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন, আর মাতারূপে—তাঁহাকে লালন পালন করিতেন, যত্ন করিয়া আহার করাইতেন, শয্যায় শয়ন করাইতেন ও নানারূপে রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রভুর সেবার জন্য স্বরূপের প্রয়োজন হইত, আর প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পাওয়া যাইত। প্রভু শয়ন করিতেছেন না; রাত্রি অধিক হইয়াছে, প্রভু নামজপ করিতেছেন,—কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিদ্রা যাইবেন না। কিন্তু শরীর অতি দুর্ব্বল, একটু নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে কেন? ইহাই ভাবিয়া স্বরূপ নানারূপ সাধ্যসাধনা করিতেছেন;—বলিতেছেন, "প্রভু চলুন, রাত্রি অধিক হইয়াছে।" শ্রীনবদ্বীপে শচীও তাঁহার নিমাইকে ঐ ভাবে সেবা করিতেন। প্রভু যাইবেন না, স্বরূপও ছাড়িবেন না। তখন প্রভু স্বরূপকে খোশামোদ করিতে লাগিলেন;—কখন বলিতেছেন, "স্বরূপ! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনিই যাইতেছি।" আবার— "স্বরূপ! রাত্রি ত অধিক হয় নাই আমাকে আর একটু কৃষ্ণনাম জপ করিতে দাও, তোমাকে মিনতি করি।" একটু পরে—"স্বরূপ! আমার নিদ্রা আসিতেছে না, শয়ন করিয়া কি করিব?" কি, কখন একেবারে ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! আমি শয়ন করিব কিরূপে? কৃষ্ণ এখনই আসিবেন, তাই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" কিন্তু শেষে প্রভু স্বরূপের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কোন প্রকারে স্বরূপ তাঁহাকে শয্যায় লইয়া শয়ন করাইলেন এবং প্রদীপ নির্ব্বাণ ও দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং প্রভু কি করেন জানিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া রহিলেন। এদিকে—তিনি চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, প্রভু আবার চুপে চুপে নামজপ আরম্ভ করিলেন, স্বরূপ আবার

গৃহে প্রবেশ করিলেন। আর ধরা পড়িয়াছেন দেখিয়া অমনি ভয়ে প্রভুর মুখ শুখাইয়া গেল। তখন স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, ভক্তগণকে দুঃখ দিতে তোমার কি একটুও মায়া হয় না? ভাল, তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু আমরা সামান্য জীব, আমাদের দেহধর্ম্ম আছে, আমরা একটু নিদ্রা না গেলে বাঁচিব কিরূপে?" প্রভু তখন অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! ক্ষমা দাও, আমি এখনি নিদ্রা যাইতেছি।" প্রভু ও স্বরূপে নিতি-নিতি এইরূপ কাণ্ড হয়! প্রভু, কৃষ্ণবিরহে কি মিলনে যে ভাবে যখন বিভাবিত হয়েন, তাহা স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলেন। প্রভু কৃষ্ণবিরহে রাইউন্মাদিনী-ভাবে বিভাবিত হইলেন; অমনি স্বরূপ তাঁহার নিকট ললিতা-রূপে প্রকাশ পাইলেন। প্রভু স্বরূপকে ললিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বরূপের গলা ধরিয়া মন উঘাড়িয়া মনের বেদনা বলিতেছেন, আর স্বরূপও তখন সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রস আস্বাদন করিতেছেন।

প্রভু যখন রাধারূপে কৃষ্ণদর্শনে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, স্বরূপ তখন ললিতা-রূপে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু যখন কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, স্বরূপ তখন প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে চেতনা করাইতেছেন। প্রভুর চিত্ত ও স্বরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছে। প্রভু যখন যে-ভাবে বিভাবিত হইলেন, স্বরূপও অমনি আপনা-আপনি সেইভাবে বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ-ভাব উপস্থিত হইলে, স্বরূপ অমনি আপনা-আপনি বিরহের পদ গাইয়া প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ" নামে অভিহিত হন।

প্রভু ও স্বরূপ দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া, এক-চিত্ত হইয়া, প্রেমের যে নিবিড়-মালঞ্চ, তাহাতে দিব্যচক্ষে দ্বাদশবর্ষ বিচরণ

করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত-চন্দ্রোদয় নাটককার স্বরূপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"অহো রস কলাবান কৃষ্ণ ভগবান। তার রসাচার্য্য ভাব হইতে মূর্ত্তিমান ॥
সন্ন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া। অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥
সর্ব্বলোক দামোদর স্বরূপ বলেন। প্রেম হইতে অপৃথক তাঁহারে মানেন ॥"

প্রভু গদগদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। সেই গোলোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, সেই দুর্লভ সুধা,—যাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল,—তাহা ভোগ করিবার প্রধান অধিকারী স্বরূপ।

প্রভু দ্বাদশবর্ষ গোপনে এই সমুদায় ব্রজের রস নিঙড়াইয়া সুধা বাহির করিলেন। স্বরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহা শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে, প্রভুর অবতার বৃথা হইত। কিন্তু স্বরূপ সেই সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহা চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন।

এই সুধা কি,—না ব্রজের নিগূঢ়-রস। এই রস বাহির করিতে আমাদের প্রভুর ন্যায় বস্তুর দ্বাদশবর্ষ লাগিয়াছিল। এই রসের চর্চ্চা জনতার মধ্যে হইত না। তাই প্রভু আপনার কুটীরে রজনীতে স্বরূপের গলা ধরিয়া উদ্গীরণ করিতেন। স্বরূপ এই সমুদায় ভাব তাঁহার কড়চায় লিখিয়া রাখিলেন, আর সঙ্গীত দ্বারা উহার জীবন্ত আকার দিলেন। স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম। এখন যে উন্মাদকারী কীর্ত্তনের সুর শুনা যায়,—প্রভুর কৃপা পাইয়া স্বরূপ তাহা সৃষ্টি করেন। শুধু সুর নয়, তালও বটে। এইরূপে দশ সহস্র মহাজনের পদের সৃষ্টি হইল। আর স্বরূপ যদি প্রভুর সহিত শেষ দ্বাদশবর্ষ বাস না করিতেন,

তবে প্রভু যে এত দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা জানিতেও পারিত না।

স্বরূপ রাগ করিয়া কাশীতে যাইয়া চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস লইলেন। গুরু বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বরূপের গৌরগত প্রাণ; তিনি গোপনে গৌররূপ ধ্যান করেন, আর রোদন করেন। যখন শুনিলেন, প্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়াছেন, আর তৎক্ষণাৎ কাশী হইতে নীলাচলে ছুটিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ হইতে ফিরিয়াছেন। প্রভু কাশীমিশ্রের আলয়ে ভক্তগণ সহ বসিয়া নামজপ করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্য অবধুত বেশে দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন।" এই সংবাদ শুনিয়াই প্রভুর চন্দ্রবদন প্রফুল্ল হইল। তিনি তখনই দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গেলেন, এবং উভয়ের নয়নে নয়নে মিলিত হইল। প্রভুকে দেখিয়াই স্বরূপের বুক দুরদুর করিতে লাগিল। তিনি কষ্টেশ্রষ্টে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

> "হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
> শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
> শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
> শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"

অস্যার্থ—

"শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি তব দয়া সাধ্যাবধি, মোরে হও আনন্দ উদয়া।
মাধুর্য্য মর্য্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই, সে মাধুর্য্য মর্য্যাদা বিশদা।
খেদকে কাঁপায় হেলে, রস দেই সর্ব্বকালে, আমোদ উন্মীলে তাহে সদা।
যাহা হৈতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ, মাধুর্য্য মর্য্যাদা মত্তা অতি।
নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়, শ্রীকৃষ্ণচরণে দেই রতি।
হেন দয়া মোরে কর, এত বলি দামোদর, প্রভুর নিকটে চলি যায়।"

স্বরূপ প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন, অমনি প্রভু তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা হৃদয়ে ধরিলেন এবং উভয়ে উভয়কে ভুজলতায় বন্ধন করিয়া অচেতন হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন ; ভক্তগণ স্থির নয়নে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, উভয়ে উঠিয়া বসিলেন, এবং কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি যে আসিবে তাহা আমি কল্য স্বপ্নে দেখিয়াছি। আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। তোমা বিনা আমি অন্ধ ছিলাম, এখন আমি দুই চক্ষু পাইলাম।"

স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, আমি আপনি আসি নাই, তোমার কৃপা-পাশে আমাকে বান্ধিয়া আনিয়াছ। আমি অতিশয় অধম, তাই তোমাকে ছাড়িয়া দূর-দেশে গিয়াছিলাম। তোমার চরণে যদি লেশ-মাত্র প্রেম থাকিত, তবে আমি কি আর যাইতে পারিতাম ? স্বরূপ তারপর শ্রীনিত্যানন্দ ও পরমানন্দপুরীকে প্রণাম ও অন্যান্য ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। প্রভু স্বরূপকে একখানি ঘর ও তাহার সেবার নিমিত্ত একজন কিঙ্কর দিলেন।

এই যে পরমানন্দপুরীর কথা বলিলাম, ইঁহার মাহাত্ম্যের কথা কিছু বলিব। ইঁহাতে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপের শক্তি ছিল। ইনি ত্রিহুত নিবাসী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, আর তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের অংশী ; দেখিতে পরম সুন্দর, প্রকৃতি অতি মধুর আর ভারত-বিখ্যাত সুখ্যাতি। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। যদিও তখন দেশ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ছারেখারে যাইতেছিল এবং সেইজন্য সমস্ত রাজপথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তবুও শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তখন সমস্ত ভারতে প্রচার হইয়াছে। প্রভুর কথা শুনিবা-মাত্র পরমানন্দপুরী তাঁহাতে আকৃষ্ট হইলেন। শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের যে কৃষ্ণ-প্রেম তাহার এক-কণাও

তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর ছিল না। তাঁহার যেরূপ প্রেম, তাহা জীবে সম্ভবে না। আরও শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং—তিনি, এবং পরমানন্দ ইহা কতক বিশ্বাসও করিলেন। আবার তাঁহার সমুদায় কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। প্রথমে শুনিলেন, তিনি দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, তাই তীর্থভ্রমণ ছল করিয়া করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, প্রভু উত্তরাভিমুখে গিয়াছেন। কাজেই উত্তরে আসিতে লাগিলেন। শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানেই থাকুন, শ্রীনবদ্বীপে গেলে তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিবেন; ইহাই ভাবিয়া একেবারে নবদ্বীপে শ্রীশচীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীর তখন যত কুটুম্বিতা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। তাঁহাদিগকে তিনি আদর করেন। সন্ন্যাসীকে আর তাঁহার ভয় নাই, তাঁহাদের যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন সংবাদ পান না। তাই নিমাইকে তল্লাস করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন, আর বলেন, "যদি তাঁহার সহিত দেখা হয়, তবে আমাদের দুর্দ্দশার কথা জানাইবে, আর একবার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে বলিবে।"

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোধ হইল যেন বিশ্বরূপ আসিয়াছেন। ফল কথা, শচী তখনও জানেন না যে, বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। পুরী ভাবিলেন, শচীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইবেন; আর শচী ভাবিলেন, পুরীর নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইবেন। কিন্তু উভয়েরই আশা ভঙ্গ হইল। তবে পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে পদে অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হইত। পরমানন্দপুরী শচীর বাটী আসিলেন শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরিত লোক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন

যে, প্রভু নীলাচলে আসিয়াছেন। ঐ সংবাদ শুনিয়া নবদ্বীপে আনন্দ-কলরব উঠিল, এবং ভক্তগণ নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরমানন্দপুরীর দেরি সহিল না, তিনি কমলাকান্ত নামক প্রভুর অনৈক ব্রাহ্মণ-ভক্তকে সঙ্গে করিয়া শচীর নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল মুখে দৌড়িলেন।

শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু ভক্তোত্তম পরমানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথের মন্দির তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথকে মনে পড়িল। তখন পুরী অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের ঠাকুর জীবন্ত সামগ্রী। তাই পুরী ভাবিতেছেন, "শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়া এ কি কুকার্য্য করিলাম?" শ্রীজগন্নাথকে অবমাননা করিলেন বলিয়া ভয় হইল। তখন করজোড়ে শ্রীমন্দিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—

"আগে না দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ। গৌরচন্দ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ॥
ইথে মোর যদ্যপি হইল অপরাধ। তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ॥
তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ, জান সবার অন্তর। মোর উৎকণ্ঠার কথা তোমার গোচর॥
উৎকণ্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি। ইহা জানি অপরাধ ক্ষম মোর তুমি॥"

শ্রীমন্দিরের পানে চাহিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন মন্দিরের নিকট জনতা হইয়াছে। তখন একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে লোকের জনতা হইয়াছে, আর মধ্যস্থানে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী অতিশয় দীর্ঘাঙ্গ বলিয়া সবার উপরে তাঁহার মস্তক দেখা যাইতেছে। আর একটু কাছে যাইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসীর বয়স অল্প, তাঁহার বর্ণ বিমল-হেমের ন্যায় উজ্জ্বল

এবং রূপ অতুলনীয়। আরও দেখিলেন, সকলের দৃষ্টি এই সন্ন্যাসীর উপর রহিয়াছে। শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ অমানুষিক, তাই যুবক সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ,—তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরী গোসাঞি, প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা চন্দ্রোদয়-নাটক এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"দেখিলাম মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। জগন্নাথ দেখি বসিয়াছেন অতি রঙ্গে॥
জগন্নাথের রূপ গুণ কহিতে কহিতে। দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে শতে শতে॥
হেম মণি শিলা বিলাসিত বক্ষঃস্থল। তাহা বাঞা পড়িছে আনন্দ অশ্রুজল॥
আপাত মস্তক সব পুলকে বেষ্টিত।"

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পুরী গোসাঞির মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা গেল ; তখন বুঝিলেন যে, এরূপ চিত্তাকর্ষণ, এরূপ রূপ ও লাবণ্য ধারণ, শ্রীভগবান্ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে ; শ্রীগৌরাঙ্গের অতুলনীয় রূপ দেখিয়া পুরী গোসাঞির আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র তাঁহারা দর্শন-সুখ অপেক্ষা আর অধিক কোন সুখ আছে, তাহা জানেন না।

পুরী গোসাঞি যাইয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে হইল যে, একটি মহাপুরুষ আসিয়াছেন। দেখিলেন প্রেমানন্দে সন্ন্যাসীর বদন, প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর সেবক কমলাকান্ত অমনি পরিচয় দিলেন যে, ইনি পরমানন্দপুরী। পরমানন্দপুরীর নাম ভারত-বিখ্যাত। শুনিবামাত্র সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রভুও গাত্রোত্থান করিয়া পুরী গোসাঞিকে প্রণাম করিলেন। উহাতে তিনি ভয় পাইলেন, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রভু প্রণাম করিলে, পুরী তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিলেন "গোসাঞি, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন ;" পুরী বলিলেন,

"আমার ইচ্ছা তোমার নিকট থাকি। তোমার তল্লাসে শ্রীনবদ্বীপে গিয়াছিলাম, সেখানে শচী-জননী আমাকে ভিক্ষা দিলেন। সেখানে শুনিলাম, তুমি নীলাচলে আসিয়াছ। ইহা শুনিয়া জননী-শচী ও অন্যান্য সকলে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছেন। ভক্তগণ সম্মুখে রথযাত্রা উপলক্ষ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। আমার তত বিলম্ব সহিল না, তাই অগ্রে আসিলাম। এখন তোমার রূপ দর্শন করিয়া নয়ন শীতল হইল।" যথা—

"দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল। তীর্থযাত্রাদি মোর সফল হইল॥"

প্রভু তাঁহাকে নিজ বাসায় একখানি ঘর ও সেবার নিমিত্ত একজন কিঙ্কর দিলেন; তাহার অনতিবিলম্বে স্বরূপ আসিলেন। যখন পুরী ও স্বরূপ আসিলেন, তখন সার্ব্বভৌম এই শ্লোক পড়িলেন যে, যেখানে যত নদী আছে সকল সাগরে আসিয়া মিলিত হয়। পুরীকে সে দিবস জগদানন্দ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন।

তাহার পর গোবিন্দ আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়া নাম-জপ করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, "আমি শূদ্রাধম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তখন আমাকে আর তাঁহার অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলিলেন, "তোমরা যাও যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সেবা করিবে। আর আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলিবে যে "তিনি যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন, তখন আমি তাহার মধুর নটেন্দ্ররূপ দর্শন ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি। এখন তাহাকে দর্শন করিলে আর সেরূপ দেখিতে পাইব না, বরং আমার প্রাপ্ত ধন হারাইব। তাই তাহাকে দেখিতে যাই নাই। শ্রীপাদপুরী গোসাঞির আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীচরণে

উপস্থিত হইলাম। এখন প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে স্থান দিতে আজ্ঞা হয়। কাশীশ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, সত্বর আসিবেন।"

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্যপ্রেম তাহার অবধি নাই।" কিন্তু পাঠক মহাশয়; ঈশ্বরপুরী কি বস্তু তাহা একবার অনুভব করুন। যে নিমাই শ্রীভগবান্ বলিয়া জগতে পূজিত, তাঁহার গুরু তিনি। পাছে তাঁহার হৃদয় হইতে প্রভুর গৌর-নটেন্দ্র-রূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে তাঁহার যে শিষ্য, যিনি জগতে শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজিত, তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন না। সার্ব্বভৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত কায়স্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসাঞির কি কার্য্য করিতে?" গোবিন্দ বলিলেন, "সমুদায় কার্যই করিতাম, এমন কি রন্ধন পর্য্যন্ত।" ইহাতে সার্ব্বভৌম পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পুরী গোসাঞি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি কিরূপে শূদ্র-সেবক রাখিলেন?"

এ কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। জাতিবিচার হিন্দুধর্ম্মের মজ্জাগত। সন্ন্যাসীদেরও শাস্ত্রমতে শূদ্র-সেবক রাখিতে নাই।

প্রভু বলিলেন, "যাঁহারা মহাজন তাঁহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিচার করেন, জাতি দেখিয়া বিচার করেন না। সার্ব্বভৌম তখন বলিলেন, "তা বটে! বৈষ্ণবের কাছে এ সমুদায় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি?"

"সার্ব্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয়। কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেষ্টা লৌকিক না হয়॥"

প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সার্ব্বভৌমকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি ইহার বিচার কর। যিনি গুরুকে সেবা করিয়াছেন তিনি পূজ্য, আমি তাঁহার সেবা কিরূপে লইব? আবার এদিকে গুরুর আজ্ঞা। এখন আমি কি করি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। অতএব গোবিন্দকে গ্রহণ করা উচিত।"

তখন প্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দ অমনি প্রভুর শ্রীচরণতলে পতিত হইলেন। এই হইতে গোবিন্দ প্রভুর সেবক। হইলেন। এই গোবিন্দের কথা কি বলিব। যেমন প্রভু তেমনি সেবক নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অন্যকে সেবা করা গোবিন্দের ধর্ম্ম। গোবিন্দ প্রভুকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব। ত্রিভুবনে গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান আর নাই।

অগ্রে কাশীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞি, বামে ভারতী গোসাঞি, পশ্চাতে স্বরূপ ও গোবিন্দ, আর মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ। এইরূপে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন। সকলের কথা বলিলাম এখন ভারতী ঠাকুরের আগমনবার্ত্তা বলিব।

কেশব ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসমন্ত্র দেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহার পরমার্থ—ভাই। গোবিন্দের আগমনের পরেই তিনি নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার যেমন গৌরবর্ণ রূপ, তেমনি প্রকাণ্ড দেহ, আবার সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন—শান্ত, অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই। তাঁহার মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ প্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আসিয়া ভারতী আপনার পরিচয় দিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন মুকুন্দ শীঘ্র প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঠাকুর আসিয়াছেন, তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন।" প্রভু একটু মধুর-হাস্য করিয়া বলিলেন, "তিনি গুরু, আমিই তাঁহাকে দেখিতে যাইব; বিশেষতঃ তিনি শান্ত। তিনি "শান্ত;" এই কথা বলিয়া প্রভু ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি অন্যজাতীয়,—প্রভুর গণ নহেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ

ভারতী ঠাকুরকে আনিতে চলিলেন। প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া ভারতীর নয়ন-ভৃঙ্গ প্রভুর শ্রীবদন-পদ্ম প্রতি আকৃষ্ট হইল। যথা—

"চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বম্ভর। তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর॥
দূর হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা অতি বিস্ময় পাইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইহোঁ জানিল নিশ্চয়। যে অপূর্ব্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয়॥
কনক-পরিঘ সম দীর্ঘ বাহুদ্বয়। স্ফুটতর কনক কেতকী-কান্তি হয়॥
নব দমনক মাল্য লাল্যমণি দ্যুতি। উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি॥
এই মত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি তাহার নিকট আইলা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥"

প্রভু নাম শুনিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, "ইনি শান্ত, ইহার নিকট আমি যাইব।" তাহার পরে দেখেন ভারতীঠাকুর চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন। দেখিবামাত্র প্রভু চটিয়া গেলেন। তখন মুকুন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "কৈ ভারতী-গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ তোমার অগ্রে দাঁড়াইয়া।" প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান। তুমি কাহাকে ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী-গোসাঞি হইলে চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন?" যথা—

"যদি হইতেন তিঁহ ভারতী-গোসাঞি। বাহ্য বেশ চর্ম্মাম্বর পরিতেন নাই॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ আশ্রয় যে সভাকার। চর্ম্মাম্বর বাহ্য প্রতারণা নাহি তার॥"

এই কথা শুনিয়া ভালমানুষ ভারতীর মুখ শুখাইয়া গেল। তাঁহার প্রভুর সহিত পাল্লাপাল্লি দিবার ইচ্ছা নাই। প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া অনেকটা বিশ্বাসও হইয়াছিল; এখন দর্শন-মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। অতএব প্রভু যখন মধুর ভর্ৎসনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, তবে মুখের ভাবে বলিলেন, "ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতেছি।" প্রভু তখন পণ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া একখানি নূতন বহির্ব্বাস আনিলেন। ভারতী উহা গ্রহণ

করিয়া পরিধান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক! আমি এখন বুঝিলাম, আমি যে চর্ম্মাম্বর পরিতাম, ইহা কেবল দম্ভের নিমিত্ত। চর্ম্মাম্বর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় না।"

যে মাত্র ভারতী-গোসাঞি বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, অমনি প্রভু আসিয়া তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন।

কাপড়ের বহির্ব্বাস পরিবর্ত্তে চর্ম্মের বহির্ব্বাস, প্রভুর বাহ্য-প্রতারণা বলিয়া সহ্য হয় নাই, কিন্তু এখন বাহ্য-প্রতারণা ব্যতীত, তাঁহার ধর্ম্মের মধ্যে, আর কই কি আছে? মাঝে মাঝে দুই একটি বিমল বস্তু দর্শন হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ্য-প্রতারণা।

যখন প্রভু ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন ভারতী অতিশয় ভয় পাইলেন। কারণ প্রভুকে দর্শন-মাত্রে তাঁহার চিরকালের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া পুনর্জ্জন্ম হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ এই বিশ্বাস তাঁহার তখন হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ভয় পাইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামিন্! তোমার জীব-শিক্ষা দিবার লাগি অবতার। আমাকে এই নিমিত্ত প্রণাম করিলে। তুমি তোমার জীবকে দৈন্য ও গুরু-সম্পর্কীয় জনকে ভক্তি-শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু তবু আমার এই মিনতি, আমাকে আর প্রণাম করিও না, উহাতে আমার মনে বড় ভয় হয়।" তারপর প্রভুর ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মানন্দের পরিচয় হইল, আর স্বরূপ প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তৎপরে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন, "শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা বর্ণিবার শক্তি আমার নাই; কিন্তু এখন সেই মহিমা আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। যেহেতু সম্প্রতি শ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্গম-ব্রহ্ম উপস্থিত। স্থির-ব্রহ্ম নীলবর্ণ ও জঙ্গম-ব্রহ্ম গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছেন।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া সামান্য অপ্রস্তুত হইলেন, হইয়া হাসিয়া

বলিলেন, "স্বামী, যাহা বলিলে তাহা ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ ধরিয়া স্থির-জগন্নাথ ছিলেন, এখন তুমি, জঙ্গম-জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছ। ব্রহ্মানন্দ-স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি-গৌর পূর্ব্বে বলেছি।

ব্রহ্মানন্দ তখন প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি নৈয়ায়িকের শিরোমণি, তুমি বিচার কর। যিনি ব্যাপ্য তিনি জীব, যিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান্,—এই শাস্ত্রের বচন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বামী আমার চর্ম্মাম্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হইলাম ব্যাপ্য অর্থাৎ জীব, আর স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রীভগবান্।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্বামিন্! আপনারই জয় হইল, আপনার কথাই শাস্ত্রসম্মত!"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "শাস্ত্রের কথাও বটে, আর শ্রীভগবানের যে প্রকৃতি তাহার কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্রকৃতিই এই যে, চিরদিন ভক্তের নিকট তিনি হার মানিয়া থাকেন।" তাহার পরে আবার প্রভুকে বলিতেছেন," "স্বামিন্! আর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন্। চিরদিন আমি নিরাকার ধ্যান করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দর্শন-মাত্র আমার সে ভাব দূরে গিয়াছে। এখন আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়া আনন্দ দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃষ্ণতে আকৃষ্ট হইতেছে, আমার জিহ্বা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে। অধিক কি, তোমাকে আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" যখন ব্রহ্মানন্দ এই কথাগুলি বলিলেন, তখন, তিনি ভাবে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, প্রভু আর উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; তখন প্রভু তাঁহার চিরদিনের পন্থা অবলম্বন করিলেন,—সে কি তাহা বলিতেছি। চরিতামৃতে এই যে কথাটি আছে—

"অন্তর্য্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহি বস্তু প্রকাশে হৃদয়।"

ইহা স্মরণ করুন। প্রভুর এই এক প্রভাব ছিল। তিনি আপনাকে

শ্রীভগবান্, কি অবতার, কি শ্রীভগবানের কেহ, এরূপ কোন কথা মুখাগ্রে আনিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস হইত। অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনার পরিচয় দিতেন না, তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বস্তু কি, তাহা প্রকাশ করিতেন। এরূপ ঘটনা যখনই হইত, তখনই সেই ভাগ্যবানের নিকট প্রভু এইরূপে অন্তরে অন্তরে নিজের পরিচয় দিতেন। সেই ব্যক্তি স্বভাবতঃ, "তুমি নিশ্চিত সেই তিনি, জীবের প্রাণ, যেহেতু তোমাকে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইরূপ বলিলে, প্রভুর একটি উত্তর ছিল; তিনি তাহাই বলিয়া সেই ভাগ্যবানের নিকট আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মানন্দকে এখন সেই উত্তরটি দিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, "স্বামিন্! তোমার কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ। যাহার এরূপ ভাব, সে চারিদিকে কৃষ্ণময় দেখে; এমন কি, তাহার স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়,—আমাকে যে হইবে তাহার বিচিত্র কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "সে ঠিক কথা। কৃষ্ণ প্রেম গাঢ় হইলে এরূপ হয়! আবার যাহার কৃষ্ণ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন দেন, কিম্বা যদি তিনি ছদ্মবেশেও উদয় হয়েন, তাহা হইলেও ঐরূপ হয়।"

প্রভু অমনি কর্ণে হস্ত দিয়া বলিতেছেন, "শ্রীবিষ্ণু! সার্ব্বভৌম, তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে, অতি-স্তুতি আর নিন্দা উভয়ই সমান?"

ব্রহ্মানন্দ আবার প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া কতক যেন আপন মনে আর কতক সার্ব্বভৌমকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যিনি শ্রীভগবান্ তিনি পরমসুন্দর। তাঁহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল করে। সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া যে নিরাকার ধ্যান করে, তাহার কেবল দুর্ব্বাসনা। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে, যাঁহার দর্শনে

আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বস্তু শ্রীভগবান্। এই যে বস্তুটি সন্ন্যাসী-রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ইঁহার দর্শনে শুধু যে আমার মন নির্ম্মল ও রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নয়,—আনন্দে আমাকে একেবারে উন্মাদ করিয়াছে। ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই যে বস্তুটি, ইনি সেই তিনি, যিনি তাঁহার রূপে ও গুণে সর্ব্বজীবকে আকর্ষণ করেন। ভট্টাচার্য্য, তুমি কি বল ?" এই কথা আরম্ভ হইলেই প্রভু অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া তত্ত্ব-বিচার করিতে লাগিলেন। যথা—

"চৈতন্য গোসাঞি হন স্বয়ং ভগবান্। সার্ব্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম। দামোদর (স্বরূপ) পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ উত্তম ॥
সবে মেলি কৈল পরম ব্রহ্মের বিচার ॥"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "স্বামিন্! আপনার সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার।"

ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন, "দেখ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রে ও মহাভারতে আমরা এই কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি। শ্রীভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই একটি নাম আছে, যথা—

"সুবর্ণোবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"

"এই যে শ্রীভগবান্ সুবর্ণবর্ণ ধরিয়া সন্ন্যাসী হইবেন শাস্ত্রে উক্তি আছে, ইহা এতদিন সফল হয় নাই, এখন হইল। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দ সুতরাং তিনি জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে আনন্দ কি? তিনি যাহার প্রতি কৃপাবান হয়েন, তাহার নিকট ভুবনমোহন-রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে আনন্দ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান সে সেই আনন্দপ্রদ-রূপ ধ্যান না করিয়া নিরাকার ধ্যান কেন করিবে?"

এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়া গলায় বসন দিয়া ব্রহ্মানন্দকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাঁহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। ভারতীকে প্রভু বাসা করিয়া দিলেন, আর একটি ভৃত্যও দিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত অহোরহ রহিয়াছেন, আবার তাঁহার মনে অহোরহ একটি বাসনা রহিয়াছে। প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন, আর তাঁহার অন্নদাতা। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন, তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি। সার্ব্বভৌম এই কথা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিবেন বলিয়া অনবরত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাহস হইতেছে না। বলিতে যান, আবার পারেন না। রাজার সহিত যদি তাঁহার নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ কুণ্ঠিত হইতেন না। ওদিকে বিলম্বও আর করিতে পারেন না, যেহেতু রাজার নিকট হইতে পত্র আসিল। রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহার কথা প্রভুর নিকট বলা হইয়াছিল কি না, আর প্রভুর কিরূপ অনুমতি হইয়াছে। তখন ভট্টাচার্য্য সাহস করিয়া করজোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু একটি নিবেদন।" প্রভু মুখ তুলিয়া কথা শুনিবার সম্মতি প্রকাশ করিলেন ; তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু অভয় দেন ত বলি।" প্রভু বুঝিলেন যে সার্ব্বভৌমের অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে। তাই—

"প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাই কিছু ভয়। যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়॥"

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "মহারাজ প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমাকে লইয়া যাইয়া তোমাকে এই কথা বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছেন। আবার সম্প্রতি অতি কাতর হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। একবার তাঁহাকে দর্শন দাও, এই আমাদের ইচ্ছা।" প্রভু এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া কর্ণে হস্ত দিলেন। বলিতেছেন,— "ভট্টাচার্য্য, তুমি বিজ্ঞতম, তুমি ওরূপ কথা কিরূপে বল ? যে নিষ্ঠাবান, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে, তাহার পক্ষে বিষয়ী-ব্যক্তি ও নারী দর্শন অপেক্ষা বিষ খাইয়া মরা ভাল। তুমি আমাকে রাজদর্শন-রূপ অবৈধ কার্য্যে রত করিও না, যেহেতু আমি ভিক্ষুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে শাস্ত্রের কথা বলিলে তাহা আমি জানি। রাজা সামান্য বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথা বলিতাম না। রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক, পরম ভক্ত, তাই তুমি তাঁহাকে দর্শন দিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে না।"

প্রভু বলিলেন, "তাহা হইলেও বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে বিষ। এমন কি, বিষয়ী ব্যক্তির কি স্ত্রীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ভিক্ষুকের দর্শন করিতে নাই, কি জানি যদি মন বিচলিত হয়। ঐশ্বর্য্যশালী রাজার সহিত আমাকে মিলিতে বল?"

সার্ব্বভৌম তবু নিরস্ত হইলেন না, যেন প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন তাহারই উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভু একটু কঠিন হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি আর্য্য, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি যদি এরূপ অন্যায় আজ্ঞা কর, তবে নীলাচল হইতে আমার পলাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য করজোড়ে ক্ষমা মাগিলেন, আর বলিলেন,—এমন কার্য্য তিনি আর করিবেন না।

সার্ব্বভৌম তখন রাজাকে লিখিলেন যে, প্রভুর অনুমতি হইল না। তবে তিনি ভক্তবৎসল, অনুমতি অবশ্য হইবে। কিন্তু রাজার বিলম্ব সহিতেছে না। তিনি আবার সার্ব্বভৌমকে লিখিলেন যে, প্রভু যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার ভক্তগণ দ্বারা তাঁহার মন দ্রব করাইবে। তিনি আরও লিখিলেন যে, প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার রাজ্য পর্য্যন্ত ভাল লাগিতেছে না। এমন কি, প্রভু যদি তাঁহাকে দেখা না দেন, তবে তিনি কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগী হইয়া বাহির হইবেন। এই পত্র পড়িয়া সার্ব্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর নিকট আবার গমন করিতে সাহস হইল না; তখনই ভক্তগণ লইয়া ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তাঁহাদিগকে সমুদায় কহিলেন, ও

রাজার পত্র দেখাইলেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, যে তিনি যদি প্রভুর মন কোমল করিতে পারেন, তবেই হইবে। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের সাহস হইল না। তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "চল সকলে যাই। তাঁহাকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না, তবে রাজার চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুর মন নরম করিব। সকলে দল বান্ধিয়া প্রভুকে যাইয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন; সার্ব্বভৌম সকলের পাছে, নিতাই সকলের আগে। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কোন কথা আছে, তাই শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন। নিতাই বলিতে গেলেন, কিন্তু একে একটু তোতলা, তাহাতে আবার কথাটা তত ভাল নয়, তাই বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমরা যেন কি বলিবে? বল, -ামি শুনিতেছি।" ইহাতে নিতাই সাহস বান্ধিয়া বলিলেন, "তোমাকে না বলিলে মরি, বলিতেও সাহস হয় না। আর কিছু নহে, রাজা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। রাজা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। রাজা লিখিয়াছেন যে, যদি তোমার দর্শন না পান তবে কর্ণে কড়ি দিয়া উদাসীন হইবেন, তাঁহার রাজ্য-সুখ আর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের এক মাত্র সাধ যে তোমার শ্রীচরণ ও শ্রীবদন নয়ন ভরিয়া একবার দেখিবেন।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া, কতক রুক্ষ কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা যে আমাকে লইয়া এখন কটকে চল। তাহা হইলে তোমাদের বড় ভাল হইবে,—না? তোমরা যদি পরমার্থ না মান লোকে কি বলিবে, তাই একবার ভেবে দেখ? অপরের কথা দূরে থাকুক, দামোদর পর্য্যন্ত আমাকে নিন্দা করিবেন। ভাল, দামোদর আমাকে আজ্ঞা করিলে আমার রাজার সহিত মিলিতে আপত্তি নাই।"

দামোদর বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব আর তুমি শ্রীভগবান তোমাকে আমি বিধি দিব ইহা হইতেই পারে না। তবে রাজার যদি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রেম থাকে, তবে তিনি অবশ্য তোমার চরণ পাইবেন, ইহা আমি বলিতে পারি।" শ্রীনিত্যানন্দ তাড়া খাইয়া ভয় পাইয়াছেন। বলিতেছেন "সর্ব্বনাশ! রাজদর্শন কর তোমাকে এ কথা কে বলিবে? তবে রাজা যখন তোমার নিমিত্ত প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তুত, তখন তোমার কৃপা-চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে তোমার একখানা বহির্ব্বাস পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহা পাইলে রাজা এখন সুস্থির হইবেন।" প্রভু বলিলেন, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তাহা কর, আমার আপত্তি নাই।" তাহা করা হইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু নিরস্ত হইলেন না; তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রভু যে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ্য নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহার আর কোন কারণ নাই, কেবল এই যে, ভূপতির তখন প্রভু-দর্শনে অধিকার হয় নাই। রাজা সকলের কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাঁহার বাসনা রোধ করে কাহার সাধ্য। ইচ্ছা হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, তখন দেখিবেনই দেখিবেন। এই যে ইচ্ছা, কেবল প্রেম ও ভক্তি জনিত নহে। তাহা হইলে, প্রভু-দর্শন সুলভ হইত। কিন্তু এই ইচ্ছার হেতু প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আরও কিছু ছিল, তাহা এই যে,—তিনি রাজা। তিনি রাজা, প্রভুর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পারিবেন না, তাহা কিরূপে হইবে? তিনি না দেশের রাজা? তাই, প্রভু নিষ্ঠুর হইয়া বলিলেন যে, এ কথা পুনরায় উত্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। রাজা শুধু বহির্ব্বাস পাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন না, তবে সার্ব্বভৌমের পত্রে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সার্ব্বভৌম লিখিলেন যে, প্রভু অবশ্য তাঁহাকে দর্শন দিবেন, তিনি যেন ব্যস্ত না হন।

প্রতাপরুদ্র স্নানযাত্রার দুই তিন দিন থাকিতে প্রতি বৎসর পুরীতে আসেন, সেই নিয়মানুসারে নীলাচলে আসিলেন। রাজার সঙ্গে রাম রায়ও আসিলেন। রামানন্দ, প্রভুকে বিদ্যানগর হইতে বিদায় দিয়া, সৈন্যসামন্ত সহ রাজার কাছে গমন করেন, এবং তাঁহাকে বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া চিরদিনের তরে অবসর লয়েন, এখন রাজার সহিত নীলাচলে আসিলেন। রাজা পুরীতে আসিয়াই, "কে আছ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া আন," বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। দূত দৌড়িয়া আসিয়া সার্ব্বভৌমকে রাজার আজ্ঞা জানাইল।

রাজা আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন, আর রামরায় জগন্নাথ দেখিতে না যাইয়া প্রভুকে দেখিতে দৌড়িলেন।

রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাত্র মিত্র লইয়া বসিয়া, সার্ব্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। রাজার হৃদয় তখন আনন্দে পরিপ্লুত; ইহা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া নয়, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আশায়। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে পূর্ব্বে আশা দিয়া লিখেন, তাহাতে রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি নীলাচলে আইলেই প্রভুর দর্শন পাইবেন। তাহার পরে রামানন্দ কটকে যাইয়া কার্য্য হইতে অবসর মাগিলে, রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, বিষয়কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি প্রভুর চরণে থাকিবেন। এইরূপে রাজার নিকট আবার প্রভুর কথা উত্থাপিত হইল। তখন রামানন্দ সহস্র মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে রাজার যে কিছু সন্দেহ ছিল, রামরায়ের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহা দূর হইল। রাজা তখন কাতর ভাবে রামানন্দের শরণাগত হইয়া বলিলেন, "তুমি প্রভুর প্রিয়পাত্র, আমায় একবার প্রভুকে দেখাও।" রামরায়ও ইহা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "প্রভু প্রেমভক্তির বশ, তোমার সময় হইলে তোমাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার রীতিই এই।"

রাজা প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার কিছু পূর্ব্বে নীলাচলে যেরূপ আসিয়া থাকেন, এবারও সেইরূপ আসিয়াছেন। কিন্ত এবার জগন্নাথ দর্শন করিতে তত নয়, যত প্রভুকে দর্শন করিতে। দূতী প্রেরণ করিয়া, প্রিয়তমের নিমিত্ত বাসকসজ্জা করিয়া, প্রিয়তমের আগমন সংবাদ প্রতীক্ষায় ও উল্লাসে প্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকেন, রাজা সেইরূপ সার্ব্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; রাজা প্রণাম করিয়া ভট্টাচার্য্যকে বসাইলেন, এবং বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, প্রভুর নিকট লইয়া চল।" অমনি ভট্টাচার্য্যের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি কষ্টে-সৃষ্টে বলিলেন যে, প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই। তাহার পরে রাজাকে ২।১টা আশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন, কিন্ত রাজা সে অবসর দিলেন না; প্রভুর অনুমতি হয় নাই শুনিবামাত্র ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। যথা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে—

"শ্রীচৈতন্ত দরশন, না দিবেন অভাগার প্রতি !
হাহা ধিক রাজত্ব, ইহা হইতে সুনীচত্ব,
পৃথিবীতে আর আছে কতি।
দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে,
মহাপ্রভু করে দরশন।"

রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত নীচ! আমি যাহাকে ঘৃণা করিয়া দেখি না, তাহাকে প্রভু দেখা দেন, তবু আমাকে দেখা দিবেন না! ভাল ভট্টাচার্য্য, আমি নয় নীচ হইলাম, তিনি ত শ্রীভগবান্? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে আমাকে উপেক্ষা কি বলিয়া করিবেন? তবে কি তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন যে, একা প্রতাপরুদ্র ব্যতীত জগতের তাবল্লোককে উদ্ধার করিবেন? ভট্টাচার্য্য, আমারও প্রতিজ্ঞা শুন।

তিনি শ্রীভগবান্, আমাকে দর্শন দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহার দর্শন না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এরূপ যাহার দৃঢ়সঙ্কল্প তাহার অভাব কি? অবশ্য প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তবে আরও দুই এক দিন অপেক্ষা কর।" যথা চরিতামৃতে—

"তেঁহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর। অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥"

এদিকে রাজা শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন দেখিয়া, রামানন্দ, তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। রামানন্দ আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, আর উভয়ে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণ আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পরে দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। রাজা রামানন্দকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার রাজা রামানন্দের চিরদিনের অন্নদাতা। রাজাকে যে প্রভুর সহিত মিলাইবেন, ইহা তাঁহার কাজেই আন্তরিক ইচ্ছা। রামানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু তুমি যখন নীলাচলে আসিলে, আমি তাহার কিছুদিন পরে রাজার নিকট গমন করিলাম; এবং বিষয় হইতে আমাকে অব্যাহতি দিতে রাজার অনুমতি চাহিলাম। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, আমি যতদিন বাঁচিব, প্রভুর চরণ পূজা করিব, এই সঙ্কল্প করিয়াছি।" এই কথা বলিবামাত্র রাজা মহা-প্রেমে চঞ্চল হইলেন, এবং উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং পরে বলিলেন, "তুমি ধন্য, প্রভুর কৃপা পাইয়াছ। আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নহি। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও এবং তাঁহার চরণ ভজন করিয়া জন্ম সার্থক কর। আরও বলিতেছি, তুমি বিষয় কার্য্য করিও না, কিন্তু তোমার যে বেতন ইহার

দ্বিগুণ পাইবা। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাময়, যদিও এজন্মে আমাকে কৃপা না করেন, তবে অবশ্য অন্য কোন জন্মে করিবেন।"

এই সমুদায় বলিয়া শেষে রামরায় বলিতেছেন, "প্রভু, রাজার তোমার প্রতি যে প্রেম দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সে প্রেমের লেশও আমাতে নাই।" এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তোমায় যিনি ভক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান। রাজার এ গুণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার পাত্র হইবেন।" প্রভু রাজাকে যে কৃপা করিবেন, এই প্রথমে তাহার আভাস দিলেন। তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "রামানন্দ, শ্রীমুখ দর্শন করিয়াছ?" রামরায় বলিলেন, "না, এই এখন যাইব।" ইহাতে প্রভু বলিলেন, "এ কি অকার্য্য করিলে! জগন্নাথ ঈশ্বর, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কেন এখানে আসিলে?" রামরায় বলিলেন, "চরণ রথ, হৃদয়-সারথী। সারথী যেদিকে লইয়া যায়, চরণ সেই দিকে গমন করে। হৃদয়-সারথী এই দিকেই আনিলেন।" প্রভু বলিলেন, "তবে যাও, এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত দেখাশুনা কর গিয়া।" রামরায়, প্রভু ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ, প্রভুর নিকট নিবেদন করেছিলে?" রামরায় বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরুন। প্রায় হয়েছে, একটু বিলম্ব আছে, আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন।" রামানন্দ আপন উদ্যানে মহা বিষয়ীর ন্যায় বাস করেন, প্রভুর ওখানে প্রায় দিবানিশি যাপন করেন, আবার রাজাকেও একবার দর্শন করিতে গমন করেন। রাজার নিকট গমন করিলেই রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "কত দূর? প্রভুর কি পূর্ব্বাপেক্ষা মন একটু শিথিল হয়েছে?"

রামানন্দ শেষে প্রভুকে ধরিলেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভু! রাজার সহিত দেখা করা আমার দুর্ঘট হয়েছে। দেখা হইলেই কেবল এক কথা, 'প্রভুর সহিত মিলাইয়া দাও। তুমি মনে করিলেই পারিবে।' রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাঁহাকে দেখা না দিলে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন বলিয়া বোধ হয় না।" ইহা শুনিয়া প্রভু একটু কাতর হইলেন। বলিতেছেন, "রামানন্দ, তোমরা আমাকে রাজার কথা বলিয়া কেন দুঃখ দাও? আমার তাঁহাকে দর্শন দিতে ত কোন আপত্তি নাই। তবে নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে করি?"

রামানন্দ বলিলেন, "তোমার আবার কি বিধি মানিতে হইবে জানি না; যদি বল, জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তোমার সমুদায় বিধি পালন করা কর্ত্তব্য; তাহা সত্য, কিন্তু প্রতাপরুদ্র নামে রাজা, কর্ত্তব্যে ভক্ত!"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি জানি। কিন্তু আমার যে অবস্থা, তাহাতে সমুদায় বিচার করিতে হইলে আমার অতি সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। আমার একটু ছিদ্র পাইলে জীবে আর হরিনাম লইবে না।"

রামানন্দ। প্রভু, কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্য পামরকে অধম হইতে উত্তম করিলে,—এমন কি ব্রজরস দান করিলে; রাজা তোমার ভক্ত, তাঁহাকে বঞ্চিত করিবে ইহাও ত সঙ্গত হয় না।

প্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "রামানন্দ, তুমি এক কার্য্য কর। তুমি রাজার পুত্রকে লইয়া আইস।" শাস্ত্রে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" বলে! রাজার পুত্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হউন।"

রামানন্দ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন সন্দেহ নাই। আর সেই আনন্দ মনে, রাজার নিকট গমন করিয়া সমুদায় কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, "প্রভুর তোমার উপর সম্পূর্ণ কৃপা, আর সেই কৃপার আরম্ভ এই।" ইহাতে রাজাও আনন্দিত হইলেন।

তখন রসিকভক্তচূড়ামণি জগন্নাথবল্লভ-নাটক-লেখক রামানন্দ রাজপুত্রকে সাজাইতে লাগিলেন। রাজকুমারের কেবল যৌবনারম্ভ, শ্যাম বর্ণ, কাজেই তাঁহাকে কৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা করাইলেন। অর্থাৎ পীতাম্বর পরাইলেন, আর তাহার উপযোগী মনোমত আভরণ দ্বারা সাজাইলেন। রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, না যেরূপ যুবতী পতির সহিত প্রথম ঘরে মিলিতে যান; সেইরূপ মন্থর-গতিতে, প্রতি পদ-বিক্ষেপে মঞ্জরী-ধ্বনি করিতে করিতে, রাজপুত্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

রামানন্দের ইচ্ছা, রাজপুত্রের হাবভাব লাবণ্যে প্রভুকে ভুলাইবেন; আর সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াছেন এবং সেইরূপ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতই প্রভু রাজপুত্রকে দেখিয়া ভুলিলেন, রাজকুমারকে দর্শনমাত্র তাঁহার রাধা-ভাবে শ্যামসুন্দরের স্মৃতি হইল। প্রভু তখন উঠিয়া বিবশীকৃত হইয়া রাজকুমারকে বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান্, তোমার দর্শনে আমার ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মৃতি হইল।" প্রভু ইহা বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু রাজকুমার কি করিলেন?

"প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ। স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, নাচে, করয়ে রোদন।"—চরিতামৃত।

প্রভু যত্ন করিয়া তাহাকে শান্ত করাইলেন ও নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখানে প্রত্যহ আসিবা।" রাজকুমার প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট চলিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টলমল করিতেছেন, অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে, অধিক কি —তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে। তাঁহার রূপ এত মনোহর হইয়াছে যে, তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। রাজপুত্রের দশা দেখিয়া রাজা আনন্দে

বিহ্বল হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন দিয়া সেই আনন্দের অংশ পাইলেন। যে ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গের পরশ পাইয়াছে, তাহার অঙ্গ-পরশের আস্বাদ করিয়া, রাজার শ্রীপ্রভুর প্রতি লোভ নিবৃত্তি হইল না, বরং আরও বর্দ্ধিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

"একবার এস হৃদি মন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।
একবার এস হে, এস হে, এস হে, গৌর এস হে।
তুমি আসিবে আশায় হৃদি-পদ্মাসন পাতিয়া রাখিয়াছি॥
একবার এস নাথ সেই আসনে বস।
আমি হেরিব বদন, পূজিব চরণ আমি ধোয়াব চরণ নয়নের জলে,
আর মাগিব এক ভিক্ষা।
আমি চাহি না ধন, চাহিনা জন, চাহি না পদ, চাহি না সম্পদ,
শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর। বলরাম দাসের চিরদুঃখ হর॥"

নীলাচল হইতে নবদ্বীপে সংবাদ আসিল যে, নবদ্বীপের চাঁদ দক্ষিণ-দেশ ভ্রমণ করিয়া, স্বচ্ছন্দে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া, সেখানে বাস করিতেছেন। এই সংবাদ শচীর মন্দিরে পৌঁছিল; শচী শুনিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। দূত প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ শচীর অগ্রে রাখিলেন। ঘোর-বিয়োগানলে উত্তপ্ত শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া অমিয়-সাগরে ডুবিলেন। এই দুই বৎসর স্বপ্নের ন্যায় দুঃখ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাদের দুঃখ-সাগর শুখাইয়া, সুখের সাগর বহিল। "অবশ্য নিমাই আমার বাড়ী আসে নাই, তবুও বেঁচে আছে? তবুত ভাল আছে?" —এই শচীর আনন্দ। আর "আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে

নৃত্য করিয়া এখন নীলাচলবাসীকে সুখ দিতেছেন, কত শত লোক উদ্ধার পাইতেছে;"—এই বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ।

যথা— "প্রাণনাথ মোর সিন্ধুকূলে প্রেমে নাচিছে। ধ্রু।
হরি বলে কত লোকে সুখে ভাসিছে॥"

যখন দুঃখ থাকে, তখন বোধহয় ইহার আর প্রতিকার নাই। আবার অনেক সময় সেই দুঃখই সুখের আকর হয়। এই যে ভুবনমোহন দুর্লভ ধন, এই যে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, বৃক্ষতলবাসী হয়েছে,—এ কথা শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিবামাত্র ভুলিয়া গেলেন। এই গেল রসিকশেখরের এত অত্যাশ্চর্য্য রঙ্গ। তবে আবার দুঃখ কি গা? তাঁহার ইচ্ছায় অগ্নির গহ্বরও সুখসাগরে পরিণত হইতে পারে। প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ এক মুহূর্ত্তে শ্রীনবদ্বীপময় ছড়াইয়া পড়িল, আর তখনি প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। "জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়!"—এই ধ্বনি মুহুর্মুহু হইতে লাগিল। সকলে বলিয়া উঠিলেন, "চল যাই প্রভুকে দর্শন করি গিয়া।" যেন প্রভু ও-পাড়ায় আছেন। কিন্তু প্রভু বিংশতি দিনের পথ দূরে; শুধু তাহা নহে, পথও অতি দুর্গম।

কিন্তু কে লইয়া যাইবে? প্রভু না, যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, আমার অভাবে তোমরা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ভজনা করিও? চল সকলে সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। এই কথা সাব্যস্ত করিয়া প্রভুর ভক্তগণ, নীলাচলের দূত সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের বাড়ী শান্তিপুরে চলিলেন।

সেখানে দিন কয়েক মহোৎসব হইল; শ্রীঅদ্বৈত অন্নদানে কখন কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়া, তাঁহাকে অগ্রে করিয়া শচীর মন্দিরে আসিলেন। সেখানে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল।

সকলে পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শচীর আজ্ঞা লইয়া, এবং তাঁহার দত্ত সামগ্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বহস্তে প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে "জয় জগন্নাথ," "জয় নবদ্বীপচাঁদ" বলিয়া চলিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে দূরদেশে গমন করা সুখের কার্য্য নয়, কিন্তু ভক্তগণ উহা মনে করিলেন না। সকলে প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় খাদ্য সঙ্গে লইলেন, আবার অনেক মহাপ্রভুর প্রাণের সম্পত্তি—মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা—বহন করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভক্তগণ আসিতেছে, এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্ত আগমন দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সঙ্গে করিয়া অট্টালিকায় উঠিলেন। ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়া পায়ে নূপুর পরিলেন, এবং খোল ও করতাল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতধ্বনি উঠিল। দুই শত ভক্ত বহুতর মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজন করেন, তাঁহারা ভয়ে ভীত হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, "তুমি দয়াময়" "তুমি দয়াময়" এই চাটুবাক্য বলিতে বলিতে গমন করেন। আর যাঁহারা মহাপ্রভুর গণ, তাঁহারা ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয়তম ভাবিয়া, তাঁকে দর্শন করিতে নূপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন।

কৃষ্ণমঙ্গল-গীত শুনিয়া রাজা বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, "একি সুধা-বর্ষণ! কথা একটিও ত বুঝিতেছি না, কেবল সুর শুনিয়া অন্তরে ভক্তির উদ্রেক, অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!"

গোপীনাথ বলিলেন, "মহারাজ! আমাদের বদান্যবর মহাপ্রভু জীবকে এই সংকীর্ত্তন-রূপ সম্পত্তি দান করিয়াছেন।"

ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না; মন্দির দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রের আলয় অভিমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব-ধন রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই আলয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে, প্রভু তাঁহার নীলাচলস্থ সঙ্গীগণ লইয়া বাহির হইলেন।

তখন প্রভুর বয়ক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর। প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল, পদ্ম-সদৃশ নয়ন হইতে ধারা বহিতেছে।

তখন নয়নে-নয়নে মিলন হইল। সকলের নয়ন প্রভুর শ্রীমুখে, আর প্রভুর নয়ন সকলের মুখে'! প্রত্যেকের মনে হইতেছে যে, প্রভু তাঁহাকেই দেখিতেছেন, আর নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা প্রাণের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।

সমাপ্ত